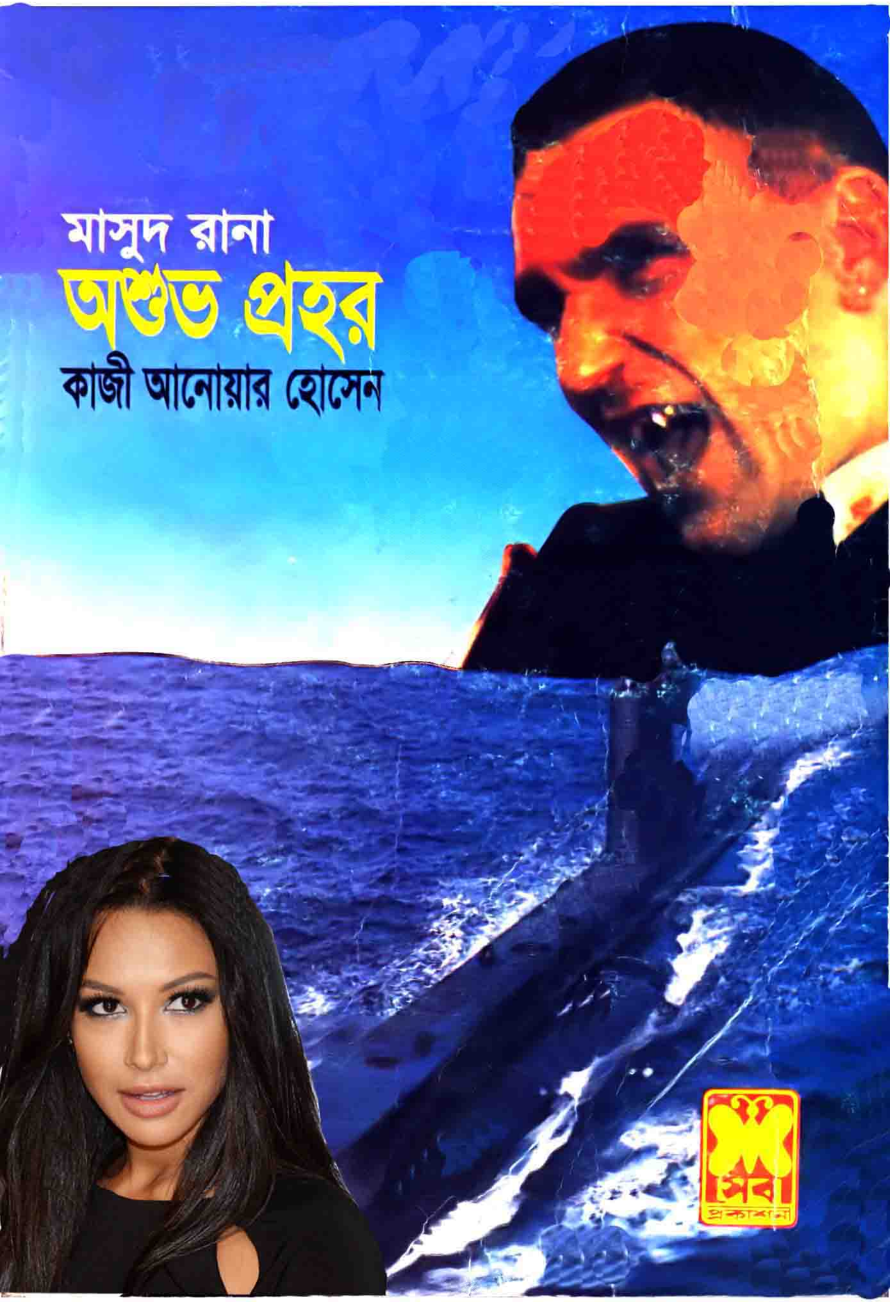
মাসুদ রানা

অশুভ প্রহর

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অশুভ প্রহর

কাজী আনোয়ার হোসেন

বড় বাড় বেড়েছ তুমি, আমেরিকা! যুদ্ধ বাধিয়ে ইরাকের তেল নিতে চাইছ, মাথায় হাত বুলিয়ে নিতে চাইছ বাংলাদেশের গ্যাস। দাঁড়াও, একমাত্র সুপার পাওয়ার হবার মজা তোমাকে দেখাচ্ছি! মিথ্যে হুমকি নয়, যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করে ফেলার সব ব্যবস্থা পাশ করে ফেলেছে নিরো ছদ্মনামে পুরানো এক পাপী। মাসুদ রানা আবিষ্কার করল, বিপদ বাংলাদেশেরও। এদিকে ভালবাসা ও ঘৃণার এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে ওকে নিয়ে ভুগছে পরমাসুন্দরী এক এসপিওনাজ এজেন্ট। তবে দু'জনকেই কঠিন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো—দুনিয়া থাকবে তো?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩২৪

অশুভ প্রহর

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা ৩২৪

অশুভ প্রহর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7324-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-324
ASHUBHO PROHAR
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চুয়াল্লিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল ম্যাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ।

এক

সেই পুরনো গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকালয় থেকে বহু দূরে রাস্তার ধারের সরাইখানায় অচেনা পুরুষের সঙ্গে একই কামরায় আটকা পড়ে গেছেন অপরূপ সুন্দরী এক নারী। পুরুষটি জানে না যে তিনি আসলে সে দেশের রানী; প্রবল ও দীর্ঘমেয়াদি তুষারঝড় তাদেরকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখল, সেই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পোড়াতে লাগল কামনার আগুনে। দুর্যোগ কেটে যাবার পর এবার বিদায় নেয়ার পালা। এই সরাইখানায় আর কখনও ফিরবেন না, এই পুরুষটিকেও আর কোনদিন দেখবেন না, বা দেখলেও ভান করবেন চিনতে পারেননি; তাসত্ত্বেও এই ক'দিন তাঁরা যে পাগলের মত ভালবেসেছেন, রানী চাইছেন সেই মধুর স্মৃতি চিরকাল তাঁর হৃদয়ের পটে আঁকা হয়ে থাকুক, তাই কামরার চারদিকে ঘুরে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা জিনিসগুলো ছুঁয়ে মনের গভীরে গেঁথে নিচ্ছেন সব।

নিনা সুসমি ঠিক তাই করছে, তবে মনে মনে ভাবল—আমার গল্প সম্পূর্ণ আলাদা।

নিনা সুসমি গত যুগের রানী নয়, নয় পৌরাণিক যুগের দেবীও, তবে রূপে ও গুণে তাদের চেয়ে কোন দিক থেকে কমও তাকে বলা যাবে না। বাবা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নিবেদিতপ্রাণ সদস্য, মেয়েকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন যাতে সে বড় হয়ে দেশের উপকারে লাগতে পারে। পরিচয় ও ঠিকানা

গোপন করে মেইনল্যান্ড থেকে হংকঙের একটা কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হলো সুসমিকে। ব্রিটিশ নানদের কাছে লেখাপড়া শিখল সে। মার্শাল আর্ট-এ ট্রেনিং নিল। সিকিউরিটি সিস্টেম-এর ওপর দু'বছরের কোর্স কমপ্লিট করল। এরপর ব্রিটেনে এসে একটা বেসরকারী মিলিটারি স্কুলে নিল তিন বছরের সামরিক ট্রেনিং। প্রথম কাজ বা ফিল্ড ওঅর্ক: ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা, শ্রীলঙ্কা সহ কয়েকটি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা ল্যান্ড মাইন মুক্ত করার জাতিসংঘ পরিচালিত একটি কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে যোগদান।

ইতোমধ্যে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস তাকে গোপনে এসপিওনাজ-এর ওপর ট্রেনিং দেয়ার কাজ সেরে ফেলেছে; ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিজেদের সেফ হাউসগুলোও তাকে চিনিয়ে দেয়া হলো। বেইজিং কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ বস্ জিফু ঝাঝং-এর অনুমতি পাওয়ায় বিউটি কনটেস্টে যোগ দিল সুসমি। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে মিস হংকং নির্বাচিত হলো সে। মিস ইউনিভার্স কনটেস্টে যোগ দেয়ার জন্যে চলে এলো আমেরিকায়। রানার্স আপ হলো সে। হলিউডের কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করার অফার পেল। আবেদন করতে আমেরিকান সিটিজেনশিপ পেতেও কোন অসুবিধে হলো না।

নিনা সুসমি কাগজ-পত্রে মার্কিন নাগরিক হলেও, আসলে সে মাতৃভূমি চীনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, পেশায় চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অন্যতম এক দুর্ধর্ষ স্পাই। তবে বর্তমানে তাকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এ সাময়িক বদলি করা হয়েছে।

জিব্রালটার। প্রণালীর মুখেই ঝকঝকে-তকতকে শহর। হোটেল, ক্যাসিনো, মুসলিম স্থাপত্যরীতিতে তৈরি প্রাচীন দুর্গ, সবই আকাশ ছোঁয়া। পুরানো সেই রোমান্টিক গল্পের নায়িকা অর্থাৎ রানীর মত নিনা সুসমি বিবাহিতা নয়, তবে স্বদেশেরই একজন স্পাইকে ভালবাসে সে। তার নাম তাওজি হুতাও।

হুতাও-ও চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট, সুসমির মত তাকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে বদলি করা হয়েছে।

হুতাও ফাইভ স্টার হোটেল প্যারাডাইস-এর এগারোতলার বড় এই কামরার মাঝখানে, ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে খোলা ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে তাকিয়ে আছে বেশ অনেকটা দূরে, ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির ভেতর। চোখে লেগে থাকা বিনকিউলারটা আরেকবার অ্যাডজাস্ট করল সে। ঘরের চারদিকে ঘোরাফেরা করার ফাঁকে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে সুসমি। কথাটা ভাবলে নিজেরই অবাক লাগে, তিন বছর ধরে পরস্পরকে ভালবাসে অথচ চুমো খাওয়া ছাড়া ওদের মধ্যে আর কিছু হয়নি।

সেই রানীর সঙ্গে মিল বা অমিল যাই বলা হোক, সুসমি সিদ্ধান্ত নিয়েছে–আজ হবে; হবে মানে, সে-ই হওয়াবে। আর সেজন্যেই ঘটনাটা ঘটার আগে, হোটেল কামরার প্রতিটি জিনিস ছুঁয়ে দেখছে সে, গেঁথে নিচ্ছে মনের গভীরে–ভালবাসার মানুষটির হাতে নিজেকে তুলে দেয়ার মধুর স্মৃতি যাতে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকে হৃদয়ের পটে।

'নিনা, কুইক! আমাদের সার্ভেইলান্স বৃথা যায়নি!' হঠাৎ চাপা গলায় বলল হুতাও, উত্তেজনায় সারা শরীর টানটান। তার বিনকিউলার ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটির চারতলা একটা দালানের সামনের চাতালে তাক করা, চাতালটার এক প্রান্তে পার্কিং এরিয়া। দালানটা থেকে ছোট একটা মিছিলের মত বেরিয়ে আসছে কিছু মানুষ।

ব্যাগ থেকে নিজের বিনকিউলার বের করে হুতাওয়ের পাশে দাঁড়াল সুসমি। বহু দূরের দৃশ্যটা লাফ দিয়ে চলে এলো চোখের সামনে। 'ওহ্, গড!' মানুষগুলোর মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে প্রায় আঁতকে উঠল সে। 'ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটিতে সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর!'

'ভাল করে দেখো,' বলল হুতাও। 'আরও অনেককে চিনতে

পারবে। ওদের এই গোপন মীটিঙের সঙ্গে আমাদের কুবলাই খান-এর নিখোঁজ হবার সম্পর্ক না থেকেই পারে না...'

'এই কুবলাই খান বা বর্তমান অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তবে,' উত্তেজনায় সুসমির গলা কেঁপে গেল, 'আমি নুমা-আমেরিকানদের ন্যাশন্যাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটনকেও দেখতে পাচ্ছি...গড! তাওজি! ইউনিফর্ম পরা ওই প্রকাণ্ডদেহী...'

'চিনতে পারছ না?' তিক্ত হাসি ফুটল হুতাওয়ের ঠোঁটে। 'উনি হলেন মার্কিন নৌ-বাহিনীর নর্থ আটলান্টিক জোনের ফ্লিট কমান্ডার...'

'অ্যাডমিরাল আর্থার আরলিংটন,' বিড় বিড় করল সুসমি, একটু অন্যমনস্ক। হঠাৎ করে তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে স্বর্ণকেশী এক সুদর্শন তরুণ, নুমার ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটন আর সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর জেফ ব্যারেল-এর মাঝখানে হাঁটছে, প্রায় পৌঁছে গেছে পাকা চাতালের ওপর। 'ও কে, তাওজি? ছাই রঙের জ্যাকেট, সোনালি চুল?'

এবার হুতাওয়ের আঁতকে ওঠার পালা। 'সর্বনাশ! নিনা, দিস ইজ রেড অ্যালার্ট!'

সুসমি হতভম্ব। 'মানে!' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে হুতাওয়ের দিকে তাকাল সে।

সুদর্শন মার্কিন তরুণটিকে খুঁটিয়ে দেখছে হুতাও। 'নাহ্, আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই, নিনা। এ নিশ্চয়ই সেই মাইকেল, মাইকেল টিচার।'

'দূর, কি বলছ! তা কি করে হয়? টিচার তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে।' ঝট করে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সুসমি। সারা শরীরে ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করল সে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় তো বটেই, তারপরও বেশ কয়েক বছর ধরে সিআইএ এজেন্ট মাইকেল টিচার চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস ও সাধারণ

আমেরিকান চীনাদের প্রচুর ক্ষতি করেছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে। কমপিউটরে সংরক্ষিত টিচারের ফাইল সর্বশেষ যে তথ্যটা এন্ট্রি করা হয়, তা হলো–সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে। আজ থেকে সাত বছর আগে। 'হ্যাঁ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সুসমি, 'আমিও এখন টিচারের ফটোর সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি, তাওজি! কিন্তু বয়স অনেক কম লাগছে। টিচারের এখন বয়স হবার কথা চল্লিশের কাছাকাছি। তাছাড়া, মরা একটা মানুষ এত বছর পর...'

'কে বলল মরা মানুষ?' জিজ্ঞেস করল হুতাও। 'আমাদের কেউ তার লাশ দেখেছে? রোড অ্যাক্সিডেন্টটা ছিল সম্পূর্ণ সাজানো একটা ব্যাপার। কিংবা সত্যি হয়েতো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল, সেজন্যেই প্লাস্টিক সার্জারি করার দরকার হয়। আজকাল বয়স লুকাতে পারা কোন ব্যাপার নাকি!'

দুটো ক্যাডিলাক আর একটা মার্সিডিজে উঠে পড়ল সবাই। তিনটে গাড়ি গেটের দিকে ছুটছে। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে সুসমির দিকে তাকাল হুতাও। 'আমি চাই টিচারকে তুমি অনুসরণ করবে, নিনা।'

'তারপর?'

'কিল হিম,' বলল হুতাও। 'অ্যাক্সিডেন্টের আগে এটাই ছিল তার বিরুদ্ধে স্ট্যান্ডিং অর্ডার।'

'আর তুমি?'

'সুযোগ থাকলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম,' বলল হুতাও। 'টিচারকে খুন করা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টেরই একটা অংশ। আমি কুবলাই খান-এর তদন্তে থাকি, তুমি ওটাকে শেষ করে আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাব তোমাকে...'

টেলিফোনটা বেজে উঠে থামিয়ে দিল তাকে।

রিসিভার কানে তুলে হুঁ-হাঁ করছে হুতাও। হতাশ ও বিষণ্ন ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সুসমি। এক মিনিট পর ইঙ্গিত

করল, বোঝাতে চাইল মাইকেল টিচারের পিছু নেয়ার জন্যে চলে যাচ্ছে সে। খালি হাতটা তুলে তাকে যেতে নিষেধ করল হুতাও।

আরও তিন মিনিট ফোনে আলাপ করল হুতাও। তারপর রিসিভার্ নামিয়ে রেখে সে-ও বিষণ্ন হাসি হাসল। 'আমাদের বস্...'

'জিফু ঝাঝং স্বয়ং?' সুসমি বিস্মিত।

'না, নিনা। ইনি আমাদের নতুন বস্ জুং জাউ ঝাউ। বেইজিঙে উনি নিজে তোমাকে ব্রিফ করবেন।'

'আর তুমি?'

'আমি বসের নির্দেশে মাইকেল টিচারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি,' বলে এগিয়ে এসে সুসমির সামনে দাঁড়াল হুতাও।

দু'জনেই নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল, অনুরাগে আবেশে অবশ হয়ে আসছে অস্তিত্ব; তারপর হাঁপাতে শুরু করে দ্রুত চুম্বন বিনিময় এবং হুতাওয়ের প্রস্থান।

শূন্য ঘর। চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে অসহায় আর পরিত্যক্ত লাগল সুসমির। গল্পের সেই রানীর প্রতি তার ঈর্ষা হলো। তবে তা মাত্র কয়েকটা দুর্বল মুহূর্তের ব্যাপার। একটু পরই আপনমনে হেসে উঠল সে, ভাবল আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়া তার সাজে না; সে একজন স্পাই, বিপদের সময় দেশের ডাকে সাড়া দেয়া তার প্রথম ও পবিত্র দায়িত্ব। দেরি না করে এখুনি তার বেইজিঙের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া উচিত।

সে জানে, তার এই টিচার নামটাই শুধু নয়, অ্যাথলেটিক কাঠামো, নীল চোখ আর সোনালি রেশমি চুল অনেক মেয়েকেই পাগল করে তুলবে। তবে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, এই মেয়েটা ঠিক তাদের দলে পড়ে না। প্রথম কথা, সে নিজেই অসম্ভব সুন্দরী, স্মার্ট ও সুদর্শন পুরুষরাই বরং তার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। তারপর দেখা গেল, টিচারের

জন্যে নয়, সে আসলে তার ভাইয়ের জন্যে পাগল। কেন, কি হয়েছে তার ভাইয়ের? ওহ্, সে এক লম্বা কাহিনী। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো···

সব শুনে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেছে টিচার।

জায়গাটার নাম চামোনিক্স, প্রায় ন'হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আইগুইলি দু মোর্ট-এর নিচে ছোট একটা ফরাসী শহর। সে তার বসের নির্দেশে ছুটি কাটাতে এসেছে এদিকে–তার নাকি তাজা পাহাড়ী বাতাস দরকার ফুসফুসে, রিফ্লেক্স বাড়াবার জন্যে দিন কয়েক স্কিইং করাও প্রয়োজন। যেচে পড়ে ছুটি দেয়ার পর, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এরকম একটা ভঙ্গি করে জিব্রালটারে দু'দিন যাত্রাবিরতি করতে বললেন বস্। ওর জন্যে তৈরি করা স্কিইং ইকুইপমেন্ট জিব্রালটারের একটা সেফ হাউসে রাখা আছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে তাকে। আরও একটা কাজ আছে–গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষ জিব্রালটারের ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটিতে বসে তার সঙ্গে বিশেষ কোন ব্যাপারে পরামর্শ করতে চান। ওখানে তাকে যেতে হবে অত্যন্ত সাবধানে, কোনভাবেই যেন তার পরিচয় কেউ জানতে না পারে। তারপর বলা হলো, জিব্রালটার বা ফ্রান্সে যাই ঘটুক, হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে সরাসরি বসকে রিপোর্ট করতে হবে।

ছুটিতে ফ্রান্সে এসেছে অথচ মাইকেল টিচার জুয়া খেলছে না, এটা আসলে পশ্চিমে সূর্য ওঠার মত। জুয়া খেলতে ভালবাসে সে, কারণ টেনশন তার কাছে এক ধরনের রিল্যাক্সেইশন। খেলাটা আরও উত্তেজনাকর, আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠল পরমাসুন্দরী এক নিঃসঙ্গ চীনা মেয়েকে ওর কনুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার ডলার হারতে দেখে। কিছুক্ষণ খেয়াল করতেই বুঝতে পারল টিচার, খেলায় মন নেই মেয়েটার। কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা, এভাবে হারতে দেখে কে কি ভাবছে, এ-সব দিকেও তার খেয়াল নেই।

টিচার বলল, 'তুমি খেলছ তো না-ই, এমন কি এখানে তুমি উপস্থিতও নও।'

হঠাৎ থমকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে এই প্রথম টিচারের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমাকে কিছু বললে তুমি?' চোখে একাধারে রাগ, বিরুক্তি ও রাজ্যের সন্দেহ।

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল টিচার। 'যদি কিছু বলেও থাকি, ভুলে যাও।'

পরের দশ মিনিটে আরও দশ হাজার মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ ফ্রাঙ্ক হারল মেয়েটা। মাস্টার কার্ড বের করে আরও চিপস্ কিনল সে। প্রতি দানেই পাঁচ-সাতশো ডলার হারছে। নির্বিকার বা নির্লিপ্তও নয়, চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। তবে টিচার বাজি ধরে বলতে পারে, এই উৎকণ্ঠা টাকার শোকে নয়। তার ধারণা হলো, মেয়েটা নিশ্চয়ই কোন সমস্যায় পড়ে দিশেহারা বোধ করছে।

টিচার থেমে থেমে খেলছে আর জিতছে; মেয়েটা প্রতিবার বড় স্টেকে খেলছে, আর একবার জিতলে চার-পাঁচবার হারছে।

'আমি মাইকেল টিচার, ট্যুরিস্ট।' খেলার বিরতিতে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি কি তোমাকে কফি বা বিয়ার খাওয়াতে পারি?'

আবার মুখে ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটা। রাগ, বিরক্তি বা সন্দেহ নয়, এবার তার চেহারায় ক্লান্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'লিনা ওয়াং।' টিচারের বাড়ানো হাতটা ধরল সে। 'হ্যাঁ, প্লীজ, গলাটা সেই কখন থেকে শুকনো লাগছে।'

জুয়ার টেবিল ছেড়ে বারে এসে টুলে বসল ওরা। বারটেন্ডারকে ডেকে দুটো বিয়ার চাইল লিনা ওয়াং।

'এখানে আমি বিদেশী হলেও,' টিচার তাকে বলল, 'তোমাকে আমি জানাতে চাই যে রবিন হুডের সঙ্গে আমার খানিকটা মিল আছে–বিপদে পড়া মানুষজনকে সাহায্য করা আমার একটা

নেশাও বটে...'

'বিশেষ করে খুব সুন্দরী মেয়েদের?' একটু তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিনা।

'হ্যাঁ। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের।' সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে হাসল টিচার।

'না, ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়,' ম্লান সুরে বলল লিনা ওয়াং। 'কিন্তু আমার কাছে যেটা আশ্চর্য লাগছে, তুমি জানলে কিভাবে যে আমি একটা সমস্যার মধ্যে আছি?'

'মানুষের আচরণ অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ভাষা,' বলল টিচার। 'তোমার সেই ভাষা আমি পড়তে পেরেছি।'

এরপর লিনা ওয়াং সব কথাই বলল তাকে। টিচার কি শাওচিন শিপিং লাইন-এর নাম শুনেছে? জানে এই কোম্পানির প্রায় একশো সমুদ্রগামী জাহাজ আছে? কোম্পানি মালিকের দুই ছেলেমেয়ে ওরা–লিনা ওয়াং আর চুন চি ওয়াং। লিনার চেয়ে চুন চি এক বছরের ছোট। প্রতি বছর গ্রীষ্মে ওরা দুই ভাই-বোন চামোনিক্সে স্কি করতে আসে। এবারও এসেছে–তবে দু'জন দু'জায়গা থেকে রওনা হওয়ায়, চামোনিক্সে একই সময়ে পৌছাতে পারেনি ওরা। চুন চি অত্যন্ত ছটফটে আর অসহিষ্ণু, মোবাইল ফোনে বড় বোনকে জানিয়ে দিল সে একাই আইগুইলি দু মোর্টে-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে যাচ্ছে, ওদের পরিচিত নির্দিষ্ট একটা 'হাট' বা কুঁড়েতে তার জন্যে অপেক্ষা করবে সে। লিনা তখন মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তবে ইটালিতে; ভাইকে বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলল। কিন্তু তাতে রাজি না হয়ে একাই রওনা হয়ে গেল সে।

পরদিন চামোনিক্সে পৌছাল লিনা। এখান থেকে ওদের সেই পরিচিত কুঁড়ে মাত্র ষাট মাইল দূরে, মাঝখানে বরফ ঢাকা সারি সারি পাহাড় থাকলেও মোবাইল ফোন কাজ করে। শহরে পৌছে প্রথমেই চুন চিংকে ফোন করে লিনা। অপরপ্রান্ত থেকে অনবরত

পিপ-পিপ-পিপ-পিপ্‌ আওয়াজ পেল শুধু, অর্থাৎ নিজের মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে চিং, কিংবা তার সেটটা নষ্ট হয়ে গেছে। চিন্তিত লিনা বারবার চেষ্টা করে। ফলাফল সেই একই। ফোন কেউ ধরছে না।

চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পুলিসকে ব্যাপারটা জানাল লিনা। পুলিসের রেসকিউ টীম সম্পূর্ণ উল্টোদিকে একাধিক উদ্ধার কাজে ব্যস্ত থাকায় লিনাকে জানানো হলো, হেলিকপ্টার পেতে দেরি হবে। বাধ্য হয়ে একটা প্রাইভেট কোম্পানির কপ্টার চার্টার করল সে। কিন্তু তারপরই শুরু হলো প্রবল ঝড়। ফলে কাল সকালের আগে সে রওনা হতে পারছে না।

'তোমার সঙ্গে আর কে যাচ্ছে?' লিনা থামতে জিজ্ঞেস করল টিচার।

'এখানে আমি আর কাকে পাব যে সঙ্গে নেব,' বলল লিনা। 'পাইলট আমাকে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে নামিয়ে দেবে, ওখান থেকে স্কি করে সেই কুঁড়েতে পৌঁছুতে হবে আমাকে...'

'এ স্রেফ পাগলামি,' বাধা দিয়ে বলল টিচার। 'এরকম একটা প্রবল ঝড়ের পর কোন রেসকিউ টীমই ওদিকে যেতে সাহস পায় না, অথচ তুমি একা যেতে চাইছ...'

দু'ঢোকে বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে লিনা বলল, 'আর কোন বিকল্প আছে? আমি ছাড়া কে দেখতে যাবে ভাইটা আমার বাঁচল কি মরল।'

'তুমি যদি বলো তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি,' ক্ষীণ দ্বিধাটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল টিচার। 'এদিকে আমিও এসেছি স্কি করতে...'

'তুমি সত্যি বলছ?' লিনার চোখে অবিশ্বাস। 'বিপদ আছে জেনেও একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে যাবে তুমি?'

টিচার হাসল। 'শাওচিন শিপিং কোম্পানির মালিক যারা তাদেরকে ঠিক অচেনা বলা যায় কি? তবে সেটাও কোন ব্যাপার

নয়–তোমাকে তো বলেইছি, বিপদে মানুষকে সাহায্য করতে ভাল লাগে আমার।'

টিচারের হাতটা চেপে ধরল লিনা। 'ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে পাঠিয়েছেন, মাইকেল। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।'

পাহাড় প্রাচীরের গা ঘেঁষে চূড়ার দিকে যখন উঠতে শুরু করল ওদের হেলিকপ্টার, এই প্রথম একটু সন্দেহ দেখা দিল টিচারের মনে। আইগুইলি দু মোর্ট-এর পুরোপুরি খাড়া অংশটা মাপে দু'হাজার ফুট; এমন কি প্রচণ্ড শীতের সময়ও গম্ভীরদর্শন, কালচে গ্র্যানিট পাথরের গায়ে সামান্য একটু পাউডারের মত তুষার জমে কি জমে না। চূড়ার পরে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য–ঠিক যেন চাঁদের পিঠ, তবে পুরু বরফে ঢাকা দিগন্ত বিস্মৃত ঢেউ খেলানো প্রান্তর।

নিখুঁত ছক কাটা চামোনিক্স শহর তার নিচে এই মুহূর্তে বাচ্চাদের খেলনা শহরের মত লাগছে, ক্রমশ আরও ছোট হতে হতে এখুনি অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাথার ওপর একঘেয়ে যান্ত্রিক গর্জন তুলে ঘুরছে রোটর। বাতাস লাগায় চূড়ায় জমাট বাঁধা তুষার থেকে ধোঁয়ার মত বাষ্প বেরুচ্ছে। কেবিনের সামনে পাইলটের আকৃতি ভাঙাচোরা লাগছে, ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতে মনে হলো পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে বসানো একটা মূর্তি। প্রজাপতির ডানা আকৃতির মিরর সানগ্লাস বাঁকা হয়ে নাকের পাশে চলে এসেছে; ধোঁয়াটে, ঝাপসা গোঁফের আভাস। পরিচিত হবার সময় লোকটা তার হাত প্রায় ধরেইনি। ব্যাপারটা যেন টিচার কোন স্পর্শ করার বস্তু নয়। এমন কিছু, দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে হবে।

একটা এয়ার-পকেটে ধাক্কা খেলো কপ্টার, ঝপ করে দশ ফুট নিচে নামল ওরা। টিচার অনুভব করল তার পেট পাকানো মুঠোর মত শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটার দিকে তাকাল সে। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। সিটের হ্যান্ডরেস্ট আঁকড়ে ধরা হাতের গিঁটগুলো

সাদা দেখাচ্ছে। এ কি শুধুই হেলিকপ্টারে চড়ার উত্তেজনা?

পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা পিছনে ফেলে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। টিচার জিজ্ঞেস করল, 'আমরা নামছি কোথায়?'

'এই তো, আরেকটু পর,' তাড়াতাড়ি বলল লিনা ওয়াং। 'কুঁড়েটার যত কাছে পৌঁছে দেয় পাইলট, আমাদের জন্যে ততই সুবিধে। একটু ধৈর্য ধরো, প্লীজ।'

যেচে সাহায্য করতে এসেছি, আমার আর কোন বিকল্প আছে?—ভাবল টিচার। তবে বেল্টে প্রিয় পিস্তলটা গোঁজা থাকলে নিরাপদ ও স্বস্তি বোধ করতাম। সেটা লুকানো আছে হোটেল ইন্টারকনে, ওর স্যুইটে, একটা পেঁচা আকৃতির দেয়ালঘড়ির ভেতর।

নিজের গগল্স্ একটু মুছে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল টিচার। সে তাকিয়েছে বুঝতে পেরেও তার দিকে ফিরছে না। কে জানে কি আছে ওর মনে।

একেবারে হঠাৎই আঙুল তুলে জিনিসটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল লিনা ওয়াং, 'ওটা তুমি এনেছ কেন?'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা হ্যাভারস্যাকটা একবার দেখে নিয়ে টিচার জবাব দিল, 'এটা আমার মাউন্টিন সারভাইভাল কিট।'

'সারভাইভ করার জন্যে যা যা দরকার সব আমরা ওই কুঁড়েতে পাব। গেলেই দেখতে পাবে তুমি।'

'তা হয়তো পাব,' বলল টিচার। 'কিন্তু আমিও তো তৈরি হয়েই এসেছি।' কথাটা শুনে ক্ষীণ হাসি ফোটায় পাইলটের মুখে টান পড়ল, নাকি ব্যাপারটা তার কল্পনা?

চামোনিক্স অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ দেখতে পাচ্ছে টিচার, একঘেয়ে শুভ্রতার বিস্তার মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হয়েছে শুধু যেখানে স্তূপ হয়ে আছে বেঢপ আকৃতির কালচে পাথর। ওদের কপ্টার একটা রিজ-এর ওপর দিয়ে উড়ে এলো। বহুদূর ডানদিকে এক সারিতে

অনেকগুলো টেলি-কেবিন দেখা যাচ্ছে, কপ্টারটা একই সরলরেখায় থাকায় আকাশের গায়ে ওগুলোকে এক ঝাঁক খুদে ঘোড়ার মত লাগল—আইগুইলি দু মোর্ট থেকে ইটালিয়ান সীমান্তের দিকে চলে গেছে। আরও অনেক দূরে বাম দিকে নিশ্চয়ই সুইস সীমান্ত। তিন দেশের দুর্গম পাহাড়ের একঝাঁক সাদা মাথা মিলিত হয়েছে এখানে। পাহাড়গুলো চেনা থাকলে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাওয়া নিশ্চয়ই খুব সহজই। এই মুহূর্তে ওরা তাহলে কোন্ দেশে রয়েছে? হঠাৎ অনেক নিচে নেমে এসে বরফের ওপর ঝুলে থাকল কপ্টার, রোটরের ব্লেড একটা ঝড় তৈরি করছে। মেয়েটাকে কিছু একটা বলল পাইলট, কানে যান্ত্রিক গর্জন নিয়ে কথাটা টিচার শুনতে পেল না। হ্যাচ কভার ঠেলে সরিয়ে দিল সে। ঠাণ্ডা বাতাস মৌমাছির মত হুল ফোটাল তার চোয়ালে। 'এখানেই তাহলে নামিয়ে দেয়া হবে আমাদের?' চিৎকার করতে হলো তাকে।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, ইঙ্গিতে জমে বসা তুষার দেখাল। গভীর পাউডার বলা যাবে না; এ হলো তুষারের অসংখ্য স্তর, বিরতি নিয়ে বারবার পতনের ফলে চেপে বসেছে। এতটা ওপরে এই ভরা গ্রীষ্মেও সম্ভবত প্রায়ই তুষারপাত হয়। সকালের প্রথম ভাগে সারফিস এখনও জমাট বেঁধে শক্ত হয়নি, ফলে হেলিকপ্টার স্কির আকৃতি দু'ইঞ্চি গভীরে গাঁথা হয়ে গেল। বড় করে শ্বাস টানতে গিয়ে টিচার অনুভব করল ফুসফুস প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তেরো হাজার ফুট ওপরে অক্সিজেনের অভাব যে-কোন সুস্থ-সবল লোককে কাহিল করে তুলবে।

সতর্ক চোখ ক্ষণে ক্ষণে পাহারা দিচ্ছে পাইলটকে, একটা হাতের সসম্ভ্রম বিস্তার ঘটিয়ে টিচার ইঙ্গিত করল—মেয়েটিরই প্রথমে নামা উচিত। সে চাইছে না বরফে পা দিয়ে পেটে একটা গুলি খাক, তারপর হেলিকপ্টারটা পাক খেতে খেতে সূর্যের দিকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকুক। তার মনে স্বস্তি এনে দিয়ে

ইঙ্গিতটায় সহাস্যে সাড়া দিল লিনা ওয়াং, কেবিনের কিনারা থেকে পা ঝুলিয়ে দিল নিচে। তার পাশেই নামল টিচার, নিজের স্কিগুলো কপ্টারের গা থেকে খুলে নিল। পাইলট এমন অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

'ও আমাদেরকে কুঁড়ে পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে না কেন?' জিজ্ঞেস করল টিচার। 'ঝড় তো অনেক আগেই থেমে গেছে।'

'কোন কারণ নেই, জেদ,' লিনার গলায় রাগ ও অসন্তোষ। 'প্রথমে এখানে পৌঁছে দেয়ারই চুক্তি হয়, কিন্তু ঝড় থেমে যাবার পর বললাম বাকি ষাট মাইলও যেতে হবে। শুনে চুক্তি বাতিল করে দিতে চাইল। কে জানে, হয়তো একা শুধু আমার কাছ থেকে নয়, অন্য কারও কাছ থেকেও অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছে ওরা...'

তাকে বাধা দিয়ে টিচার জানতে চাইল, 'ও কি আবার আমাদেরকে তুলে নিতে আসবে?'

'না। তবে চুন চিকে কোথায়, কি অবস্থায় পাব তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। প্রয়োজন হলে মোবাইলে যোগাযোগ করে কপ্টার পাঠাতে বলতে পারব।' লিনা নিজের স্কিগুলো খুলে নিয়ে কপ্টারের কাছ থেকে সরে এলো।

টিচার গ্লাভস পরল হাতে, চোখের গগল্‌স্ অ্যাডজাস্ট করল। মোবাইলে ভাইয়ের সাড়া পাবার চেষ্টা করছে লিনা ওয়াং। চেহারায় হতাশা ফুটে উঠছে। সে রওনা হতে তার পিছু নিল টিচার।

'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?' হঠাৎ পাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'ভাবছি কত সুন্দর তুমি, অথচ সব ঢাকা পড়ে গেছে,' বলল টিচার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে মেয়েটার সুটের রেখা ও ভাঁজগুলোর তলায় কোন অস্ত্র লুকানো আছে কিনা।

আরও খানিকটা তুষার স্প্রে করে রিজ টপকে চলে গেল হেলিকপ্টার। সঙ্গিনীর মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপদ বা তার ব্যাপারে

সংশয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, একটা চ্যালেঞ্জ ও উত্তেজনা অনুভব করল টিচার। চারদিকের পাহাড় তার পালস্ রেট বাড়িয়ে দিচ্ছে। চূড়াগুলো এতটাই ধারাল, যেন ঝাঁক-ঝাঁক ছুরি, একটার পিছনে আরেকটা পড়ে মিছিলের মত এগিয়েছে নিখুঁত ডিম্বাকৃতি নীল আকাশের দিকে; যে দৃশ্যের ভেতর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে তিনটে দেশ, এবং সম্ভবত চারদিকে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পিছনে বাষ্পের তৈরি চওড়া দাগ রেখে আকাশটাকে পাড়ি দিয়ে গেল একটা প্লেন। কয়েকশো ফুট নিচে একটা বাজপাখি বাতাসে খাবলা মারছে ডানা দিয়ে, কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল, তারপর গোত্তা খেয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে।

'তুমি কি রওনা হতে চাও না?'

'পাহাড়গুলো দেখছি,' বলল টিচার।

মেয়েটা তার কাঁধে হালকাভাবে একটা হাত রেখে ঝুঁকল, অপর হাত দিয়ে বুট থেকে তুষার সরাচ্ছে। 'প্রাণ না থাকলে কি হবে, সুযোগ দিলে পাহাড় কিন্তু বড় নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। আমি আমার ভাইয়ের কথা ভেবে সত্যি খুব ভয় পাচ্ছি।'

উত্তরে কিছু না বলে স্কির ভেতর সজোরে পা দুটো গলিয়ে দিল টিচার, কাঁধ নিচু করল, তারপর স্টিক গাঁথল তুষারে। এবার রওনা হতে হয়।

'তোমার ব্যাটনগুলো মান্ধাতা আমলের,' বলল মেয়েটা। 'নতুন এক সেট ব্যবহার করা উচিত। খেয়াল করেছ, খাড়া নিচে নামার সময় পিছনে ওগুলো কেমন বাঁক খেয়ে গোল হয়ে যায়? অনেক কম বাতাস আটকাতে পারে।'

টিচার মেয়েটার স্টিকগুলোর দিকে তাকাল, দেখতে ঠিক যেন মেটালের তৈরি শুয়োরের লেজ। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওগুলো আমার স্কিইং-এ কোন পার্থক্য আনবে বলে মনে হয় না। আমি এগুলোই ব্যবহার করি, ধন্যবাদ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা, স্কির একটা বাঁধন শক্ত করল। 'পিছু

নাও। এদিকে কিছু ফাটল আছে।'

সে কি আর বলতে, ফাটল তো থাকবেই—ভাবল টিচার। কোন কোন ফাটল এত গভীর, পড়লে কারও সাহায্য ছাড়া ওঠা সম্ভব নয়। নিজেকে নির্বোধ বলে তিরস্কার করল সে। এভাবে হুট করে একটা মেয়ের সঙ্গে চলে আসাটা কি উচিত হয়েছে তার? সাহায্য দরকার, ভাল কথা—কিন্তু রওনা হবার আগে অন্তত পরিচয়টা যাচাই করে নেয়া উচিত ছিল না?

মেয়েটা স্কি শুরু করল, গভীর তুষারে আঁকাবাঁকা নকশা খোদাই করছে। তার শিরদাঁড়া খাড়া; তবে ভঙ্গিটা সুন্দর, ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতারও প্রশংসা করতে হয়।

হ্যাভারস্যাকের ক্ল্যাপ আরও একটু আঁটো করল টিচার, অনুভব করল শোল্ডারব্লেডে কামড় বসাল ইস্পাতের ফ্রেম। গগল্‌সে বাষ্প জমেছে দেখে মুখ থেকে নামিয়ে পরিষ্কার করে পরল আবার। স্টিক-এর লেদার-বাক্‌ল্‌ লাগানো স্ট্র্যাপ দুই হাতের অনেকটা ওপরে হালকাভাবে আঁটা। দমকা বাতাস লেগে পায়ের চারপাশে তুষার উড়ছে, শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপিয়ে দুই মিটার লম্বা স্কি জোড়া নিচু ঢালের দিকে হড়কে দিল সে।

যে-কোন খেলা নিয়মিত চর্চা করা না হলে সন্দেহের একটা দোলা জাগবেই মনে। প্রয়োজনের সময় দক্ষতা ফিরে আসবে তো? গতি বাড়িয়ে প্রথম বাঁক ঘোরার প্রস্তুতি নেয়ার সময় নিজেকে শান্ত থাকতে বলল টিচার। নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেয়ে সতর্ক থাকাটা তার জন্যে অনেক বেশি জরুরী।

সামনে তুষারের ধু-ধু বিস্তার কোথাও ভাঙেনি, শুধু মেয়েটির জোড়া স্কির রেখে যাওয়া নিখুঁত দাগ দর্শনীয় নকশা তৈরি করেছে। টিচারের স্কি ঘর্ঘর শব্দ করল, স্টিক দিয়ে নির্দিষ্ট স্পট বাছাই করার ঠিক আগে স্কি জোড়া পরস্পরের কাছ থেকে ইঞ্চিখানেক সরিয়ে নিয়েছে সে। শরীরটা উঁচু হলো, স্টিকে চাপ

দিল হাতের সবটুকু শক্তি ব্যবহার করে, বাঁক নেয়ার প্যাটার্ন বা নকশা তৈরি করছে জোড়া হাঁটু খেলিয়ে। তুষারের ভেতর দিয়ে হিস-হিস শব্দ তুলে ছুটছে স্কি, প্রবল গতি বৃত্তের ত্রুটিবিহীন অংশ তৈরি করে বাঁক নেয়ার আদর্শ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলছে, ভারসাম্য এতটুকু বিঘ্নিত না হওয়ায় অনুভব করল সম্পূর্ণ নিরাপদ সে। দু'দিকে ছড়িয়ে পড়া তুষারের ভেতর যেন ডুবে গেল টিচার, তারপর আবার সিধে হয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে দ্বিতীয় বাঁক নিতে শুরু করল। চট করে পিছনে একবার তাকাতে উপলব্ধি করল প্রথমটার চেয়েও ভাল এটা, নকশা ও খোদাই আরও পরিচ্ছন্ন, কিনারায় আগের চেয়ে কম পাউডার ছড়িয়েছে। সন্তুষ্ট টিচার স্কি চালিয়ে দ্রুত ছুটে এসে থামল মেয়েটা যেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

লিনা ওয়াং-এর চোখে প্রশংসা। 'তুমি তো দারুণ একজন স্কিয়ার, হে।' তার গলায় সামান্য বিস্ময়ের সুর।

'এই একটু চেষ্টা করি আর কি,' বলল রানা।

আরও কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে চার ঘণ্টা স্কি করল ওরা, প্রতিবার থামার পর মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে চুন চির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল লিনা। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বদলে তার চেহারায় অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। অবশেষে কুঁড়েটা দেখতে পেল তারা। টিচার সতর্ক নজর রেখেছে, তবে যত দূর দৃষ্টি চলে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত নেই এদিকের পাহাড়গুলোয়। কৃষ্ণসার হরিণের পদচিহ্ন দেখা গেল, তবে ওই পর্যন্তই। তাহলে হয়তো তার ষষ্ঠইন্দ্রিয় এবার ভুলই করেছে। সত্যি হয়তো চার্টার কোম্পানি অন্য কারও কাছ থেকে অ্যাডভান্স নেয়াতেই গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি হয়নি। লিনা ওয়াং হয়তো সত্যিকার লিনা ওয়াংই, তার বিরুদ্ধে সে কোন ষড়যন্ত্র পাকায়নি।

কুঁড়েটা সাধারণ, এদিকের পাহাড়ে যেমনটি সচরাচর দেখা

যায়—নিচু ও চওড়া, পাহাড়ের ভেতর দিকে বেশ খানিকটা সেঁধিয়ে আছে, যেন ওপর থেকে তুষার ধস নামলে খুশিমনেই নিজের অস্তিত্ব হারাতে রাজি হয়ে আছে। গাছের মোটা কাণ্ড লম্বা ও আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে কুঁড়েটা, জানালা দুটো বুড়ো মানুষের চোখের মত ভেতরে বসা। ছাদে জমে থাকা ছয় ফুট তুষার দামী কেকের ওপর সাজানো ক্রীম-এর মত দেখাচ্ছে।

দরজার চারপাশে অক্ষত তুষার দেখে খুশি হলো টিচার। স্কি খুলে দরজায় হাত লাগাল সে। প্রথমে ভেবেছিল তালা দেয়া, তারপর বুঝতে পারল জমাট বরফে আটকে গেছে। কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ বাড়াতে লাগল ধীরে ধীরে। পিস্তল থেকে গুলি বেরুবার মত শব্দ করে খুলে গেল কবাট। তার মাথায় খানিকটা তুষার ঝরে পড়তে হেসে উঠল মেয়েটা।

পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে যেন সুইচ টিপে হাসির শব্দটা থামাল সে। এই ঘরের ভেতর অপেক্ষা করার কথা তার ভাইয়ের, যাকে সে খুঁজতে এসেছে। খোলা জানালায় কেউ নেই, কাজেই ধরে নিতে হয় ভেতরে তার ভাইও নেই। এই পরিস্থিতিতে কোনও বোন হাসতে পারে?

ভুল শোধরাবার জন্যেই কিনা কে জানে কুঁড়ের ভেতর ঢোকার সময় রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, ফিসফিস করে বলল, 'চু, আমার ভাই, মারা যায়নি তো?'

টিচার ভাল-মন্দ কিছুই বলল না। কুঁড়ের ভেতরটা বেশ বড়। ভারী ও নিরেটদর্শন কয়েকটা কাঠের চেয়ার ও একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে। গোলাকৃতি ফ্রেম-এর ভেতর ফায়ারপ্লেইস, ভেতরে আগুন ধরানোর অপেক্ষায় সাজানো রয়েছে চেরা কাঠ। দুটো বাঙ্ক বেড, একটার ওপর আরেকটা। ছোট জানালা গলে ভেতরে ঢোকা রোদে দেখা গেল প্রায় প্রতিটি আসবাব-পত্রের গায়ে ধুলোর পাতলা আবরণ জমেছে। ফায়ারপ্লেইসের দু'পাশে লম্বা দুটো

দরজা দেখল টিচার, ওগুলো সম্ভবত কাবার্ড।

'মাইকেল, এখন আমি কি করব?' কাঁদ-কাঁদ গলায় জানতে চাইল মেয়েটা। 'বোঝাই তো যাচ্ছে, চুন এখানে পৌঁছাতেই পারেনি। অ্যাক্সিডেন্টটা এখানে আসার পথে কোথাও করেছে সে...'

ফায়ারপ্লেইসে আগুন জ্বেলে ঘুরল টিচার, মেয়েটার হাত ধরে কাছে টানল। 'কাবার্ডে নিশ্চয়ই রেডিও পাওয়া যাবে। ঝড় থামার পর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে, সরকারী রেসকিউ হেলিকপ্টার পেতে কোন অসুবিধে হবে বলে মনে–' থেমে গেল সে, তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে দূরে। তুষার ঢাকা বিশাল প্রান্তর ও পাহাড় বাইরে, ওদের নিজেদের স্কি ছাড়া অন্য কোন স্কির দাগ থাকার কথা না। কিন্তু পাহাড়ের ভিত ঘেঁষে তিন জোড়া স্কির দাগ ঢালের মাথা থেকে নিচে নেমে কুঁড়ের পিছন দিকে হারিয়ে গেছে। টিচারের হৃৎপিণ্ড যেন দৌড়াচ্ছে ওর বুকের ভেতর। তারা এখানে আসার সময় দাগগুলো ওখানে ছিল না। এদিকে কারা যেন আসছে।

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল টিচার, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ভয় দেখতে পেল। সে জানে।

এখন কি করবে টিচার? এখানে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। আতংকিত বিশ্বাসঘাতিনীর চোখ দুটোর দিকে তাকাল সে, খপ করে কাঁধ দুটো ঘামচে ধরে কাছে টেনে আনল। 'কারা তোমরা?'

'ইচ্ছে হলে মেরে ফেলো আমাকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা। 'আমার পরিচয়? আমি একজন যৌনকর্মী, প্যারিসে কাজ করি–এলিসি প্রাসাদের আশপাশের গলিতে হেঁটে হেঁটে খদ্দের যোগাড় করি।' ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। 'ওদেরকে চিনি না। টাকার লোভ দেখাল, তোমাকে এখানে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেলাম। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

মেয়েটার কথা প্রায় সবটুকুই বিশ্বাস করল টিচার। ধাক্কা দিল

সে, ছিটকে কাঠের মেঝেতে পড়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল লিনা ওয়াং।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কুঁড়ের সামনের দুশো গজ পর্যন্ত কোথাও কিছু নড়তে দেখছে না টিচার। কুঁড়ের পিছনে লোকগুলো হয়তো এখনও আসেনি, বা এখুনি হয়তো আসবেও না। পাহাড়ের ভিতের ডান পাশে একটা বিশাল বোল্ডার দেখা যাচ্ছে, বোল্ডারের আরেক পাশে ডেবে আছে তুষার ঢাকা ঢালের সারফিস, টিচার আন্দাজ করল লোকগুলো ওদিকে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় আছে। আর দেরি করা চলে না। দরজার দিকে এগোল টিচার। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মনটা খুঁত-খুঁত করছে। আধ পাক ঘুরে ফিরে এলো ফায়ারপ্লেইসের পাশে, কাবার্ড দুটো পরীক্ষা করে দেখবে কোন অস্ত্র বা আর কিছু পাওয়া যায় কিনা।

প্রথম কাবার্ডে তেমন কিছু নেই–মোমবাতি, টিনে ভরা খাবার, পালক ভরা লেপ, এই সব।

দ্বিতীয় কাবার্ডে তালা দেয়া।

দরজার গায়ে একটা হাঁটু ঠেকাল টিচার, তারপর অপর পায়ের স্কি বুট দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে লাথি মারল। তালার চারদিক থেকে বিস্ফোরিত হলো কাঠের টুকরো, সেই সঙ্গে দড়াম করে খুলেও গেল দরজাটা। এরপর যা দেখল টিচার, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। স্বচ্ছ লন্ড্রী ব্যাগে মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে। বিবস্ত্র। মৃত। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাতলা পলিথিনে রক্তের কুৎসিত দাগ লেগে রয়েছে।

ঝট করে লিনা ওয়াং-এর দিকে তাকাল টিচার। ওর চোখে-মুখে আতংকে হতবিহ্বল ভাব প্রাণে বাঁচিয়ে দিল তাকে। ঘটনাচক্রের এই অন্তত একটা মোড় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

ঘর্ঘর শব্দ তুলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোল টিচার,

ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। দুপুরবেলার রোদ ঝুলে থাকা বরফের ঝুরি গলিয়ে ফেলার মত যথেষ্ট গরম, কিনারা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা ছাদের বাড়তি অংশ বরাবর রেখা ধরে নিচে একটা এবড়োখেবড়ো পরিখা তৈরি হয়েছে। ছোঁ দিয়ে স্কিগুলো তুলল টিচার–দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল–তারপর সজোরে পায়ের সামনে তুষারের ওপর ফেলল। ধুত্তোর! ওর একটা বুটে বরফ জমেছে। হাত দিয়ে সরাতে বা ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে স্টিকের ডগা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারল টিচার। জমাট বরফ লোহার মত শক্ত, ভাঙার জন্যে বেশ কয়েকটা খোঁচা লাগল। অবশেষে বুটের ভেতর পা ঢোকানো সম্ভব হলো।

ক্লিক!

বুটের কোন বাইন্ডিং গ্রিপ থেকে নয়, শব্দটা হলো একটা কারবাইন কক্ করায়। নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশন, ঝট করে মাথা নিচু করল টিচার; যেখানে মাথা ছিল বুলেটটা সেখানকার কিছু কাঠের টুকরো ছড়িয়ে দিল তার গায়ে। একটা স্কি এখন নিয়ন্ত্রণে, টিচার অপর স্কিটা লাথি দিয়ে সামনে ঠেলে দিয়ে ভেতরে পা গলাবার জন্যে এক পায়ে লাফিয়ে এগোল, তাকে যাতে প্রতিপক্ষরা সহজ টার্গিট হিসেবে পেয়ে না যায়। এক স্কিতে হড়কাচ্ছে টিচার, দ্বিতীয়টা নাগালের মধ্যে চলে এলো, পা নামাচ্ছে যতক্ষণ না বাইন্ডিঙের সঙ্গে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বুলেটটা তার পায়ের দু'ফুট পিছনে তুষার ছড়াল। বৈদ্যুতিক শকের মত সারা শরীর অবশ করে দিচ্ছে ভয়। বুট যদি বাইন্ডিং-এ না ঢোকাতে পারে...ডান হাঁটুর ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল, দিগ্‌ভ্রান্ত স্কিকে সোজা করে বুটের ডগা ঠেলে দিল প্রসারিত ধাতব C-র নিচে, ওটা ফ্রন্ট রিলিজ মেকানিজম নিয়ন্ত্রণ করে। গোড়ালি আগুপিছু করছে। তারপর মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো ব্যাক রিস্ট্রেইন্ট-এর স্প্রাং প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে। দ্রুত দম নিয়ে চাপ দিল নিচে। অটোমেটিক স্টপ

বাধা ঠেকিয়ে রাখছে, তারপর ক্লিক করে নিচু হলো। বুট আটকেছে।

স্কি দুটো হড়কে স্তূপ করা ও তুষারে ডোবা গাছের কিছু কাণ্ডের পিছনে নিয়ে এলো টিচারকে, এখানে থেমে সামনের খোলা জায়গাটার ওপর চোখ বুলাল সে। স্কির ওপর দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে, সামরিক উর্দির আদলে তৈরি সাদা ওয়ান-পীস সুট পরেছে, মাথায় হুডসহ। দু'জনের হাতেই অটোমেটিক রাইফেল রয়েছে, একজন ভালভাবে লক্ষ্যস্থির করার জন্যে তুষারে হাঁটু গেড়েছে। টিচার গাছের কাণ্ড ও গুঁড়ির আড়ালে সরে এলেও, একটা বুলেট সরাসরি ওগুলোয় এসে লাগল, একরাশ তুষার উড়ল বাতাসে। লাফ দিয়ে বাঁক নিল টিচার, ছুটল, যাচ্ছে তির্যক একটা পথ ধরে মেয়েটার সঙ্গে যে ঢাল ধরে এখানে পৌঁছেছে সেটার দিকে। স্পীড বাড়িয়ে ঝাঁপ দেয়ার পজিশনে চলে এলো টিচার, এতে টার্গেট হিসেবে অত্যন্ত ছোট দেখাবে তাকে, বাড়তি গতিবেগের কারণে লক্ষ্যস্থির করতেও হিমশিম খেয়ে যাবে প্রতিপক্ষ। কয়েক মুহূর্তের বিরতিতে নিজের হার্টবিট শুনতে পেল সে, তারপরই শিস দিয়ে ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা বুলেট। বাঁক নেয়ার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে এক চুল বেশি উঁচু করল না শরীর। তারপর ঢালের আরও খাড়া অংশে চলে এলো।

এক সেকেন্ডের মধ্যে টের পেয়ে গেল একটা ভুল করে বসেছে।

যে বুলেটটা বুট বাক্‌লে লেগে দিক বদলাল সেটা এসেছে তার নিচের দিক থেকে। প্রথম দু'জন আসলে খেদাড়ে, খেদিয়ে ওকে তৃতীয়জনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কুঁড়ে থেকে ওদের স্কির দাগ দেখা গেছে, ওরা দেখিয়েছে বলে। ওই দাগ দেখে টিচার কিভাবে পালাবার চেষ্টা করবে, ওরা জানত। সেভাবেই ফাঁদটা পাতা হয়েছে।

সেই ফাঁদেই পড়তে যাচ্ছে টিচার।

এখন তৃতীয় লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে সে, তার ডান দিকে পঞ্চাশ গজ নিচে। ওর কাছেও একটা রাইফেল রয়েছে, তবে তাক করার কোন লক্ষণ নেই। লোকটা আসলে টিচার কি করে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। থামবে, নাকি ক্লোজ রেইঞ্জে চলে আসবে।

চট করে পিছনটা একবার দেখে নিল টিচার। ঢালের কপালে বাকি দু'জনের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিচে, দু'পাশেই, এবড়োখেবড়ো চূড়া মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে—সরু একটা করিডরে ঢুকতে হবে তাকে। ওই করিডরে ঢোকার মুখে পাহারা দিচ্ছে তৃতীয় লোকটা। টিচারের বগলের তলায় ঠাণ্ডা ঘামের যেন পা গজিয়েছে। জলদি কিছু একটা করো, ইডিয়েট! নিজের ভুলে ফেঁসেছ, এখন নিজের চেষ্টায় বাঁচো!

চারদিকে প্রচুর তুষার ছড়িয়ে থামল টিচার, স্টিকের রিস্ট্রেইনিং স্ট্র্যাপের নিচ থেকে ডান হাত বের করে আনল। স্টিকটা হালকাভাবে ধরে আছে, ওটার সঙ্গীর মতই শরীর থেকে তফাতে; ধীরগতিতে স্কি চালিয়ে লোকটার দিকে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে চেহারায় যতটা সম্ভব নিরীহ ভাব ফোটানোর।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল খানিকটা তুলে আবার নামিয়ে নিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে বিমূঢ়। টিচার কি আত্মসমর্পণ করছে? ওর কি গুলি করা উচিত, নাকি অপেক্ষা?

'পথ ভুলে আমি কি সীমান্তে চলে এসেছি?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় চিৎকার করে জানতে চাইল টিচার। 'বিদেশী অতিথি কোন উপকার চাইতে পারে?' লোকটার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে সে, ওর কঠিন ও শীতল চোখে খুনের নেশা দেখতে পেল।

রাইফেল উঠে আসছে। খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা।

টিচার তার ডান হাতের স্টিক তুলল এমন এক ভঙ্গিতে, দেখে নিশ্চয়ই মনে হলো সতর্ক হবার তাগাদা দিচ্ছে। তার

আঙুলগুলো কিলবিল করে খুঁজে নিল, তারপর মোচড় দিল এমন এক পয়েন্টে, শ্যাফট যেখানে গ্রিপ-এ মিলিত হয়েছে। কিছু একটা সরে গেল, দস্তানা পরা বুড়ো আঙুলে চাপ অনুভব করল টিচার। মেশিন কারবাইনের ব্যারেল তার হৃৎপিণ্ড বরাবর সরাসরি একই রেখায় রয়েছে, লোকটার কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকল। ভয়ে ঘাম ছুটে যাচ্ছে, মরিয়া হয়ে ধাতব নার্ভটায় চাপ দিল টিচার। হলুদ একটা ভয়ংকর আলোর ঝলক দেখা গেল, সেই সঙ্গে লোকটার বিশ ফুট পিছনে রক্ত ও নাড়ীভুঁড়ির তৈরি একটা চাদর উড়ে গেল বাতাসে সপাং করে চাবুক মারার শব্দ তুলে। স্কি স্টিকের ধূমায়িত শেষ প্রান্ত বরাবর তাকিয়ে রাইফেলটা খসে পড়তে দেখল টিচার। লোকটার হাত দুটো নিজের অজান্তে নেমে এলো কুৎসিত, অশ্লীল গর্তটার মুখে। চেহারায় অবিশ্বাস ও বিহ্বলতা। মৃত্যুর আগে দু'পা পিছাল। তারপর ঢলে পড়ল লাল তুষারে। গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেন্ডে, তবে টিচার জানে এই মৃত্যুর দৃশ্য বাকি জীবন তার স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে থাকবে।

পিছন থেকে আরেকটা গুলি হলো, লক্ষ্যভেদে আগেরগুলোর মতই ব্যর্থ। নিচু হলো টিচার, পাথুরে চূড়ার মাঝখানে ঢুকে করিডর ধরে স্কি ছোটাল। গতি বাড়ার পর হাঁটু জোড়াকে আলিঙ্গন করায় তার আকৃতি হলো নিখুঁত একটা ডিম।

নিহত সঙ্গীর দিকে মনোযোগ নেই, লোক দু'জন তাকিয়ে আছে দ্রুতগতি টিচারের দিকে। তাদের একজন তুষারে হাঁটু গেড়ে রাইফেল তুলল আবার। দ্বিতীয় লোকটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল ব্যারেলটা, তারপর সঙ্গীর উদ্দেশে হাসল, ইঙ্গিতে করিডরটা দেখিয়ে বলল, 'আইগুইলি দু মোর্ট।'

এই পাহাড়শ্রেণীর মাথায়, ফরাসী দিকটায়, আগে কখনও না ওঠায় টিচারের জানার কথা নয় যে কুঁড়েটা আসলে আইগুইলি দু মোর্ট পাহাড় চূড়ার একদম কাছে; লিনা ওয়াং চি শুধু শুধু অত

দূরে তাকে নিয়ে কপ্টার থেকে নেমেছিল।

আত্মরক্ষার তাগিদে স্কির গতি প্রতি মুহূর্তে শুধু বাড়িয়েই চলেছে টিচার। ঢাল এদিকে ক্রমশ আরও ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তার নিচে উন্মুক্ত কিনারা। এরপর আর কোন ঢাল নেই। তার স্কি দুটো বরফে সেঁটে আছে, তরঙ্গবহুল সাগরে দ্রুত ধাবমান মোটর বোটের মত অনবরত চাপড় মারছে। হৃৎপিণ্ড ধক-ধক করছে, ঢাল আরও ঢালু হয়ে আসায় অনুভূতি হলো সে যেন খসে পড়তে সরু করা একটা পাথর, সেই পতনের প্রচণ্ড গতি চোখ থেকে গগল্‌স্‌ খুলে নেয়ার হুমকি হয়ে দাঁড়াল। তার নিচে খোলা কিনারা, হাঁ করা চওড়া মুখ। তারপর? আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে জানতে পারবে সে, যদি না সরু করিডরের দু'পাশে কোন এবড়োখেবড়ো পাথরে ধাক্কা খেয়ে খুলি বা হাত-পা ভাঙে। স্প্রিঙের মত নিজেকে কুণ্ডলী পাকাল টিচার, তারপর–আর তারপর···কিছু নেই। পায়ের নিচ থেকে অদৃশ্য হয়েছে তুষার। লাফ দেয়ার পর সে এখন শূন্যে। কয়েক হাজার ফুট নিচে কাটাকুটি দাগের মত লাগছে মানুষের তৈরি ঘর-বাড়ি ও রাস্তা-ঘাট–চামোনিক্স শহর। আইগুইলি দু মোর্ট-এর কিনারা থেকে স্কি নিয়ে লাফ দিয়েছে সে।

প্লেনের জানালা থেকে খসে পড়া কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত পাক খাচ্ছে টিচার। পতনের গতিবেগ ওর বুট থেকে একটা স্কি টান দিয়ে খুলে নিল, ফলে মোচড় খাওয়ায় তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল হাঁটুতে। তার প্রসারিত দুই হাত বাতাসে খামচি দিয়ে খানিকটা ভারসাম্য অর্জনের চেষ্টা করছে। কিন্তু একবার শুরু হবার পর দুনিয়ার ঘোরাটা আর থামছে না–গ্র্যানিট, আকাশ আর তুষার ছাড়া দেখার কিছু নেই। বাতাস আর্তনাদ করছে। এরকম স্বপ্নে একবার ঘটেছিল। অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি, তারপর পতন, শুধু নেমে যাওয়া, শুধু নেমে যাওয়া। কিন্তু স্বপ্নে মানুষ পাথরের ওপর একটা পাখির মত ডানা ঝাপটে বসার আগে জেগে ওঠে।

টিচার তার ডান হাত বাম কাঁধের পিছনে নিয়ে যাবার কসরৎ করছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় স্কিও খুলে গেছে, ফলে তার পতনে খানিকটা শৃংখলা দেখা দিয়েছে। আঙুলের ডগা হ্যাভারস্যাকের কিনারা ছুঁলো, পরমুহূর্তে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। টিচারের মনে হলো কয়েক মিনিট ধরে শূন্যে পা ছুঁড়ছে সে। হাত দিয়ে কাঁধ খামচে ধরল, আবার মরিয়া হয়ে হাতড়াচ্ছে। এবার আঙুলে কিছু একটা ঠেকল। একটা অর্ধ-বৃত্তাকার মেটাল। সেটায় টান দিয়ে চোখ বুজল সে।

অকস্মাৎ তার পিছনে কি যেন মেশিন গানের মত শব্দ করল। প্রথমে দেখা গেল গাঢ় সবুজ কিছু একটা ফুলছে, ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে তার মাথার ওপর সবটুকু আকাশ। যেন প্রকাণ্ড একটা হাত তাকে ঘাড়ের পিছনে ধরল, তারপর দুনিয়াটাকে স্থির করে দিল চোখের সামনে। পতনের গতি ভোজবাজির মত কমে গেছে, এবং হঠাৎ দেখতে পেল তার নিচে বুট জোড়া ঝুলছে। এখন দম নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে সে। তাই মুখ তুলে আরেকবার মাথার ওপর তাকাল। সবুজ কাপড়টা সিল্ক, মাঝখানে রক্ত লাল সূর্য; মাইকেল টিচার ওরফে মাসুদ রানা উপলব্ধি করল সে বেঁচে আছে।

চামোনিক্স শহর থেকে প্রায় ন'হাজার ফুট ওপরে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের দুর্ধর্ষ এজেন্ট তাওজি হুতাও হাঁ করে শুয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছে শরীরের গর্ত থেকে বেরিয়ে তুষারের একটা গর্তে ঢুকে যাচ্ছে তার সমস্ত রক্ত। ঘুম পাচ্ছে তার। জানে এটাই জীবনের শেষ ঘুম। আরও জানে নিনা সুসমির সঙ্গে তার আর দেখা হলো না।

দুই

'তাহলে বলতে হয় বিসিআই সায়ান্টিফিক ডিপার্টমেন্ট ভাল গ্যাজেটই তৈরি করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

'জ্বী, সার, খুবই কাজের জিনিস,' বলল রানা, হাতলবিহীন চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে। আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল, ফ্রান্স থেকে সরাসরি বাংলাদেশে ফিরে এসেছে ও। সকালে ঢাকায় প্লেন থেকে নেমেছে, দুপুরে অফিসে পৌঁছে বসের চেম্বারে ঢুকে মৌখিক রিপোর্ট দিচ্ছে। জানে বস্ বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না, তাই মুখ খোলার আগে প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকে ও।

রাহাত খান পাইপে নতুন করে তামাক ভরে দেশলাই জ্বাললেন। একরাশ নীলচে ধোঁয়া সিলিঙের দিকে উঠে যাচ্ছে। 'তোমার লিখিত রিপোর্ট দেখে সায়ান্টিফিক ডিপার্টমেন্টের সবাই খুব খুশি হবে। টেস্ট করতে গিয়ে তুমি যে ওগুলো দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবে, এ তারা নিশ্চয়ই ভাবেনি। তবে ওদের একটা জিনিস, গাড়িটা তোমার টেস্ট করা হলো না।'

'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়, সার। চীন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের ডেপুটি, অপারেশন্যাল চীফ, লিউ ফু-চুং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অথচ ঘটনাটা ঘটার পর আমি জানতে পেরেছি...'

মুখ তুলে এজেন্ট এমআরনাইন-এর দিকে তাকালেন রাহাত

খান, কথার মধ্যে প্রকাশ না পেলেও চোখ দুটোয় ঠিকই স্নেহের প্রকাশ ঘটল। 'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তবে ওখানে যা ঘটেছে সে-সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স-এর একটা ফ্যাক্স রিপোর্ট আমরা পেয়েছি।'

'কি করতে চায় ওরা?'

'কিছুই না।' রানার ভুরু জোড়ার দ্রুত উত্থান খেয়াল করলেন রাহাত খান। 'ওরা ব্যাপারটাকে স্থানীয় পুলিসের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। ও-ধরনের কুঁড়েতে আগুন লাগা নতুন কিছু নয়।' রানা এখন চেয়ারের সামনের অংশে বসে আছে। 'তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি যে ওখানে পেট্রল রাখা ছিল, স্নোক্যাট-এর জন্যে। বয়সে তরুণ, নিশ্চয়ই তারা আগুন জ্বালতে চেষ্টা করে...জানোই তো, পেট্রল কি রকম বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'একটা ছেলে আর একটা মেয়ে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। নিজেদের পরিচয় ও চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছে তারা। যে লোকটাকে ও গুলি করেছে, আর যে মেয়েটার লাশ কাবার্ড থেকে গড়িয়ে পড়ে–পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দু'জনেই।

'পুরুষ একজনই, তবে মেয়ে দুটো,' বললেন রাহাত খান। 'শরীরগুলো এমনভাবে পুড়েছে যে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। আপনজনেরা কেউ এগিয়ে না আসা পর্যন্ত পরিচয় পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

রানা ভাবল, অপেক্ষাই সার হবে, কেউ আসবে বলে মনে হয় না। লিনা ওয়াং চি তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল। রাস্তার মেয়ে সে, একজন যৌনকর্মী; মোটা টাকার লোভে কঠিন একটা কাজ করতে গিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি, তারই পরিণতিতে দিতে হয় চরম মূল্য। ও সিদ্ধান্ত নিল, নিজের অনুভূতি গোপন করবে না। 'আমি খবর পেয়েছি কাজটা চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের, স্যার,' বলল রানা। 'কি কারণে জানি না, আমাকে খুন

করার জন্যেই এই ফাঁদটা পাতে ওরা। কুঁড়েটায় মরা একটা মেয়ে ছিল। ড্রাগ অ্যাডিক্টেড কোন যৌনকর্মী, সম্ভবত। ওরা তাকে খুন করে হাঙরের টোপ বানাবার জন্যে।'

'আর সেই হাঙরটা ছিলে তুমি।' মাথা দোলালেন, রাহাত খান গম্ভীর। এই মুহূর্তে হঠাৎ করেই তাঁর মাথায় চিন্তাটা উদয় হলো। রানা অবশ্যই ভাগ্যবান। হ্যাঁ, এবারও এমআরনাইন মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে। নেপোলিয়ানই তো, না, যিনি সব সময় তাঁর একজন মার্শালকে সমর্থন করতেন এই কারণে যে লোকটা খুব লাকী ছিল? 'এ নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। স্রেফ একটা ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা, রানা। ওরা বলছে...'

'ঠিক বুঝলাম না, সার,' উত্তেজনা ও রাগ চেপে রাখল রানা। 'এতক্ষণ মরে ভূত হয়ে যেতাম, আর ওরা বলছে দুর্ঘটনা?'

'শুধু বলছে না, হাজার বার ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছে–মুখে, ফ্যাক্সে, চিঠিতে–তোমার বন্ধু লিউ ফু-চুং ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে ঢাকায় আসতে চেয়েছে, তবে আমি বলেছি তার কোন দরকার নেই।'

'এরকম একটা মারাত্মক ভুল হলো কি করে, ওরা ব্যাখ্যা করেনি?' রানা এখন অনেকটাই শান্ত।

'তোমার এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাকে শোনাও নুমা আর সিআইএ তোমাকে জিব্রালটারে কেন ডেকেছিল। তুমি নিহত সিআইএ এজেন্ট মাইকেল টিচারের ছদ্মবেশই বা কেন নিয়েছিলে?'

রানা অবাক। 'আপনার নির্দেশেই তো জিব্রালটারে আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ব্যাপারটা কি নিয়ে আপনি জানতেন না?'

'জর্জ হ্যামিলটন বন্ধু মানুষ। বলল, দু'দিন অপেক্ষা করো, রানার মুখ থেকেই সব জানতে পারবে। ওদিকে তুমি তো ছুটিতে

যাচ্ছিলেই, তাই ভাবলাম ওদের অনুরোধ তোমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব।'

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল রানা। শুরু করল একটা প্রশ্ন দিয়ে। 'আপনি তো সার এমারেল্ড ডলফিনের নাম শুনেছেন, তাই না?'

রাহাত খান ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

এমারেল্ড ডলফিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা রেজালিউশন ক্লাস নিউক্লিয়ার-পাওয়ার্ড ব্যালেস্টিক-মিসাইল সাবমেরিন। দৈর্ঘ্যে তিনশো সত্তর ফুট। চওড়ায় তেত্রিশ ফুট। ভাসমান অবস্থায় পানির স্থ্যানচ্যুতি অর্থাৎ সারফেস ডিসপ্লেইসমেন্ট সাত হাজার পাঁচশো টন, জলমগ্ন অবস্থায় আট হাজার চারশো। স্পীড সম্পর্কে বলা হয় সারফেসে বিশ নট, পানির নিচে পঁচিশ–যদিও পানির নিচে স্পীড কমের দিকেই থাকার কথা। সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিনে কাজ করে একশো একান্নজন মানুষ; ষোলোজন অফিসার, একশো পঁয়ত্রিশজন রেইটিং।

'ওটার আর্মামেন্ট সম্পর্কেও তো জানেন আপনি।'

এবারও ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন বস্।

অস্ত্রের তালিকা তেমন দীর্ঘ নয়, তবে ভীতিকর। ছয়টা কনভেনশন্যাল ৫৩৩ এমএম টর্পেডো হোমিং টিউব রয়েছে সামনের অংশে। আর আছে ষোলোটা পোলারিস সারফেস-টু-সারফেস ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল দশ হাজার সাতশো মাইল রেইঞ্জ নিয়ে, পঞ্চাশ থেকে একশো মেগাটনের ষোলোটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ।

রাহাত খান শান্ত, তবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এজেন্টের দিকে। রানা লক্ষ করল, বসের পাইপ নিভে যাচ্ছে। বলল, 'এমারেল্ড ডলফিন হারিয়ে গেছে, সার।'

'বলতে চাইছ, কোনও ধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে?'

'মার্কিন নৌ-বাহিনী তা জানে না। রেডিও যোগাযোগ

অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তারপর একদম লাপাত্তা।'

'নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যে যাচ্ছিল?'

'জ্বী, সার। নিউ ইয়র্কের নৌ-ঘাঁটি থেকে রওনা হয়। আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে জিব্রালটারের ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢুকে পৌঁছানোর কথা ইজরায়েলের কোন এক বন্দরে। কিন্তু জিব্রালটার গলে বেরুবার পর থেকে ওটা নিখোঁজ। বহু চেষ্টা করেও কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওদের কি ধারণা, কোন ধরনের স্যাবটাজ?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। রানা ভাবল, বসের গলায় কি অতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রেশ লেগে রয়েছে? 'ভাবছে, এ-ও বিন লাদেনের পালটা আঘাত?'

'জ্বী। বলছে, এ নিশ্চয়ই আল কায়েদার কাজ...'

'কি চাইছে ওরা? তোমাকে কেন ডেকেছিল?'

'চারদিকে অন্ধকার দেখছি–ঠিক এই ভাষায় পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে দুনিয়ার সবার সাহায্য চাইছেন ওঁরা,' শুরু করল রানা। 'বলছেন অ্যাস্টরয়ড পতনে ডাইনসর নিশ্চিহ্ন হবার পর পৃথিবী নাকি এত বড় বিপদে আর কখনও পড়েনি। ওই ষোলোটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে, উত্তর আমেরিকা নামে মহাদেশটাকে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে...'

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে হেসে উঠলেন রাহাত খান। তারপর বললেন, 'ওদের বুঝি ধারণা আমেরিকা ধ্বংস হয়ে গেলে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে?' হাসিটা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বিরল একটা ঘটনা, আবার তিনি গম্ভীর হয়ে পাইপে অগ্নি সংযোগে মনোনিবেশ করলেন। 'দুনিয়া অনেক বদলে গেছে, রানা। ওদের যুদ্ধংদেহি ভাব কেউ মেনে নিতে পারছে না। এখন আর আগের মত অনুরোধ করলেই ওদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারব না।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। সিলিঙের দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তবে এই ব্যাপারটা বোধহয় একটু অন্যরকম, আমরা

হয়তো সাহায্য করতে বাধ্য হব। তবে আগে আমাকে জানতে হবে ওরা আর কি জানে। এত থাকতে বিসিআই-কে আলোচনায় ডাকার কারণ কি?'

'ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটা মেসেজ পেয়েছে পেন্টাগন–ভাষাটা বাংলা, তবে রোমান হরফে লেখা। মেসেজটা পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে।'

'কি বলা হয়েছে মেসেজে?' এই প্রথম ভুরু কোঁচকালেন রাহাত খান।

'মেসেজের পাঠোদ্ধার করতে হিমশিম খেয়ে গেছে পেন্টাগনের ভাষাবিদরা,' বলল রানা। 'তেমন কিছুই বলা হয়নি, শুধু অশ্রাব্য গালাগালি করা হয়েছে আমেরিকাকে–তাও সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম, বগুড়া আর নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায়। সমস্ত গালিগালাজ থেকে মাত্র এক লাইনের একটা বক্তব্য বের করা সম্ভব হয়েছে, তা হলো–বহুত বাড় বাড়ছস, কাইট্টা তরে সাইজ করতাছি, খারা।'

বিরল হলেও, বসের হাসি আরেকবার শুনতে পাবে, ভাবল রানা; কিন্তু ওকে হতাশ করে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'এদিকে এসো, রানা। কায়রো থেকে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে একটা জিনিস পাঠানো হয়েছে, তোমাকে দেখাতে চাই।' হঠাৎ করে তাঁর মুখের রেখা আর ভাঁজগুলো আরও যেন গভীর হয়ে উঠল।

দেরাজ খুলে একটা লেদার ম্যাপ-কেইস হাতে নিলেন রাহাত খান। ভেতর থেকে বের করলেন আঁট-সাঁটভাবে গোল পাকানো, সিলিন্ডার আকৃতির একটা সেমি-ট্র্যান্সপ্যারান্ট পার্চমেন্ট। ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে বসের পাশে চলে এসেছে রানা। ডেস্কের সারফেসে তাকিয়ে বুঝতে পারল, ওকে ব্রিফ করার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে ওটা। বড়সড় এক প্রস্থ কাঁচের নিচে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের চার্ট দেখা যাচ্ছে, একপাশে

পশ্চিম আফ্রিকার কোস্ট লাইনের এবড়োখেবড়ো পরিচিত আভাস। কালো ও সরু একটা রেখা বারবার উঁচু-নিচু হতে হতে উত্তর থেকে পুবদিকে এগিয়েছে।

'নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়ে এই কোর্স ধরে জিব্রালটারের দিকে রওনা হন ক্যাপটেন ওয়েফার, সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিনের কমান্ডার,' বললেন রাহাত খান, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে কালো রেখাটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কথাটা শুনে দ্রুত মুখ তুলল রানা। 'সার, ওঁরা বলছেন এমারেল্ড ডলফিনের কোর্স কমান্ডার ওয়েফার আর নিউ ইয়র্কের হেড অভ অপারেশন্স ছাড়া আর কেউ জানে না, কোথাও কোন ফুটো থাকারও কোন আশঙ্কা নেই। সেক্ষেত্রে আপনি জানলেন কিভাবে?'

রাহাত খান কাজে ব্যস্ত, জবাব দিলেন থেমে থেমে হালকা সুরে। 'তুমি যখন ফ্রান্সে, এদিকে কিছু ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে মার্কিন নৌ-বাহিনী, পরে পেন্টাগনের কাছে সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিনের কোর্স জানতে চাইলাম, কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল ওরা। তারপর মনে পড়ল নুমা তো ওদের প্রেসিডেন্টের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও নিউক্লিয়ার পাওয়ারড্ সাবমেরিনের গতিবিধি মনিটর করে। জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিলাম, তারপর জানতে চাইলাম এমারেল্ড ডলফিনের কোর্স। সে কোন রকম দ্বিধা না করেই জানিয়ে দিল।'

পার্চমেন্টটা নিয়ে একটু ঝামেলা পোহাতে হলো রাহাত খানকে। তবে শেষ পর্যন্ত ওটাকে আটকাতে সমর্থ হলেন এক প্রান্তে ভারী অ্যাশট্রে, অপর প্রান্তে একটা লেদার পেন-হোল্ডার ও কালির দোয়াত বসিয়ে—এই দোয়াত রানা আগে কখনও তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেনি। এ-ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকায় বসকে সাহায্য করার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখল ও। রাহাত খানের বিবেচনায় যখন মনে হলো পার্চমেন্টটা

ঠিক পজিশনে বসানো হয়েছে, এরপর তিনি অত্যন্ত সাবধানে ওটার ভাঁজ বা পাক খুলতে শুরু করলেন। ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে আছে রানা, দেখল একটা প্যাটার্ন বা উঁচু-নিচুরেখা উন্মোচিত হতে শুরু করেছে, চার্টের সঙ্গে মিল আছে, তবে হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়—যেন সস্তা কোন ম্যাগাজিনের চার রঙা ছবির রিপ্রডাকশন। বিসিআই চীফ পার্চমেন্টটা সবটুকু মেললেন, তারপর বাম দিকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনলেন যতক্ষণ না দুটো রেখা মিলিত হলো, একটার ওপর আরেকটা। পার্চমেন্টের রেখাটা এমন এক জায়গায় এসে থেমেছে, চার্টের রেখায় ঠিক ওই জায়গায় একটা ক্রসচিহ্ন আঁকা। ওই ক্রসচিহ্ন ওখানে আঁকা হয়েছে, কারণ ওখান থেকেই নিখোঁজ হয়েছে ষোলোটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ মার্কিন সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিন। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে বাকি পথ পাড়ি দিতে পারেনি ওটা।

'ইন্টারেস্টিং,' বিড়বিড় করল রানা।

'এর তাৎপর্য তুমি বুঝতে পারছ?'

'দুটোর একটা, সার। হয় মার্কিন নৌ-বাহিনীতে কোন বেঈমান আছে, তা না হলে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের কোর্স কেউ বদলে দিতে পারে।'

রাহাত খান পাইপের দিকে তাকালেন, তারপর সেটা তামার অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলেন। 'রানা এজেন্সির কায়রো শাখা শেষেরটাই বলছে। এই ট্র্যাকিং সিস্টেম যান্ত্রিক জলদানব ধরার ফাঁদ। স্কি স্টিক, বুট, ওয়াকিং স্টিক, কলম ইত্যাদি থেকে ছোঁড়ার উপযোগী রকেটের ডিজাইন তৈরিতে ব্যস্ত না থাকলে সায়ান্টিফিক ডিপার্টমেন্ট আমার চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারত ব্যাপারটা। তবে শুনলাম ওরা বলছে—"হিট সিগনেচার রিকগনিশন" বলে কি যেন একটা আছে। আসলে জিনিসটা কি তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ইনফ্রারেড সেনসরসহ স্যাটেলাইটগুলো লেজের আগুন সনাক্ত

করে যে পদ্ধতিতে একটা মিসাইলের ফ্লাইট অনুসরণ করতে পারে, এটাও সেই একই পদ্ধতিতে কাজ করে। আমার ধারণা…কেউ একজন…পিছনের পানিতে রেখে যাওয়া আলোড়ন সনাক্ত করে জলমগ্ন নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের অবস্থান জেনে নিতে পারছে।'

রানা অনুভব করল কামরাটা আগের চেয়ে ঠাণ্ডা লাগছে। 'আর কায়রোর লোকগুলো? এত থাকতে তারা রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই,' রাহাত খান বললেন।

'কি বিক্রি করতে চায় তারা? আর এমারেল্ড ডলফিন…ওটার কি পরিণতি হয়েছে?'

'সাবমেরিনটার পরিণতি সম্পর্কেও আমাদের কোন ধারণা নেই,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা শুধু জানি যে কায়রোর এক লোক ওই ট্র্যাকিং সিস্টেমের একটা ব্লুপ্রিন্ট আমাদের কাছে বিক্রি করতে চাইছে।' পাইপে আবার টোব্যাকো ভরার প্রক্রিয়া শুরু হলো। 'এরপর সোহেল বিস্তারিত আর যা জানার জানাবে তোমাকে। তবে তোমাকে আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটা আগেই করেছি, এখনও জবাব দাওনি।'

রানা জবাব দিল, 'চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস ভুল করেছে, সার। আমি সিআইএ এজেন্ট মাইকেল টিচারের হুবহু ছদ্মবেশ নিইনি, তবে নামটা ব্যবহার করেছি।'

'কেন?'

'রোমান হরফে লেখা আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় পাঠানো মেসেজ পাবার পর পেন্টাগন মিস্টার জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কারণ ওরা জানে যে আমি বিসিআই এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। মিস্টার হ্যামিলটন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, বলেন জিব্রালটারে আমি যেন একজন শ্বেতাঙ্গ সেজে যাই, কারণ তাঁর সন্দেহ সাবমেরিনটা

নিখোঁজ হবার সঙ্গে কোন বাঙালীর সম্পর্ক থাকতে পারে। সেই বাঙালী কালপ্রিট যেই হোক, আমার গতিবিধির ওপর তার নজর থাকতে বাধ্য—বললেন তিনি।'

'হুঁ।'

'আমার কমপিউটরে টিচারের ফটো ছিল,' বলল রানা, এখনও শেষ হয়নি ওর কথা। 'সেটা দেখে ছদ্মবেশ নিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করে অমিলও রাখলাম বেশ কিছু। যেমন—টিচারের চুল পুরোপুরি সোনালি ছিল না, অর্ধেক ছিল সাদাটে; সে চশমা পরত, আমি পরিনি; তার চোখ ছিল সবুজ, আমার কন্টাক্ট লেন্স ছিল নীল।'

'হুম। মারাত্মক ভুল করেছে ওরা। তবে ভুল ভুলই; ক্ষমা চাওয়ার পর ব্যাপারটা আমাদের ভুলে যেত হবে। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—পেন্টাগনে গালাগালি দিয়ে বাংলা ভাষায় মেসেজ পাঠাল কে? ওদের সাবমেরিনটাই বা কে চুরি করল বলে তোমার ধারণা?'

'কবীর চৌধুরী।'

'কেন? তাকে তোমার সন্দেহ হবার কারণ?'

'বেশ কিছুদিন হলো তার কোন খোঁজ-খবর নেই, অথচ চুপ করে বসে থাকার লোক তো সে নয়,' বলল রানা। 'বিরল একটা প্রতিভা, এরকম একটা ব্রেকথ্রু, যুগান্তকারী ট্র্যাকিং সিস্টেম আবিষ্কার তার পক্ষেই সম্ভব। তারপর ধরুন, মেসেজের ভাষা, কোত্থেকে পাঠানো হয়েছে।'

'হুম।' পাইপটা মুখে তুলতে গিয়েও তুললেন না রাহাত খান। 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে হবে—ষোলোটা নিউক্লিয়ার বোমা একটা পাগলের হাতে চলে গেছে। প্রতিটি বোমা সে ইচ্ছে করলে দশ হাজার মাইল দূরের টার্গেটে ফেলতে পারবে।'

'জ্বী, সার।'

'বোমাগুলো উদ্ধার বা অকেজো করা প্রথম কাজ, নাকি

পাগলটাকে মেরে ফেলা, সে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।'

'জ্বী, সার।'

'এখন তাহলে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ো, রানা।' রাহাত খান ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন।

চেয়ার ছেড়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, শুনতে পেল বিসিআই-এর আরেকজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট জাহিদকে ডেকে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন বস্। হয়তো তাকেও কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হবে। দেশের বিরুদ্ধে, ভেতরে ও বাইরে, একের পর এক ষড়যন্ত্র তো চলছেই।

তিন

কামরাটা বেশ বড়, ফার্নিচারগুলো বহুমূল্য অ্যান্টিকস্। গদি এত নরম আর পুরু যে চেয়ার তিনটেয় বসা লোকগুলো প্রায় ডুবে গেছে। মেহগনি কাঠের অলংকৃত নিচু ও লম্বা টেবিলে সোনা ও রুপোর তৈরি ফুলদানিতে শিশির-ভেজা লাল গোলাপ। টেবিলের একপাশে চুরুটের বাক্স, তুর্কী সিগারেটের প্যাকেট আর মোঘল আমলের আলবোলা দেখা যাচ্ছে। কামরার এক প্রান্তে ছোট বার, তাতে হরেক রকম দামী মদের বোতল সাজানো।

তিনজনের মধ্যে দু'জনের পরনে সুট, তাদের হাবভাবের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের কোন অভাব না থাকলেও দু'জনকেই অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছে। তাদের সামনে, টেবিলের উল্টোদিকে বসা লোকটার বেশভূষা ও আচরণ সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রথমত,

তার খুব সামান্য অংশই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ঢোলা আলখেল্লাটা কালো সিল্ক, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। গলায় জড়ানো মেরুন রঙের একটা উলেন চাদর। মাথায় পরেছে ফেজ টুপি, লাল, মোটাসোটা ঝুঁটিটা পিছন দিকে ঝুলে আছে। অর্থাৎ দেখা যায় শুধু চোখ দুটো। সেই চোখের তারা যেন জোনাকির মত জ্বলে, গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দীপ্তি ছড়ায়।

'ডক্টর প্রিয়রঞ্জন ভৌমিক, প্রফেসর মুসলিম ফারাজি,' কণ্ঠস্বরে আবেগ বা উষ্ণতার বড় অভাব। 'এবার আমার কাছ থেকে আপনাদের বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে।'

ডক্টর ও প্রফেসর ঘাবড়ে গিয়ে চট করে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর ঢোক গিলে আবার তাকাল তাদের সামনে বসা এ-যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, সেরা আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক কবীর চৌধুরীর দিকে।

'ভাই রে,' মাতৃভাষা বাংলাতেই বলল কবীর চৌধুরী, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর আপনারা তো জানেনই যে সমস্যার জড় পর্যন্ত কেটে ফেলি আমি।'

'সার,' ডক্টর প্রিয়রঞ্জন ভৌমিক বলল, 'আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, নিশ্চয়ই কারিগরি কোন ব্যাপারে—'

ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'সমস্যাটা টেকনিক্যাল নয়। ধাতব বা যন্ত্রপাতির কোন ব্যাপার হলে মেরামত করে নিতে পারতাম। কিন্তু এ যে হৃদয়ঘটিত সমস্যা। ভাঙলে সবই জোড়া লাগে, লাগে না শুধু মন। আমার মনটাই ভেঙে গেছে।'

'সার, আরও যদি একটু খুলে বলেন,' শুরু করল প্রফেসর ফারাজি।

ইশারায় তাকেও থামিয়ে দেয়া হলো। 'আপনারা আমার সর্বশেষ গবেষণায় প্রচুর সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি,

আপনাদের সাহায্য না পেলে এই সাবমেরিন ট্র্যাকিং সিস্টেম আবিষ্কার করতে আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হত আমাকে। ওটার প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সাফল্য লাভ করেছে।' দম নিল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আপনমনে মাথা নাড়ল যেন হতাশায় অসুস্থ বোধ করছে। 'সম্ভবত সাফল্যের মাত্রা একটু বেশিই হয়ে গেছে। হয়তো এরকম আশাতীত সাফল্য দেখেই আপনাদের মধ্যে কেউ লোভী হয়ে উঠতে এবং বেঈমানী করতে উৎসাহবোধ করেছেন।'

মুসলিম ফারাজির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

'আমার প্রিয় ভক্ত ও ভায়েরা, সংক্ষেপে গোটা ব্যাপারটা হলো,' বলে চলেছে কবীর চৌধুরী, 'আমি জানতে পেরেছি আমাদের এই অর্গানাইজেশনে একজন ট্রেইটর আছে। যে কিনা এমন কি এই মুহূর্তেও আমাদের আবিস্কৃত ট্র্যাকিং সিস্টেম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন সরকারের কাছে গোপনে বিক্রি করার প্ল্যান করছে।'

ঘরের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা আর টানটান উত্তেজনা। কথা বলবে কি, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে পাগল বিজ্ঞানীর দুই সহকারী ডক্টর প্রিয়রঞ্জন ভৌমিক ও প্রফেসর মুসলিম ফারাজি।

কবীর চৌধুরী তার মাথার পাশে খাড়া করল একটা হাত, সেটা ঘুরে গেল, ফলে হাতছানি দিয়ে যাকে ডাকা হলো ধরে নিতে হয় সে নিশ্চয়ই তার পিছনে কোথাও আছে। 'আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি এ-ব্যাপারে আরও বেশি আলোকপাত করতে পারবে। প্রমাণগুলো নিয়ে এসো, মিস সুরাইয়া। ওগুলো রূম টুসিক্স-এর সেফে রাখা আছে।'

পর্দার ওদিক থেকে যে মেয়েটা বেরিয়ে এলো তাকে রূপসী বলা না গেলেও, নিজের কাজে অত্যন্ত যোগ্য সে, তা না হলে কবীর চৌধুরীর মত খেয়ালী এবং অক্লান্ত যান্ত্রিক নৈপুণ্য প্রত্যাশী লোকের সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর কাজ করতে পারত না। পর্দার

ওপারে বসে ওদের মীটিঙের সমস্ত বিবরণ এতক্ষণ লিপিবদ্ধ করছিল সে। বেশিরভাগ সফল সেক্রেটারির মত সুরাইয়ার চেহারার মধ্যেও লুকানো আছে অতৃপ্তি, ঘৃণা, ক্ষোভ আর অপ্রাপ্তির বেদনা। সে তার বসের মতই, হয়তো তাকে খুশি করার জন্যেই, বেশিরভাগ সময় কালো ড্রেস পরে। এই যেমন আজ–কালো রঙের সুতি স্ল্যাকস আর হাতকাটা শার্ট পরেছে। কামরা থেকে দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে যাচ্ছে সুরাইয়া, তার দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী।

রূম টুসিক্স অস্বাভাবিক লম্বা ও সরু, প্রায় চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা পেইন্ট করা। আগে কখনও এখানে আসেনি সুরাইয়া, তাই কামরাটা খালি দেখে বিস্মিত হলো। তার ধারণা ছিল, এখানেই বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরী টপ সিক্রেট ডকুমেন্টগুলো রাখেন, যেগুলোয় এমনকি তারও চোখ বুলানো নিষেধ। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কামরার দূর প্রান্তে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মাত্রার একটা গুঞ্জন আর লাল আলোর ঝলক চমকে দিল তাকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অবশ্য পরমুহূর্তে স্বস্তি ফিরে পেল। ওগুলো নিশ্চয়ই কোন ধরনের সিকিউরিটি ডিভাইস হবে। কবীর চৌধুরী তাকেই যখন এখানে পাঠিয়েছেন, ধরে নেয়া চলে তার ওপর ওঁর বিশ্বাস আছে। কাজেই এখানে কোন বিপদ হবার ভয় নেই।

আলোর টানে এগিয়ে যাচ্ছে সুরাইয়া, সামনের ওটাকে একটা স্লাইডিং ডোর বলে মনে হলো তার। সেফটা নিশ্চয়ই ওই দরজার ওদিকে।

হঠাৎ তার পিছনে দড়াম করে ভরাট ও নিরেট একটা শব্দ হলো। চরকির মত অর্ধেকটা পাক খেলো সে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অবাক হয়ে সেদিকে এগোতে যাবে, মেশিনের সচল হবার আওয়াজ ভেসে এলো, সেই সঙ্গে সিলিং থেকে নেমে এলো গিলোটিন ব্লেডের মত একটা পার্টিশন, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে

তাকে ছুঁতে পারল না। কামরার আকার চারভাগের একভাগ হয়ে গেল।

সুরাইয়া ঘামতে শুরু করল। একটা বোতাম দেখতে পেয়ে আঙুলের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল কোন ধরনের অ্যালার্ম ভেবে। নেইলপলিশ লাগানো আধ ইঞ্চি লম্বা নখটাই শুধু ভাঙল, কোন লাভ হলো না। কোথাও কোন বেল বাজছে না।

তার বদলে স্লাইডিং ডোর অলস ভঙ্গিতে একপাশে সরে গেল। এই মুহূর্তে সুরাইয়ার সামনে এক প্রস্থ অবিচ্ছিন্ন কাঁচ, ওটা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত। দুঃস্বপ্নের ভেতর আছে ভেবে মাথা দোলাল সে, চোখের সামনে যা দেখছে বিশ্বাস করতে পারছে না। কাঁচের পিছনে পানি, পরিমাণে শত শত বা হাজার হাজার গ্যালন। আর মাছ, উজ্জ্বল রঙের ট্রপিকাল মাছ; ছুটোছুটি করছে একা বা দলবেঁধে। কুঁকড়ে গেল মেয়েটা, পিছু হটে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল। জায়গাটা ভীতিকর, রোমহর্ষক লাগছে তার; ভাবছে পানির ভয়ংকর চাপ এই কাঁচ কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে?

কি ঘটছে? কমপ্লেক্সের ইলেকট্রিক সিস্টেম, কবীর চৌধুরীর হেডকোয়ার্টারে যেটা আলো যোগান দেয়, ভেঙে পড়েছে? এখন যদি পানির চাপে কাঁচটা চুর চুর হয়ে যায়? সে চিৎকার করল, 'হেলপ মি!' তীক্ষ্ণ শব্দটা ছোট্ট কারাকক্ষে প্রতিধ্বনি তুলে তার নিজের কানেই ফিরে এলো।

'শান্ত থাকো!' বিড়বিড় করল সুরাইয়া। এগিয়ে এসে ট্যাংক-এর ভেতর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোথায় রয়েছে সে। আবছা অন্ধকারে কি যেন নড়ল। প্রথমে চেনা গেল না। মনে হলো ঈল মাছ। একটা নয়, কয়েকটা। তারপর চিনতে পেরেই তার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো। ঈল মাছ নয়, অষ্টভুজ এক সামুদ্রিক প্রাণী—অক্টোপাস্।

ধীরে ধীরে কাঁচের সামনে চলে এলো মস্ত অক্টোপাস্টা। হাত,

পা বা শুঁড় যাই বলা হোক—একেকটা যথেষ্ট লম্বা, অন্তত একজন মানুষকে অনায়াসে কয়েক প্যাঁচে জড়িয়ে ধরতে পারবে। গায়ে চাকা আকৃতির গিঁট আছে অসংখ্য। মূল শরীরটা নরম ও প্রায় গোল, চোখের নিচ থেকে বেরিয়েছে বাহুগুলো। অকস্মাৎ ওটার পাশে আরেকটা অক্টোপাস্ দেখতে পেল সুরাইয়া। আরেকটা চিৎকার ছেড়ে পিছিয়ে এলো সে। পার্টিশনে পিঠ ঠেকিয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ কি? এ-সব কি ঘটছে তার কপালে?

ক্র্যাক! যেন তুষার জমে আটকে থাকা একটা জানালা খোলার শব্দ হলো। সুরাইয়ার সামনে কাঁচটা নড়ে উঠল। হড়হড় করে ঢুকতে শুরু করল পানি, যেন একটা স্লুইস গেট খানিকটা ওপরে তোলা হয়েছে। তার গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে। আতংকে লাফাচ্ছে সে। তারপর ছুটে এসে কাঁচটাকে নিচে নামাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল, জানে না কি করুণ হয়ে উঠছে তার আচরণ, আরেক অর্থে কি হাস্যকর। আঙুলগুলো কাঁচের গা বেয়ে নিচে নামছে, কারণ তার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে ওটা। প্রবল আলোড়ন তুলে ভেতরে ঢুকছে পানি। সুরাইয়ার স্কার্ট ছুঁলো, উরু জোড়াও ডুবিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণে ভেতরে ঢুকল একটা অক্টোপাস্। একটার পিছু নিয়ে আরেকটা। ও দুটো যেন নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে—প্রথম অক্টোপাস্ সুরাইয়ার পা, উরু আর নিতম্ব আটটা বাহু দিয়ে জড়াল; দ্বিতীয়টা পেট, বুক, গলা আর মাথা। সিলিঙে একটা লাউডস্পীকার রয়েছে, হঠাৎ সেটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'মিস সুরাইয়া, বিদায়!' কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। 'তুমিই সেই বেঈমান। বেঈমানীরই শাস্তি পাচ্ছ তুমি।'

সুরাইয়া চিৎকার করছে, তবে সবই দুর্বোধ্য, অর্থবোধক কোন শব্দ তার মাথায় আসছে না। অক্টোপাস্ দুটো চাপ বাড়াল ধীরে ধীরে। কে জানে, প্রতিপক্ষ অসহায় বুঝতে পেরে ওগুলো হয়তো

তাকে নিয়ে একটু খেলতে বা মজা করতে চাইছে।

সুরাইয়ার শরীর থেকে মাংস খোলা হলো। বাহুর প্যাঁচ ও চাপ এত তীব্র, হাড় থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসছে মাংস, খালি একটা বাহু সেই মাংস পেঁচিয়ে নিয়ে মুখের কাছে এনে ভেতরে গুঁজে দিচ্ছে।

ওপরের কামরায় একদিকের পর্দা সরে গেছে, এখন সেখানে অন করা রয়েছে একটা বিশ ইঞ্চি কালার টিভি। টিভির পর্দায় এখন আর তেমন কিছু দেখার নেই, শুধু সুরাইয়ার সাদা কঙ্কালটা ছাড়া।

পুরো ঘটনাটা সম্মোহিত হয়ে দেখল ডক্টর প্রিয়রঞ্জন ভৌমিক ও প্রফেসর মুসলিম ফারাজি। দু'জনেই এমন ভাবে ঘামছে যেন এই মাত্র শাওয়ারের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাত তুলল কবীর চৌধুরী। পর্দা জায়গামত ফিরে এলো আবার, আড়ালে পড়ে গেল টেলিভিশন।

'ভায়েরা,' শান্ত ও নরম সুরে সহকারীদের সম্বোধন করল কবীর চৌধুরী।

দ্রুত মুখ তুলে তাকাল তার সহকারীরা।

'সুরাইয়া জানত আমি কি আবিষ্কার করেছি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'সেজন্যেই লোভ জাগে তার মনে। আপনারাও জানেন আমি কি আবিষ্কার করেছি। এখন প্রশ্ন হলো, কি করে বুঝব যে আপনারাও সুরাইয়ার মত লোভী হয়ে উঠবেন না?'

একযোগে, প্রায় একই ভাষায়, দিব্যি ও কসম খেয়ে তারা চিৎকার করে বলল, 'না! না! এ আপনি কি বলছেন, সার! আমরা কেন বেঈমানী করব! বিশ্বাস করুন, প্লীজ...'

আবার হাত তুলল কবীর চৌধুরী। অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে শান্ত গলায় বলল, 'জানোয়ারকে ডেকে দাও।'

চার

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর ডিসি টেনে করে মিশরে পৌঁছাচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম মাসুদ রানা। উত্তর আফ্রিকার উপকূল রেখা পিছনে ফেলে আসার পর হিসাবটা হলো আর মিনিট ত্রিশেকের মধ্যে কায়রো ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে প্লেন। দ্বিতীয়বার কফি দিতে এসে দূর থেকেই স্টুয়ার্ডেস লক্ষ করল মিস্টার রানা হাসছে, এবং হাসিটা দেখে তার মনে হলো চেহারাটা কেমন সম্পূর্ণ বদলে গেল। সে ভাবল, মানুষটা নিশ্চয়ই খুব কম হাসে। সুদর্শন একটা অবয়ব, কিন্তু তারই মধ্যে কি যেন একটা আছে যা ভয় পাইয়ে দেয়। হাসিটা যখন নিভে গেল, মুখের ভাব হয়ে উঠল শীতল ও নিষ্ঠুর, চোখ দুটো ইস্পাতের মত কঠিন। সুন্দরী মেয়েটা কল্পনা করল, এই লোকের সব কিছু অত্যন্ত গোছাল, প্রেম করার সময় নিশ্চয়ই কথা বলে না; কিভাবে সম্ভব জানে, তাই সম্ভবত যে-কোন মেয়েকে খুশি করতে পারে।

মেয়েটার চোখে প্রত্যাশার আলো ফুটতে যাচ্ছে দেখে ট্রে থেকে কাপ-পিরিচ তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানবালাদের অনেকেই এত সুন্দরী আর স্মার্ট হয় যে তাদের কেউ ওর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলে নিজেকে সামলে রাখাটা জরুরী হয়ে পড়ে; বিশেষ করে কোন অ্যাসাইনমেন্টে থাকার সময়। এই মেয়েটা যেহেতু অসাধারণ রূপসী, রানা আরও বেশি সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করছে। জানালা দিয়ে ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি আর ধু-ধু মরুভূমি দেখছে ও, আর হাতের কাজটার কথা ভাবছে।

পেন্টাগন থেকে রানাকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিত যে সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিন নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটেনি। ক্যাপটেন জন ওয়েফার নির্দেশটা হাতে পেয়েছেন যাত্রা শুরু করার অল্প কিছুক্ষণ আগে, এবং সেটা সরাসরি নিউ ইয়র্ক সামরিক নৌ-ঘাঁটির হেড অভ অপারেশন্স বব রবার্টসনের মুখ থেকে। রিয়ার-অ্যাডমিরাল জিটি ওয়েফার, ক্যাপটেন জন ওয়েফারের বাবা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর ছেলে, জন, দীর্ঘ পনেরো বছর মহাসাগরে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখানোর পুরস্কার হিসেবে নৌ-বাহিনীর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পদক পেয়েছেন। মোটকথা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব–সাবমেরিন নিয়ে চীনে চলে যেতে পারেন–কিন্তু সবারই ধারণা, তা তিনি করেননি, করতে পারেন না।

পেন্টাগনে বসে পরিস্থিতি সম্পর্কে যখন সাধারণ একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছে রানা, এই কথাগুলো তখনই বলা হয়েছে ওকে। স্বভাবতই রানা প্রশ্ন করেছে–এ-কথা কেন ভাবা হচ্ছে যে মার্কিনিদের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চীনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে? এর উত্তরে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর একটা ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে, যা ভাষান্তর করলে এরকম দাঁড়ায়–দুনিয়ার বুকে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে উদয় হবে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। একসময় সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটবে, সুপারপাওয়ার হিসেবে থাকবে একা শুধু যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আমেরিকাকে পিছনে ফেলে মহাশক্তিধর হয়ে উঠবে চীন। চীনও সুপারপাওয়ার হিসেবে বেশিদিন টিকতে পারবে না, তার জায়গা

দখল করবে ভারত।

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে সত্যিসত্যি একমাত্র সুপারপাওয়ার–নাস্ত্রাদুমের ভাষায়, ঈশ্বরদের দেশ। এরপর চীনের উঠে আসার পালা। কাজেই কেউ যদি ষোলোটা পারমাণবিক বোমা ও দূরপাল্লার মিসাইলসহ যুক্তরাষ্ট্রের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চুরি করে, ধরে নেয়াটা স্বাভাবিক যে সেটা চীনের কাছেই বিক্রি করা হবে। মুখে কিছু না বললেও রানা এই বক্তব্য মেনে নিতে পারেনি। ব্যাপারটা ওর কাছে কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়েছে। চীন কেন ও-সব কিনতে যাবে? ও-সব কি ওদের নেই?

তবে, হ্যাঁ, ব্যাপারটার মধ্যে ধোঁকাবাজিও থাকতে পারে। কেউ যদি এমারেল্ড ডলফিনের নিখোঁজ সংবাদ কোনভাবে জেনে থাকে, এ থেকে মোটা টাকা কামাবার মতলবে ভান করতে পারে যে ওটার হদিশ তার জানা আছে। কাউকে অপহরণ করে বড় অঙ্কের মুক্তিপণ চাওয়া হলে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু শুধু যারা দায়িত্বে ছিল তারা ছাড়া আর কে জানবে যে এমারেল্ড ডলফিন নিখোঁজ হয়ে গেছে? মিডিয়াকে তো কিছুই জানানো হয়নি। পেন্টাগনের তরফ থেকে গোটা ব্যাপারটাকে টপ সিক্রেট রেটিং দেয়া হয়েছে।

তবে রানা বিশ্বাস করে না যে পেন্টাগনের কর্মকর্তারা ঝেড়ে কাশছেন। তাঁদের মনের কথা–ভয়, সংশয় ও যুক্তি মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, ওকে বলা হয়নি। যদিও রানা সেটা কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছে, কিছুটা আভাস পেয়েছে নুমার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছ থেকে।

পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউস প্রায় নিশ্চিত, এই কাজের কাজী হলো আল কায়েদার নতুন কোনও নেতা। বিন লাদেন নিহত, নিখোঁজ বা অচল হয়ে পড়ার পর এই উগ্র চরমপন্থী একজন বাংলাদেশী মুসলমান সংগঠনটির নেতৃত্ব নিজের হাতে

তুলে নিয়েছে।

কবীর চৌধুরী জড়িত, হ্যাঁ, রানারও তাই ধারণা: কিন্তু আল কায়েদার মত কোন মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে সে জড়াবে, এটা ও বিশ্বাস করে না। কবীর চৌধুরী একজন অপরাধী, এ-কথা সত্যি; কিন্তু তার পরম শত্রুও বলতে পারবে না যে সে ধর্ম পালনের নামে হিংস্রতা বা উন্মত্ততা সমর্থন করে।

রানার চিন্তাধারা আরেক খাতে বইছে এখন। কেন বলা হচ্ছে ট্র্যাকিং সিস্টেমের ব্লুপ্রিন্ট বিক্রি করা হবে? মূল সিস্টেমটা নয় কেন? অন্য যে-কোন উত্তরের চেয়ে একটা উত্তর সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবে, আর সেটা হলো–যে বিক্রি করতে চাইছে, জিনিসটার মালিক সে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনের অধিকারী সবগুলো দেশের আন্ডারওয়াটার ডিফেন্স পলিসি ধ্বংস করে দেয়ার মত একটা কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ একজন ব্লুপ্রিন্টটা চুরি করে পালিয়েছে।

তাহলে, এই ট্র্যাকিং সিস্টেমের মালিক কে? রানা ভাবল, এ প্রশ্নের উত্তরও সম্ভবত ওর জানা আছে।

কবীর চৌধুরীর সর্বশেষ কীর্তি সম্পর্কে রানা যতটুকু অবহিত, গ্রীক শিপিং ম্যাগনেট কাসকারাকাস পোপেনডাসকে হত্যা করার পর তাঁর কোম্পানি সী ফেয়ারার, অর্থাৎ দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ট্যাংকার বহরের মালিক সে। এর মানে জল ও জলযান সম্পর্কে কবীর চৌধুরী ওরফে ডাংকিলাস নিরো আগ্রহী। এটা তার ছদ্মনাম বলে শোনা যাচ্ছে। সে খুব বড় বিজ্ঞানী, বিরাট প্রতিভা, কাজেই তার স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষও অতিকায়। যুক্তরাষ্ট্র সহ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী উন্নত দেশগুলোর পালটা আঘাত হানার ক্ষমতা শতকরা নব্বুই শতাংশই নিউক্লিয়ার সাবমেরিন-নির্ভর। বিশ্বকে একদিন জয় করবে, এই গর্বিত উচ্চারণ অনেক আগে থেকে করে আসছে পাগল বিজ্ঞানী। তা করতে হলে দূরপাল্লার মিসাইল সহ

পারমাণবিক বোমা আর সাবমেরিন তো তার দরকারই, তাই না?

মনের ক্যানভাসে যে ছবি আঁকছে, সেটা দেখে রানার নিজেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। কবীর চৌধুরী তার এই ট্র্যাকিং সিস্টেম ফিরে পাওয়ার জন্যে ভক্ত, শিষ্য ও বেতনভুক লোকদের খালি পায়ে নরকে পর্যন্ত হাঁটতে বাধ্য করবে, আর নিজে হয়ে উঠবে দ্বিতীয় আজরাইল। নিজেকে সাবধান করে দিল ও, পাগল বিজ্ঞানীর লোকবলের অভাব নেই, বড়বড় সব এয়ারপোর্টে তার লোকজন কড়া নজর রাখছে।

এই অ্যাসাইনমেন্টে বলা মুশকিল কে রানার প্রতিপক্ষ নয়। ব্লুপ্রিন্ট একটাই, এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। যে বিক্রি করতে চাইছে সে তার প্রস্তাব দশজনকে দেয়নি, তার কি নিশ্চয়তা?

কাজেই ধরে নিতে হবে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ইরাক থেকে শুরু করে উত্তর কোরিয়া ও ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা চারদিকে গিজ-গিজ করছে। প্রশ্ন হলো এই সব ফিল্ড এজেন্টরা ওকে কায়রোয় পৌঁছাতে দেখে কি ভাববে? বিশেষ করে চীনারা, চামোনিক্স উপাখ্যানের পর? একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিটি ইঞ্চি মেপে নিয়ে এগোতে হবে ওকে।

এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রোডা দ্বীপে চলে এলো রানা, উঠল ফাইভ স্টার হোটেল দি ওয়েসিস-এ। দ্বীপটা যেন একটা ললিপপ, নীলনদের গলায় আটকে আছে। বাইরে লু হাওয়া বইছে, তবে স্যুইটের ভেতর বলা যায় রীতিমত শীতকাল। ঠাণ্ডা শাওয়ারের নিচে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর বাথরুম থেকে বেরুল নীল টাওয়ালিং ড্রেসিং গাউন পরে, ইন্টারকমে রুম সার্ভিসকে ডেকে এক গ্লাস টমেটো জুস আর গোটা চারেক হাফবয়েল মুরগীর ডিম চাইল।

দশ মিনিট প৯। হাতে টমেটো জুস-এর গ্লাস, রানা জানালা

দিয়ে তাকিয়ে আছে ছ'শো ফুট উঁচু কায়রো টাওয়ারের দিকে, ভাবছে কোত্থেকে শুরু করবে কাজটা। এক দিক থেকে, সব কিছু পানির মত সহজ। এক জনাব বিন আব্বাস হলো কনট্যাক্ট; রানার কাছে তার ফোন নম্বর আছে। ডায়াল ঘুরিয়ে ব্যবসার কথা আলাপ করলেই হয়। 'ভাই, বিন আব্বাস, আমি ঢাকা থেকে এসেছি; তোমার কাছ থেকে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ট্র্যাকিং সিস্টেমটা কিনতে চাই।' আপন মনে হেসে উঠে মাথা নাড়ল রানা। হ্যাঁ, পানির মত সহজই বটে। এভাবেই শুরু হবে ওর এবারকার অ্যাসাইনমেন্ট।

ডিম ও জুস খাওয়া শেষ করে প্যারিসের গুচি থেকে কেনা গাঢ় নীল একজোড়া বাকস্কিন শূ পরল। ট্রাউজারটা সুতি, অফ-হোয়াইট শার্টটা দীর্ঘ কলার সহ নেভী ব্লু সিল্ক। জ্যাকেটটাও সুতি, [illegible] ,ডোরাকাটা; হংকঙের এমন একজন লোক ওকে বানিয়ে দিয়েছে যে কিনা এ-ধরনের কাজ দুনিয়ার আর সবার চেয়ে ভাল পারে।

এবার জরুরী একটা কাজ সারতে হবে। ব্রিফকেস খুলে ফলস বটম থেকে ওয়ালথার-এর বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সাদা একটা রুমালে রাখল। রোলেক্স হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পিস্তলটা জোড়া লাগাতে বসল, হাতে একটা স্ক্রুড্রাইভার। কাঁটায় কাঁটায় চার মিনিট আটচল্লিশ সেকেন্ড পর জোড়া লাগানো অস্ত্রের চেম্বার বন্ধ করল। ঘড়িতে চোখ, মুখে তৃপ্তির হাসি। এই প্রথম পাঁচ মিনিটের কম সময়ে কাজটা শেষ করতে পেরেছে।

নোংরা রুমালটা দিয়ে ওয়ালথার থেকে তেল মুছল রানা, তারপর হাত ধোয়ার জন্যে বাথরুমে ঢুকল। টিসু পেপারে ভাল করে মুড়ে রুমালটা ফেলে দিল ওয়েস্ট বাস্কেটে।

এই মুহূর্তটি রানা উপভোগ করে। ঠিক এই সময় ওর উত্তেজনা, হার্ট রেইট, পালস রেইট আর ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ায় অ্যাড্রেনালিন হরমোন বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ে

সারা শরীরে। একটা অ্যাসাইনমেন্টের শুরু। প্রেমে পড়ার শুরুতে যে মাদকতা আছে, রানার কাছে এই ব্যাপারটা তারচেয়েও বেশি উত্তেজনাকর। বিছানার কিনারায় বসল ও, হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে তুলল টেলিফোনের রিসিভারটা, অনুভব করল এরইমধ্যে হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। একটা মেয়ে আরবি ভাষায় সাড়া দিল, তারপর বেছে নিল বিশুদ্ধ ইংরেজি। মুখস্থ করা নম্বরটা তাকে জানিয়ে একটু নড়েচড়ে বসল রানা, বেডসাইড টেবিলে আঙুল নাচাচ্ছে। প্রথমে নিস্তব্ধতা। তারপর রিঙ হবার শব্দ। বেলটা বাজছে তো বাজছেই।

'দুঃখিত, সার-', অপারেটর মেয়েটার গলা, রানাকে বলছে যে অপরপ্রান্ত থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। রানা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক আছে, পরে আবার চেষ্টা করবে ও, এই সময় ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো রিসিভার তোলার। পরপরই আরেকটা শব্দ হলো। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল রানা, কলটা রেকর্ড করা হচ্ছে।

'...আলো?' কোন মেয়ের গলা।

বড় করে দম নিয়ে শুরু করল রানা। 'গুড আফটারনুন। আমার নাম মাসুদ রানা। আমাকে বলা হয়েছে, একটা ব্যবসায়িক ব্যাপারে আলাপ করার জন্যে আপনি আমার ফোন পাবার অপেক্ষায় থাকবেন।' অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা। 'হ্যালো?' মেয়েটা বোধহয় ইংরেজি ভাল বোঝে না।

তারপরই ভেসে এলো কথাগুলো। 'আপনি ছ'টায় আসবেন। চব্বিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট, সেমিরামিস প্যালেস।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, যেন বাড়িতে মা-বাবার অনুপস্থিতিতে ছোট একটা ছেলে মুখস্থ করা মেসেজ পুনরাবৃত্তি করছে। 'শহরটা আপনার ভালভাবে চেনা আছে? জায়গাটা সিটাডেল-এর কাছাকাছি।'

'খুঁজে নেব। আপনি কি-?' একটানা একঘেয়ে আওয়াজ জানিয়ে দিল যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে।

'লাইন কি, সার, কেটে গেল?'

রানা ভাবছে, অপারেটর কি ওদের আলাপ শুনল? সম্ভবত। কায়রোয় বড় হোটেলগুলোর সুইচবোর্ডে মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন করে এজেন্ট থাকতেই পারে। 'না,' বলল ও, 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

রিসিভারটা ক্রেডলে আস্তে করে নামিয়ে রেখে বিছানা থেকে জ্যাকেটটা তুলল রানা। কাঁধে আটকানো সামান্য প্যাড আসলে হোলস্টারের বিকল্প। ইদানীং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের তৎপরতা এত বেশি বেড়ে গেছে যে প্রতিটি দেশের সিকিউরিটি গার্ড বিদেশী কাউকে দেখলে প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করে লোকটার কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। যদি টের পায় হোলস্টার আছে, ইন্টারোগেট করার জন্যে সোজা ধরে নিয়ে যাবে এসবি অফিসে বা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে। রানার এই প্যাড অনায়াসে সরিয়ে বগলের তলায় কিংবা কোমরে জড়ানো বেল্টের পিছনে বসানো যায়। হোলস্টারের বদলে প্যাড ব্যবহার করায় ড্র করার গতি কিছুটা অবশ্য কমবে। প্রচলিত হোলস্টার থেকে পিস্তল ড্র করে বিশ ফুট দূরের একজন লোককে গুলি লাগাতে রানার সময় লাগে এক সেকেন্ডের পাঁচভাগের তিনভাগ। রিইনফোর্সড নাইলন প্যাড ব্যবহার করায় ম্যাজিকটা দেখাতে পুরো এক সেকেন্ড লেগে যাবে। তবু ভাল, কারণ হোলস্টার না থাকায় এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখে জেরা করতে পারবে না। প্যাডিং-এর জিপ খুলে ভেতরের দিকটা বাইরে বের করল রানা, তারপর বগলের তলায় আটকাল। জ্যাকেট পরল, জায়গামত ঢোকাল পিস্তলটা, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। সামান্য ফোলা ভাবটুকু শুধু একজন প্রফেশন্যালের চোখে ধরা পড়বে। তবে ওর প্রতিপক্ষরা সবাই প্রফেশন্যালই।

এই চিন্তাটা মাথায় রেখে হাতের তালুতে খানিকটা ট্যালকম

পাউডার নিয়ে সুটকেস আর অ্যাট্যাশে কেইস-এর তলায় সাবধানে একটু ছড়াল, খুঁটিয়ে না দেখলে কারও চোখে ধরা পড়বে না। এর পর কাবার্ডের দরজায় আটকাল নিজের একটা চুল। কাবার্ডে কাপড়চোপড় ছাড়া তেমন কিছু নেই।

নিচের লাউঞ্জে নেমে সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়েও উপস্থিত লোকজনকে দেখে নিল রানা; সন্দেহ করলে সবাইকে করতে হয়, না করলে কাউকে নয়। গট-গট করে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলো। বারান্দা ধরে ঢাকা চাতালে পৌঁছাল, সেখান থেকে একটা ফোয়ারাকে পাশ কাটিয়ে চলে এলো গেটে। দারোয়ান স্যালুট করতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। বিকেল পাঁচটাতেও রোদ যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। ফুটপাথ ঘেঁষে অপেক্ষারত ট্যাক্সিগুলোকে অগ্রাহ্য করে প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে বাঁক নিয়ে আল গামা ব্রিজ পেরুল। উনুনের ভেতর দিয়ে আরও অন্তত একশো গজ এগোবার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল—এয়ারকুলার লাগানো মার্সিডিজ। ড্রাইভারকে বলল, 'সিটাডেল, দুর্গে নিয়ে চলো।' সিটে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, রাজধানী কায়রোর প্রাচীন স্থাপত্য, মুসলিম ঐতিহ্য, বিচিত্র বেশভূষায় ঢাকা মানুষজন ইত্যাদি দেখছে। তবে একটা ব্যাপারে পুরো মাত্রায় সতর্ক। না, ও নিশ্চিত, কেউ ওকে ফলো করছে না।

ড্রাইভার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে। যাবার পথে অস্তিত্বহীন বন্ধুদের কাল্পনিক ঠিকানা দিল রানা, তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল—সেমিরামিস প্যালেস। চিনতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ড্রাইভারের চোখ-মুখ। হ্যাঁ, জায়গাটা এই তো কাছেই। ফ্ল্যাটবাড়িটা সুলতান হাসান মসজিদের গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। বিল্ডিংটার অবস্থান মনে গেঁথে রাখল রানা; সপ্রশংস ও মুগ্ধদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে মোকাত্তাম পাহাড়ের ঠিক গোড়ায় বিস্তৃত বিশাল মসজিদ কমপ্লেক্স, সারি সারি প্রাসাদ আর

নগর দুর্গ দেখছে। গাইড বুক খুললে জানা যাবে এ হলো সালাদিন-এর তৈরি দুর্গ।

বাইরের দিকের বা প্রথম প্রাচীরের গেটে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। প্রথমে ছুটে এলো বোরকা পরা দু'জন ভিখারিনী; রানা প্রায় নিশ্চিত, ওরা মিশরীয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ছদ্মবেশী এজেন্ট। তারপর ছেঁকে ধরল একদল গাইড। কিছু ফেরিওয়ালাও পিছু নিল। ঘড়িতে বাজে এখন সাড়ে পাঁচটা। সেমিরামিস প্যালেসে পৌঁছাতে মিনিট দশেক শান্ত ভাবে হাঁটতে হবে ওকে। সময়টা উপভোগ করার উত্তম একটা পন্থা হতে পারে দুর্গ-প্রাচীরের চওড়া মাথায় উঠে চারদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এগোনো। তিন প্রস্থ সিঁড়ি টপকে প্রাচীরের মাথায় উঠে এলো ও। ওর নিচে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় শহর বিছিয়ে আছে–যতদূর চোখ যায় কংক্রিটের আগোছাল জঙ্গল, স্কাইলাইন অলঙ্কৃত করে রেখেছে মসজিদের মিনার আর গম্বুজ।

আকাশ এখন রক্ত লাল। তারপর খুব দ্রুত সোনালি হয়ে উঠল। তারপর বেগুনি। সবশেষে কালো। মোহাম্মদ আলী মসজিদের গায়ে ছায়া গাঢ় হতে দেখছে রানা, সেই সঙ্গে ওর নাকে ভেসে আসছে অচেনা একটা গন্ধ। রানার কাছে, যে গোটা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, দৃশ্য বা শব্দের চেয়ে গন্ধই বরং কোন জায়গা চিনতে বা পরিস্থিতি অনুধাবন করতে বেশি সাহায্য করে। আজ রাতের এই তেতো-মিঠে গন্ধটায় কি আছে? মশলা, জুঁই, গলিত বর্জ্য, পাপ, দুর্নীতি, নাকি ইতিহাস? বিশেষ করে আজ রাতে, ভাবল রানা, গন্ধটায় রয়েছে বিপদ–এবং হয়তো মৃত্যুও। বাম বগলের নিচে ওয়ালথার পিপিকের স্পর্শ কিছুটা আশ্বস্ত করল ওকে। প্রাচীরের মাথা ধরে মুগ্ধ একজন ট্যুরিস্টের মত চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে হাঁটছে রানা।

পাঁচ

এলিভেটরে চড়ে তিনতলা পর্যন্ত উঠল রানা, সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় পৌঁছে আবার চড়বে। কয়েকটা ফ্ল্যাটবাড়ির দরজা বা জানালা খোলা। কানে এলো শিশু-কিশোরদের হৈ-চৈ আর রেডিও-টিভির নানান রকম আওয়াজ, মশলা দিয়ে মাংস রান্নার কড়া ঝাঁঝ ঢুকল নাকে। পাঁচতলায় উঠে এলিভেটরের জন্যে এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। এবার ও একা নয়, এক তরুণীও ওপরে উঠছে। স্মার্ট মেয়ে; স্কার্ট ও ব্লাউজ পরা, পায়ে হাইহিল, হাতে একটা লেদার ব্যাগ। ওটায় পিস্তল আছে? নাকি গ্রেনেড?

মেয়েটা মিষ্টি করে হেসে বোতামে চাপ দিল। সাততলায় নেমে গেল সে। রানা নামল বারোতলায়।

বারোতলায় কোন হৈ-চৈ নেই। করিডর ধরে এগোবার সময় কোন ফ্ল্যাটের দরজা বা জানালা খোলাও দেখছে না রানা। চব্বিশ লেখা অ্যাপার্টমেন্টটাকে পাশ কাটিয়ে করিডরের শেষ মাথা পর্যন্ত এলো ও। এখানে একটা দরজা আছে, তালা দেয়া, দেখে মনে হলো খুব কমই ব্যবহার করা হয়। ধারণা করল, এই দরজার ওপারে ফায়ার-এস্কেপ। এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় দেখা ও মনে রাখার দরকার আছে, অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে হয়তো কাজে লাগবে। ঘুরে করিডর ধরে ফিরে এলো চব্বিশ নম্বর ফ্ল্যাট-এর সামনে। কোন শব্দ নেই। নক করে অপেক্ষায় থাকল। কবাটের গায়ে একটা স্পাই হোল আছে। সাড়া পেতে দেরি হচ্ছে

দেখে রানা ভাবল, ফুটোয় কারও চোখ আঠার মত সেঁটে আছে? কেউ ওকে দেখছে? আবার নক করতে যাবে, এই সময় দরজা ইঞ্চি আটেক খুলে যেতে বাইরে বেরিয়ে এলো অচেনা একটা ক্ষীণ সৌরভ।

'রানা,' বলল ও। 'মাসুদ রানা। আপনার টেলিফোন ধরতে যেমন দেরি হলো, তেমনি দরজা খুলতেও।'

দরজা আরও একটু খুলে বাইরে মুখ বের করল মেয়েটা, করিডরের দু'দিক চট করে একবার দেখে নিল। রানার ধারণা হলো, মেয়েটা শুধুই মিশরীয় নয়. অন্য কোন জাতের বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে আছে—সম্ভবত ফরাসী। সুন্দরীই বলতে হবে, তবে এ-ধরনের সৌন্দর্য রানাকে ঠিক আকর্ষণ করে না। তার সব কিছুই আকারে একটু বড়। মুখ, স্তন, নিতম্ব, এমন কি চোখ দুটোও। বেশি পেকে যাওয়া ফলের মত লাগে রানার। পরিমিতি বোধের অভাব প্রকাশ পাচ্ছে চোখে ম্যাসকারার অত্যধিক ব্যবহারে, ঠোঁট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া লিপস্টিকের দাগে। কান থেকে চার ইঞ্চি ঝুলে থাকা জিপসী ঝুমকোগুলোর দিকেও রানা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতে পারল না। বহুরঙা ড্রেস পরে নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছে, কারণ ওটা কাঠামোর সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা হয়নি। দেখে যা মনে হচ্ছে মেয়েটা সম্ভবত তাই-ই—কায়রোর দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন বেশ্যা।

'আমি একা এসেছি,' বলল রানা।

পিছু হটে ইঙ্গিতে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বলল মেয়েটা। বিড় বিড় করে বলল, 'সাবধানের মার নেই।'

রানা ভেতরে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল, পরীক্ষা করে দেখতে ভুলল না তালাটা ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা।

ফ্ল্যাটের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে রানার ধারণা হলো, এই মেয়ে এটার মালিক নয়। এখানে বসবাস করে সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি, অন্তত বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিল্পবোধ আছে এমন কোন মানুষ।

প্রথম ঘরটার দু'দিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে শুধু বই আর বইয়ে; আরেক দেয়ালের বেশিরভাগটা দখল করে আছে অপরূপ সুন্দর একটা ঈজিপশিয়ান স্ট্যাচু। দীর্ঘ, মেদহীন নগ্ন নারীমূর্তি রানাকে যেন জাদু করল, তাকাবার পর চোখ ফেরাতে পারছে না। ছোট, দৃঢ়ভাব নিয়ে তলপেট ক্রমশ ফুলে উঠে এসেছে ওপরদিকে একটা ঘোড়ার নালের মত নাভীর চারদিকে; উন্নত কপালের নিচে চোখ-জুড়ানো ভ্রুলতা, মাথা ও কাঁধ ঢেকে নিচে নেমে আসা প্রায় স্বচ্ছ দোপাট্টা ঝুলে আছে ছোট ও স্পর্ধিত জোড়া স্তন-শিখরের একটু ওপর পর্যন্ত। হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার করল, এ-ধরনের মেয়েই ওর পছন্দ; তবে অবশ্যই জ্যান্ত হওয়া চাই। 'আমি আশা করেছিলাম ব্যবসাটা একজন পুরুষের সঙ্গে হবে,' বলল ও।

'তাই হবে।' রানাকে পাশ কাটিয়ে আরেকটা দরজার দিকে এগোল মেয়েটা, ইঙ্গিতে সঙ্গে আসতে বলল। দরজার ও[illegible] ঝুল-বারান্দা দেখা যাচ্ছে। 'জনাব বিন আব্বাস এই মুহূর্তে একটা কাজে আটকা পড়েছেন। তিনি আমাকে আপনার যত্ন নিতে বলেছেন।'

'ভারী দয়া তাঁর,' শুকনো গলায় বলল রানা। ইঙ্গিত পেলেও সঙ্গে সঙ্গে ঝুল-বারান্দার দিকে এগোল না, থেমে লম্বা বুক শেলফ থেকে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফটোগ্রাফ নিল হাতে। ছবিটায় মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক এক লোক দুটি শিশুকে জড়িয়ে ধরে আছে, চেহারা দেখে মনে হয় তার নিজেরই ছেলে ওরা। লোকটার চেহারায় মননশীলতার ছাপ স্পষ্ট, তবে চোখে-মুখে শোকের ছায়া লেগে রয়েছে; সাহসের সঙ্গে হাসতে চেষ্টা করলেও মাত্রা ছাড়ানো আত্মসচেতন ভাবটা গোপন থাকছে না। 'ইনিই কি বিন আব্বাস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মেয়েটা কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল।

'আপনাদের বাচ্চা দুটো সত্যি খুব সুন্দর।'

মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। 'আমরা বিবাহিত

নই।' প্রয়োজন নেই, তবে প্রসঙ্গটা ওঠায় সত্য গোপন করছে না। 'আর ওরা আমার বাচ্চা নয়।'

বিব্রত হবার চেষ্টা করল রানা, শেলফে ফটোগ্রাফটা রাখতে গিয়ে একটু বেশি সময় নিল। 'দুঃখিত—ইয়ে, আপনি জানেন ঠিক কখন তিনি ফিরবেন?'

'ফিরবেন তাড়াতাড়িই। তবে নির্দিষ্ট সময়টা আমি বলতে পারব না। উনি কায়রো মিউজিয়ামে কাজ করেন। মাঝে মধ্যে ফিরতে এরকম দেরি হয়। আমি কি আপনাকে কিছু দেব?'

রানা জানে মেয়েটা সত্যি কথা বলছে না, তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো ঝুল-বারান্দায়। রাতটা ঝপ করে নামলেও, কায়রো শহরও প্রায় দপ করে জ্বলে উঠেছে, ফলে যতদূর দৃষ্টি যায় আলোর কোন অভাব চোখে পড়ল না। তবে গরম ভাবটা এখনও কাটেনি। জ্যাকেটের একটা বোতাম খুলে রেইলিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। কোথাও, কাছেপিঠেই হবে, কেউ একজন পিয়ানো বাজাচ্ছে। তারপর শোনা গেল রেডিও বা টিভি থেকে ভেসে আসা কোন কোকিলকণ্ঠীর সূক্ষ্ম কাজসমৃদ্ধ আরবি গান। ঝুঁকে নিচে তাকাতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের লাগোয়া, কাঁচ মোড়া একটা গ্রীনহাউস দেখতে পেল ও। ওখানে, কাঠামোটা চিনতে অসুবিধে হলো না, একটা পিয়ানো রয়েছে। ওটার ওপর ঝুঁকে দোল খাচ্ছে একটা খুদে মূর্তি।

'শুধু এক কাপ কফি, প্লীজ,' বলল রানা।

মেয়েটা চলে যেতে বিন আব্বাস আর তাকে নিয়ে একটা গল্প তৈরি করল রানা। রুচিবিকৃতির কোন ব্যাপার হয়তো নয়, তবে মেয়েদের সব কিছু বড় বড়ই পছন্দ করে বিন আব্বাস, সেজন্যেই বাচ্চাদের ফেলে একটা বেশ্যার সঙ্গে বসবাস করছে। কিন্তু ওর এই গল্পে এর কোন ব্যাখ্যা নেই যে তথাকথিত সাবমেরিন ট্র্যাকিং সিস্টেমের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। রেইলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে কায়রোর আলোকিত মিনার আর গম্বুজ দেখতে দেখতে কফির

কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, আর ভাবছে সব শহরের মত এখানেও লাখ লাখ মানুষ হাসছে, কাঁদছে, প্রেম করছে, চুক্তি করছে, চুরি করছে, ভাল হতে চাইছে, জিতছে, হারছে—কেন? এ-সবের কি সত্যি কোন দরকার ছিল? ঈশ্বরের একঘেয়ে লাগছে না? দূর বোকা! নিজেকেই বকা দিল সে। ভাবল, জীবন তো অমূল্য একটা সম্পদ, এই দান তোমার বরাতে না জুটলে তুমি মাসুদ রানা কোথাও থাকতে না...কোথাও তোমার কোন অস্তিত্ব থাকত না, আর সেক্ষেত্রে এত সব সুন্দরী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, সোহানার নিঃস্বার্থ প্রেম, সোহেলের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, পিতৃতুল্য রাহাত খানের স্নেহ-ভালবাসা, সুস্থ-সবল শরীরে প্রতিমুহূর্তে ভাল লাগার শিহরণ, সঙ্গীতসুধা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্ব ও বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ, এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে তুমি। সৃষ্টিকর্তার কাছে কেমন লাগছে সেটা তিনিই বলতে পারবেন, তবে ছয়শো কোটি মানুষ তো আসলে ছয়শো কোটি মাসুদ রানাই; তার কাছে তো এই জীবন ভারী মজার।

তবে কল্পজগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এসে রানা ভাবল, আমি বিসিআই এজেন্ট এই মুহূর্তে কিছু করছি না। হঠাৎ ওর সন্দেহ হলো, সেই অচেনা গন্ধটা আবার যেন পাচ্ছে নাকে। মেয়েটা কি বারবার নিজের ঘরে গিয়ে একটু করে সেন্ট মেখে আসছে? নাকি এ স্রেফ ওর কল্পনা?

যেন রানার দ্বিধাদ্বন্দ্ব বুঝতে পেরেই মেয়েটা কথা বলে উঠল। 'আমি তাওহিদা।' এতক্ষণে রানা লক্ষ করল মেয়েটার হাতে একটা গ্লাস রয়েছে, তাতে রঙিন পানীয়। হুইস্কি? হ্যাঁ, হুইস্কিই। ওর চোখে চোখ রেখে এক ঢোক খেলো মেয়েটা। 'আপনার নাম বলেছেন, যতদূর মনে পড়ছে, রানা।'

'দু'বার বলেছি। একবার টেলিফোনে, একবার ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে।' রানার চোখ-মুখ কঠিন। 'শোনো, তাওহিদা। তুমি

আমাকে বদরাগী বা অসহিষ্ণু ভাবতে পারো, কিন্তু আমার হাতে নষ্ট করার মত সময় সত্যিই নেই। ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'ট্র্যাকিং সিস্টেম' শব্দ দুটো উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মেয়েটার যেন কোন নার্ভ ছোঁয়া হয়েছে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, ভেতরের সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। 'এ আপনি কি জিজ্ঞেস করলেন। এ-সব আমি কিছুই জানি না। আপনাকে সরাসরি জনাব বিন আক্কাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বলেন তো একটা চেয়ার এনে দিই, আরাম করে বসুন। আপনার কি এ-সব চলে?' ইঙ্গিতে হাতের গ্লাসটা দেখাল সে রানাকে। মুখে যাই বলুক, সন্ত্রস্ত ভাবটা আবার ফিরে এসেছে তার চোখে-মুখে। 'আমি তাঁর ফোন পাবার অপেক্ষায় আছি।'

'এতক্ষণে বলছ! কোত্থেকে ফোন করার কথা? কায়রো মিউজিয়াম থেকে?'

মেয়েটা ইতস্তত করছে। 'হয়তো।'

'হয়তো মানেই বড় বেশি অনিশ্চয়তা।' বাহুতে নরম একটু টান অনুভব করল রানা। মেয়েটা দু'আঙুলে ওর জ্যাকেটের আস্তিন ধরে আছে। তার সুগঠিত উরু উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে বাড়ল, আদুরে ঘষা দিল রানার পায়ের ভেতর দিকে।

'আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাকে খুশি রাখার।' মেয়েটার ঠোঁট রানার চোখ স্পর্শ করতে যাচ্ছে। 'আমি সত্যি খুব ভাল।'

হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ভাল মানে রীতিমত সোনা। এত সোনা যে তা দিয়ে একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম কেনা যাবে, যে সিস্টেম ধাওয়া করে আটক করতে পারবে যে-কোন নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। কত দাম হতে পারে সেটার? একশো মিলিয়ন ডলার? হাজার?

ওপরতলার ঝুল-বারান্দায় উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল, তার

আভা দেখা গেল পাশের দেয়ালে, সেই সঙ্গে আরবি ভাষার আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটল। রানার হাত ধরে ঝুল-বারান্দারই দ্বিতীয় দরজার দিকে পা বাড়াল তাওহিদা। সারি সারি ঝুলছে পুঁতির মালা, ওগুলোই দরজার পর্দা। ওগুলো সরিয়ে রানাকে একটা বেডরুমে নিয়ে এলো সে। ঘরে কোন খাট নেই, কাঠের উঁচু পাটাতনের ওপর তোষক ও চাদর বিছানো। অনেকগুলো তাকিয়া। সুইচ বোর্ড আছে, তবে সেদিকে মেয়েটা হাত তুলল না। তার বাহু এই মুহূর্তে রানার কণ্ঠলগ্ন হতে ব্যস্ত। ঠোঁট জোড়া এমন কাঁপছে যেন একটা আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবার অপেক্ষায়। কিন্তু তাকে রানা চুমো খেতে বাধা দিল। বাধা পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠল উত্তেজিত মেয়েটা। তার রূপ-যৌবন অগ্রাহ্য করবে, এমন পুরুষ আগে সে দেখেনি। বুকে ধাক্কা দিয়ে নিচু বিছানায় রানাকে ফেলে দিল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। প্রশ্নটা মুখের চেয়ে চোখই একটু আগে করল, 'কেন?'

'এখানে আমি ফুর্তি করতে আসিনি।' রানা শান্ত, কিছুটা বিনয়ও প্রকাশ পেল আচরণে। 'এ-সব চালাকি বাদ দিয়ে তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলো। বিন আক্কাস কোথায়?'

টেনে-হিঁচড়ে নিজের কাপড় খুলে ফেলছে তাওহিদা। বাধা দেবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হলো রানাকে। বিন আক্কাস নিজের সংসার ফেলে কেন এই মেয়ের কাছে চলে এসেছে, এতক্ষণে আরও পরিষ্কার হলো। তাওহিদার মত এরকম ভরাট ও নিখুঁত যৌবন এক কোটির মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ। ঝট করে তাকে ধরল রানা, নিজে দাঁড়াল, জোর করে তাকেও দাঁড় করাল। 'আমার কথা তোমার কানে যায়নি? ভেবো না, আমি তোমাকে টরচার করব না...'

ঘটনাটা ঘটল একভাবে, রানা সেটাকে দেখল আরেকভাবে। মনে হলো দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। তার আগে কাঠ ও কাঁচ দিয়ে তৈরি পুঁতির মালা সামান্য একটু

নড়ে উঠেছিল, তারপরই পিস্তলটা ওদের দু'জনের মাঝখানে ঠেলে দেয়া হয়। পুঁতির মালা দুলে ওঠায় ঝুন-ঝুন শব্দ তখনও থামেনি, গর্জে ওঠে অস্ত্রটা। গান ফ্ল্যাশ দেখতে পায় রানা, নাকে ঢোকে বারুদ, রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। এত কাছে, অস্ত্রটা চিনতেও কোন অসুবিধে হয় না ওর—ল্যুগার। ট্রিগারের ওপর চেপে বসা আঙুলের শক্ত হয়ে ওঠা দেখতে পেল, গোটা হাতের কয়েকটা পেশি ফুলে উঠে নিশ্চিত করতে চাইছে শেষ মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে গুলিটা যাতে লক্ষ্যচ্যুত না হয়।

বাস্তবে গোটা দৃশ্যটা রানার চোখের সামনে এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়ের জন্যে ছিল। তারপর মেয়েটা ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। ধাক্কাটা ওকে কাঁপিয়ে দিল, ওর শরীর যেন একটা শক অ্যাবজরবার। পরমুহূর্তে ভারী বোঝাটা ঢলে পড়ল। গলার ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ। ওর আঙুলের ফাঁক গলে হড়হড় করে গরম রক্ত পাম্প হচ্ছে। রানা ডাইভ দিল একপাশে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখন ও মেয়েটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। পরপর আরও দুটো গুলি ওর মাথার পিছনে দেয়ালে লাগল। দুটো গড়ান দিয়ে এক ঝটকায় বের করল ওয়ালথারটা। ভাগ্য ভাল যে কামরাটা অন্ধকার। আততায়ীকে না দেখেই ঝুল-বারান্দায় গুলি করল ও, পুঁতির মালা ঝাঁকি খেয়ে সাপের মত কিলবিল করছে। শুধু ঝুন-ঝুন আওয়াজ, ওটা ছাড়া নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে আছে। আততায়ী কি ওর জন্যে ঝুল-বারান্দায় অপেক্ষা করছে? দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা। থামল দরজার পাশে। ওপরতলার ঝুল-বারান্দার আলো নিভে গেছে। আন্দাজ করা যায় প্রতিবেশীরা ভাবছে কি ঘটল, পুলিসে খবর দেয়া উচিত কিনা। অনেক নিচে থেকে এখনও ভেসে আসছে পিয়ানোর শব্দ। আততায়ী সম্ভবত গুলি করার পরই পালিয়েছে। পালাবার পথ তো একটাই, ফ্ল্যাটের সামনের দরজা। তিন লাফে ঝুল-বারান্দা হয়ে পাশের কামরায় চলে এলো রানা, যে ঘরটায় প্রথমে ঢুকেছিল। আলো জ্বেলে

দেখল ওখানে কেউ নেই। সামনের দরজা বন্ধ, আগের মতই তালা দেয়া। করিডর ধরে ফায়ার-এস্কেপ পর্যন্ত যাবার কি কোন যুক্তি আছে? ওর বরং মেয়েটার কাছে ফেরা উচিত নয়? মেয়েটা যদি মারা যায় আর বিন আব্বাস না ফেরে, সূত্র বলতে আর কিছুই ওর কাছে থাকবে না। তাছাড়া, মিশরীয় পুলিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। হাজারটা প্রশ্ন উঠবে, তার একটারও সদুত্তর দিতে পারবে না ও।

ঠিক এই সময় নিঃশ্বাস ফেলার একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। প্রথমে ভাবল মেয়েটা দম ফেলছে। তবে সে যদি হামাগুড়ি দিয়ে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে থাকে তবেই তার নিঃশ্বাসের শব্দ এই ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যাবে।

আলো নিভিয়ে দেয়ালে পিঠ ঘষতে ঘষতে ঝুল-বারান্দার দিকে এগোল রানা। প্রথমে উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখে নিল। প্রথমে পুরোপুরি খালি দেখল ঝুল-বারান্দা, কোথাও কিছু নেই। কিন্তু তারপরই চোখে পড়ল একটা হাত। হাতটার গিঁটগুলো সাদা হয়ে আছে, রেইলিং-এর নিচের গ্রিল ধরে ঝুলে আছে অতি কষ্টে। আরও একটা রক্তাক্ত হাত দেখা গেল, ঝুল-বারান্দার মেঝে হাতড়াচ্ছে। ওই হাতেই ছিল ল্যুগারটা, রক্তে ভেজা আঙুল থেকে পিছলে নাগালের বাইরে চলে গেছে।

রানা না দেখে গুলি করলেও, লোকটা নিশ্চয়ই আহত হয়েছে। ঝুল-বারান্দার রেইলিং টপকে পাশের কোন ফ্ল্যাটের জানালা বা পানির পাইপ ধরতে চেয়েছিল সে, কিন্তু জখমটা গুরুতর হওয়ায় কোনরকমে ঝুলে আছে। তবে সন্দেহ নেই যে লোকটা ভাল একজন প্রফেশন্যাল, শেষ নিঃশ্বাস না পড়া পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে সে, একই সঙ্গে চেষ্টা করছে রানার প্রাণ হরণের। লোকটার রক্তাক্ত হাতের আঙুল ল্যুগারটার নাগাল পেয়ে গেল। অতি ব্যস্ততার সঙ্গে মুঠোয় ভরতে যাচ্ছে ওটা, এই সময় অনেক নিচে থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা

পিয়ানোর সুরটা বদলে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল।

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এলো রানা। ওকে খুন করার জন্যে যাকে পাঠানো হয়েছে তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আচরণের প্রশংসাই করতে হয়। দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে, শক্ত চোয়াল কাঁপছে, বিকৃত মুখে ভুরু দুটো কুঁচকে জোড়া লেগে গেছে। পিস্তলটা বারবার আঙুল গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনভাবেই সেটাকে মুঠোয় ভরতে পারছে না সে। আরও একটু উঁচু হলো লোকটা, গ্রিলের বাইরে এখন তার গলাও দেখতে পাচ্ছে রানা। হঠাৎই অস্ত্রটা তার মুঠোয় চলে এলো।

পরস্পরের চোখে চোখ রাখল ওরা। দু'বার গুলি করল রানা। লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল যেন নিচে থেকে কেউ হ্যাঁচকা টান দেয়ায়। কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এলো। আরও এক সেকেন্ডের একটা বিরতি। ভেসে এলো নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

রেইলিং-এর সামনে এসে ঝুঁকে নিচে তাকাল রানা। গ্রীন হাউসের ছাদে বিরাট একটা এবড়োখেবড়ো গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। আততায়ী লোকটার লাশ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গ্র্যান্ড পিয়ানোর ওপর। নারীকণ্ঠের চিৎকার ক্রমশ বাড়ছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের চারদিকে আলো জ্বলে উঠছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে আকাশ থেকে লাশ পড়তে দেখে মহিলা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।

পিছিয়ে এসে বেডরুমে ঢুকে আলো জ্বালল রানা। এবার অবশ্যই পুলিসকে খবর দেয়া হবে। যা করার তাড়াতাড়ি। একটা বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে রয়েছে তাওহিদা। প্রথমে রানার মনে হলো মেয়েটা বেঁচে নেই। মুখের রঙ বাদামী হয়ে গেছে, কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে আছে দেহটা। বুলেটটা যেন এই মেয়ের নেচে নেচে উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এখন তাকে সম্পূর্ণ অন্য কেউ মনে হচ্ছে। পরাজিত, পরিত্যক্ত।

হতে পারে আমি হয়তো তোমাকে ভুল বুঝেছি, ভাবল

রানা—মানুষের জীবনে এটা একটা খুব বড় ট্র্যাজেডি যে পরস্পরকে খুব কমই চিনতে পারে তারা। তুমি হয়তো সত্যি বিন আক্কাসকে ভালবাস। বোধহয়, সেজন্যেই এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়েছ, তারপর চরম মূল্য দিয়ে উপলব্ধি করেছ এ-সব সামলাবার ক্ষমতা তোমার নেই।

মেয়েটার কাঁধ ধরে তার কানে ঠোঁট ঠেকাল রানা, গলার আওয়াজ নিচু, সুরে জরুরী তাগাদা। 'তাওহিদা। আক্কাস কোথায়?' কোন জবাব নেই, তবে মুখ একটু নড়ল। 'আমি হয়তো তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পারব। ওই খুনী একা নয়, তার সঙ্গে আরও বহু লোক আছে। তারা সম্ভবত এই মুহূর্তে আক্কাসকে খুঁজছে।'

মেয়েটার চোখের কোণে পানি জমল, গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে। কার জন্যে কাঁদছে সে? নিজের জন্যে? আক্কাসের জন্যে? লোভ আর ঘৃণায় ভরপুর জগৎ, এবং মাসুদ রানার মত লোকদের জন্যে? অভয় দানের উদ্দেশে মেয়েটার কাঁধে একটু চাপ দিল রানা। ওহ্, ওহ্, তাওহিদা তো মারা যাচ্ছে! ওর উচিত ডাক্তার বা হাসপাতালে ফোন করা, তথ্য আদায়ের জন্যে চাপ দেয়া নয়! 'বলো আমাকে। আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব।'

মুখটা খুলছে আর বন্ধ করছে তাওহিদা। 'ভাই, আমার জন্যে দোয়া কোরো। সে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। পিরামিডের ওখানে। সন-ই—'

তাওহিদার মাথা এক পাশে ঢলে পড়ল, সেই সঙ্গে রানা যেন অনুভব করল প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল শরীর থেকে। তার মাথাটা বালিশে নামিয়ে রাখল, তারপর হাতের রক্ত ধোয়ার জন্যে সিধে হলো দ্রুত।

ছয়

'আজ রাতে আপনারা ইতিহাসের অত্যন্ত প্রাচীন ও সারা দুনিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন:...'

লোকটার গলা ঠাণ্ডা, সে যেন তাচ্ছিল্যের সুরে একদল মূর্খের সঙ্গে কথা বলছে। চোদ্দটা লাউডস্পীকার বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে তার নাটকীয় বর্ণনা। 'এখানে, মালভূমি গিজা-য়, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মানবজাতির সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব। কোন পর্যটক–সম্রাট, ব্যবসায়ী বা কবি–এই বালির ওপর যাঁরাই হেঁটেছেন তাঁদের সবাইকে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছে।'

সার্চ লাইটের আলো ওপর দিকে উঠছে, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে পিরামিড চিঅপস্-এর পুবদিকের অবয়ব। সারি সারি আসনে বসা ট্যুরিস্টদের কণ্ঠ থেকে সশ্রদ্ধ গুঞ্জন উঠল, সবাই মুগ্ধ ও বিহ্বল, ধীরে ধীরে পিছন দিকে নেমে যাচ্ছে তাদের মাথা, চোখের দৃষ্টি উঠে যাচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে রাতের আকাশে।

শুধু একজন এই দলে পড়ে না।

চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট নিনা সুসমি পঞ্চম সারির শেষ দিকে বসে আছে পাশে একটা খালি সিট নিয়ে, আলোর আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল জেনারেল জিফু ঝাঝং-এর পাঠানো লোক দু'জন জায়গামত আছে কিনা।

খুশি হলো সুসমি। সারি সারি আসনগুলোর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তারা, মুখ তুলে পিরামিড দেখছে। হঠাৎ দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো সচল আলো দিক বদল করায়। এখন শুধু আকাশের গায়ে পিরামিডের কাঠামোটাই দেখা যাচ্ছে।

'রাতের কালো পর্দা উঠে যাবার সময় হয়েছে, এবার উন্মোচিত হবে সেই মঞ্চ যেখানে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল...'

নিনা সুসমি হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। বিন আব্বাস দেরি করছে।

বাম দিকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো স্ফিংকস্, যেন সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি উদ্ভাসিত করে তুলছে ওটাকে। দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত, সুসমিও ব্যতিক্রম নয়। এরকম অমর সৃষ্টির প্রভাব অগ্রাহ্য করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আসলে এখানে তার দেখা করতে রাজি হওয়াটাই উচিত হয়নি।

'প্রতিটি নতুন প্রভাতে নীলনদের তীর থেকে সূর্যদেবতাকে উঠতে দেখি আমি। তাঁর প্রথম রশ্মি শুধুই আমার মুখের জন্যে, যে মুখ তাঁর দিকে ফেরানো থাকে।'

ছায়ায় দাঁড়িয়ে স্ফিংকস্-এর কণ্ঠস্বর, না পুরুষবাচক না স্ত্রীবাচক, শুনতে শুনতে রানা ভাবছে ফেরাউন শাপেরন কি সত্যি এভাবে কথা বলেছিলেন? ঐতিহাসিকরা হয়তো বলতে পারবেন। ভাস্কর্য শিল্পীদেরও পারা উচিত এই অর্ধ-মানব অর্ধ-সিংহ পাথুরে মূর্তির লিঙ্গ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা। তাওহিদা মারা যাবার আগে যে অসমাপ্ত শব্দ 'সন-ই-' উচ্চারণ করে গেছে সেটার বাকি অংশ 'লূমিয়েয়ার'। সন-ই-লূমিয়েয়ার মানে হলো, এই মুহূর্তে এখানে যা ঘটছে ঠিক তাই—আলো ও শব্দের কারসাজি সহযোগে এবং ধারা বিবরণীর মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে দর্শকদের আনন্দদান।

আলো সুযোগ দেয়ায় সারি সারি আসনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বিন আক্কাসকে খুঁজছে। ঈশ্বরের নিজের হাতে তৈরি নিখুঁত কোন সৌন্দর্য কিন্তু সব জায়গায় মানাবে না—হঠাৎ মনে হলো ওর—যেমন ট্যুর পার্টির একজন হিসেবে মানায়নি পঞ্চম সারিতে বসা মেয়েটিকে। একি সামান্য ধকল! কায়রো, গিজা, মেম্ফিস, এলো আমারনা, অ্যাবাইডস, লাক্সর, কারনাক, আসুয়ান। মাত্র তিন হপ্তার মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস কাভার করতে হবে, এরমধ্যে বারকয়েক গাধা আর উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির কিছু অংশও পেরুতে হবে। সম্ভব। তবে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকা ওই লম্বা মেয়েটার ভাষা হলো রূপ-যৌবন, সেই ভাষা বলে দিচ্ছে, এত কষ্ট তার পোষাবে না—ওদের সঙ্গে নিতান্তই বেমানান সে। রোদে পোড়া কাঁধে অবহেলায় একটা কার্ডিগান ফেলে রেখেছে মেয়েটা। এ-ও বোধহয় চাইনিজ মেয়ে। কেন, এখানেও কেন একজন চীনা মেয়ে থাকবে?

আরও দু'জন লোককে বেমানান লাগল রানার। স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ গড়ন, নেপালি বা তিব্বতী হতে পারে। লাইটওয়েট যে সুট পরে আছে তারা, যেন কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো হয়েছে।

লোক দু'জনের হাবভাব লক্ষ করছে, এই সময় একটা কিছু দেখে ছায়ার ভেতরে সরে এলো রানা। আলোর একটা টানেল শাপেরন পিরামিডের গায়ে লাগতে ওর উল্টোদিকে ছোটখাট এক লোককে দেখা গেল সামনের দিকে কাঁধ দুটো একটু ঝুঁকিয়ে আসনের সারি গুণতে গুণতে হাঁটছে, গোণার সময় তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। এতটা দূর থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল না, তবে ফ্ল্যাটে দেখা ফটোর চেহারার সঙ্গে মুখটা মিলে যাচ্ছে বলেই মনে হলো ওর।

এই সময় নিভে গেল আলো।

বিন আক্কাসকে দেখেই চিনতে পারল নিনা সুসমি, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। তার কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে

দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, সব সময় যেমন দেখায়—নার্ভাসনেস ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যেভাবে খুঁজছে, মনে হয় তার জানা নেই কোথায় পাওয়া যাবে সুসমিকে, অথচ তাকে তো বলেই দেয়া হয়েছে ঠিক কোথায় থাকবে সে। না, ঠিকই আছে। অডিয়্যান্স-এর ডান দিকের কোণ থেকে আসন সারি গুণছে সে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। তারপর দেখতে পেল। তার হাসিতে যতটা না অভ্যর্থনা তারচেয়ে বেশি স্বস্তি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো সে। হাঁটু জোড়া সরিয়ে নিয়ে তাকে পাশ কাটানোর সুযোগ করে দিল সুসমি। পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল আক্কাস। যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। তারপরই খিঁচে দৌড়। আসন ছেড়ে খানিকটা মাত্র উঠতে পারল সুসমি, ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেল আক্কাস।

ঠিক এই সময় নিভে গেল আলোটা।

কাকে যেন অভিশাপ দিয়ে অডিয়্যান্স-এর পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুটল রানা। অন্ধকারে একটা তারের সঙ্গে জড়িয়ে গেল পা, হোঁচট খেলো; পতনটা সামলাল কোন মতে। আরেকটা অভিশাপ দিতে আশপাশ থেকে সম্মোহিত দর্শকদের কেউ একজন হিসহিসে শব্দ করল, 'শ্-শ্-শ্!' রানার উদ্বেগের বিষয় হলো, হঠাৎ ওভাবে ছুটে পালাতে গেল কেন আক্কাস? লোকটা কি ওকে চিনতে পেরেছে? সে সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। নেপালি বা তিব্বতী ম্যাস্লম্যানদের কাউকে? সম্ভবত। এ-সব চিন্তা বাদ দিয়ে ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা। আরও একটা আকস্মিক আলোর বন্যা, এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাইসেরিনাস-এর পিরামিড; সেই আলোয় আকারে প্রকাণ্ড ও আকৃতিতে কিম্ভূতকিমাকার একটা ছায়াকে চিঅপস্-এর উত্তর দিক ধরে তীরবেগে নেমে যেতে দেখা গেল। আকার-আকৃতি যাই হোক, ওটা স্ফিংকস্ নয়, জলজ্যান্ত একজন মানুষ। দৌড়াচ্ছে যখন, এ নিশ্চয়ই আতঙ্কিত বিন আক্কাসই হবে। অদ্ভুত কোন দৃষ্টিভ্রমের কারণে মনে হলো সময়ের

হিসেবে মালিকের চেয়ে ছায়াটা কিছু পিছিয়ে আছে, অনেকটা যেন ধাওয়া করছে মালিককে। পিস্তল বের করে ছোটার গতি আরও বাড়াল রানা। একটা লাউডস্পীকারকে পাশ কাটাবার সময় গাইডের মুখ নিঃসৃত তোপ দমাদম আঘাত করল কানে। দূর! দূর! দূর! আবার নিভে গেল আলোটা। শালার কপাল!

তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেক দিকে অন্য একটা আলো জ্বলে উঠল, স্ফিংকস্ ভেসে গেল চোখ-ধাঁধানো আলোকরশ্মিতে। আলোর সেই উৎসের দিকে ঝট করে তাকাতে এমন একটা কিছু চোখে পড়ল যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো রানাকে। স্ফিংকস্ অনেকটা দূরে, সেটার সামনে বিশাল একটা কায়াকে দেখে প্রথমে মনে হলো কোন প্রাচীন পাথুরে স্ট্যাচু, ইতিহাসের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত যার কোন রেকর্ড রাখা হয়নি।

ওটার মাথা বিরাট ও বেঢপ। কাঁধ দুটো এত চওড়া, যেন অনায়াসে ওখানে একদল ছেলেমেয়ে নাচানাচি করতে পারবে। ওই হাত দুটো কোন মানুষের হতে পারে বলে বিশ্বাস করা কঠিন, এত মোটা আর লোমশ; শরীরের কাছ থেকে এমন ভঙ্গিতে দূরে সরিয়ে রেখেছে যেন একজন কুস্তিগীর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা কষছে। ওটার পিছনে স্ফিংকস্টাকে দেখে মনে হলো, এই প্রকাণ্ড দানবকে মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উপযুক্ত বাহনই বটে।

তারপর দানবটা নড়ল। মাথা ঘুরে গেল রানার দিকে। চোখ জোড়া জ্বলল। মুখের ভেতর আলো, যেন একটা লাইট হাউস থেকে বেরুচ্ছে। পরমুহূর্তে আবার সব ঢাকা পড়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

আব্বাস বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কারণ জানে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আজ তাকে মরতে হবে। ফাঁকটা দেখতে পেয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে সেটায় সেঁধোল ঠিক যেভাবে ফাটলের ভেতর একটা পোকা ঢোকে। যে লোক কবীর চৌধুরীর হয়ে খুন-খারাবি

করে বেড়ায় সেই দৈত্যের হাত থেকে পালাবার জন্যে যে-কোন গর্তে ঢুকতে রাজি সে।

কেন? কি কারণে ওদের কথা শুনতে গেল সে? কবীর চৌধুরীর সঙ্গে বেঈমানী করে পার পাওয়া সম্ভব, ওরা তাকে এটা কিভাবে বিশ্বাস করাতে পারল? বিশেষ করে এই ব্যাপারটায়! এটা তো একটা বিরাট আবিষ্কার। সাত নয়, বলা যায় সাতশো রাজার ধন। নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

বাতাসের প্রবাহ থেমে যাওয়াটা নাকে অনুভব করল, সঙ্গেসঙ্গে স্থির হয়ে গেল আক্কাস। ফাঁকটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিস্ময়কর নমুনা। ওকি সত্যি মানুষ? আক্কাস জানে না। প্রকাণ্ড দৈত্যের ভারী নিঃশ্বাস বনভূমিতে ঝড় ওঠার শব্দ তৈরি করছে। এই মুহূর্তে হাল ছেড়ে দিয়ে নিয়তিকে মেনে নিল আক্কাস। এই দানব তার জান কবচ করবেই। দুনিয়ায় কারও কোন শক্তি নেই ওটাকে ঠেকায়। কাঁধ দুটো নামিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল সে। আল্লাহ, হে আল্লাহ, কষ্ট দিয়ো না–আজরাইলকে বলো, তাড়াতাড়ি! খুব বেশি ব্যথা আর কষ্ট থেকে মুক্তি দাও আমাকে। নিজের দুই বাচ্চার কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল তাওহিদার কথা, ফ্ল্যাটে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বেচারি। তবে মৃত্যুকে মেনে নেয়া সত্ত্বেও কি কষ্ট পেতে যাচ্ছে ভেবে আতংকে কাঁপতে লাগল সে, সবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু একজনের কথা ভাবছে–দানবটা কি তাকে নিয়ে খেলবে? চোখ দুটো শক্ত করে বুজে থাকল সে, তালুর ভেতর নখ ঢুকে যাচ্ছে। আল্লাহ, যা ঘটার ঘটিয়ে ফেলো! স্প্রিঙের মত সিটকে ও কুঁকড়ে এত ছোট হয়ে যাচ্ছে, যেন ভেঙে যাবে এক্ষুণি।

হাঁটু জোড়ায় হাত পড়তে প্রায় স্বস্তি অনুভব করল সে। নিজেকে শক্ত করে চোখ মেলল। ঝাঁক ঝাঁক তারার বিপরীতে মুখের আদলটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। এমনকি নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতাও নেই। পরস্পরকে

ভক্ষণ করার আগে এটাই যদি জন্তু জানোয়ারদের মুখ বা মুখোশ হয় তাহলে খুব একটা খারাপ বলা চলে না। কিন্তু তারপরই মুখটা হাঁ হলো, দু'সারি স্টেইনলেস স্টীল-এর চওড়া ও ধারাল দাঁত দেখতে পেল আক্কাস। এইবার শুরু হলো তার চিৎকার। সেই চিৎকারে কান না দিয়ে কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত তাকে নিজের হাঁটুর ওপর টেনে আনল জানোয়ার, তারপর এমন অনায়াসে কামড় বসাল তার ঘাড়ের পিছনে ওটা যেন একটা নরম পুঁই ডাঁটা।

রানার কানে লাঠি বা ডাল ভাঙার একটা শব্দ ঢুকল, চিৎকারটা থেমে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে। শব্দের উৎস অনুসরণ করে ছুটল ও। অকস্মাৎ দেখল দুই খণ্ড পাথরের মাঝখানে উদয় হলো অতিকায় একটা মানুষ, যেন প্রাচীন কোন শবাধার থেকে বেরিয়ে এসে পালাতে চাইছে অতৃপ্ত কোন আত্মা।

এক সেকেন্ডের জন্যে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, তারপর অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে হাসল জানোয়ার, চকচকে দু'সারি দাঁত দেখিয়ে ঘুরল, এবং চোখের নিমেষে রানার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানা ইতস্তত করছে, ভাবছে আগে আক্কাসকে খুঁজে বের করা উচিত, নাকি ইস্পাতের দাঁত লাগানো পাহাড়সদৃশ বিস্ময়টার পিছু নেবে। ঝোঁকটা ধাওয়া করারই, তবে দরকার আক্কাসকে। হাতের পিস্তল নিচু করে ত্রিশটনী পাথরের একটা খণ্ডে কাঁধ ঘষে বাঁক ঘুরল ও। এরকম একই মাপের অসংখ্য পাথর পিরামিডের ভিত তৈরি করেছে। মনটা হতাশায় ছেড়ে গেল ছায়া থেকে একটা পা বেরিয়ে থাকতে দেখে। দ্রুত এগিয়ে এসে পাশে বসল, পালস দেখছে। অন্ধকারে কি যেন চকচক করছে–রক্তস্রোত, ঘাড় আর কাঁধ থেকে বেরিয়ে এসে ছড়াচ্ছে। কেউ একজন, আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না কে হতে পারে সে, ঘাড়ের অর্ধেকটাই কামড়ে তুলে নিয়েছে। পালস নেই দেখে লোকটাকে ঘুরিয়ে চিৎ করল রানা।

আতংকে বিস্ফারিত মুখ চেনা যায়। বিন আব্বাস।

পুরানো সুটটা ভাল করে সার্চ করল রানা। ব্রেস্ট পকেটে পাওয়া গেল ছোট একটা ডায়েরী। দ্রুত নিজের জ্যাকেট পকেট থেকে একটা রূপালি পেন্সিল বের করল ও, নিয়ম ধরে বোতামে চাপ দিলে ছুরি, টর্চ, অ্যাসিড ও বর্শা নিক্ষেপক টিউব হিসেবে কাজ করে। টর্চটা জ্বালল ও। সরু আলো ফেলে ডায়েরীর পাতাগুলো পরীক্ষা করে দেখল 'অ্যাড্রেস' সেকশন একদম খালি, কোথাও কোন টেলিফোন নম্বরও লেখা নেই। দৈনিক এন্ট্রি দেখে বোঝা গেল ওগুলো সব তার কাজ বা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আরবি ভাষায় লেখা একটা এন্ট্রি বিড়বিড় করে পড়ল রানা। 'খেম-এন-ডু এক্সকাভেইশন কমিটির মীটিং।' আরেক জায়গায় লেখা আছে–কপটিক মিউজিয়াম ডিরেক্টরদের সঙ্গে লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এমন কি মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে তাওহিদার জন্মদিনটাও লিখে রাখা হয়েছে। অতিক্ষুদ্র ও প্রায় শুকিয়ে আসা রানার ভাবাবেগের ভাণ্ডার সামান্য আলোড়িত হলো এই ভেবে যে এই তারিখটা পার হয়ে গেছে। ও আশা করল আব্বাস ও তাওহিদা দিনটা নিশ্চয়ই হেসেখেলে আনন্দে কাটিয়েছে।

আগামী বৃহস্পতিবারের একটা এন্ট্রি দেখতে পেল রানা। 'মোহাব্বত গামা, ডিং ডং ক্লাব–সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।'

নাম বা ক্লাব, কোনটাই রানার পরিচিত নয়, তবে ওর হাতে এখন এটাই একমাত্র সূত্র। ক্লু অবশ্য আরও পাওয়া যাবে, তবে সেজন্যে আব্বাসের ফ্ল্যাট আর কায়রো মিউজিয়ামে তার অফিস সার্চ করতে হবে। সেজন্যে সময় দরকার। জরুরী কাজ অবশ্য আরও একটা আছে। কিংকং গরিলাটাকে খুঁজে বার করতে হবে। লোকজনের ভিড়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে, এমন দেশ কোথাও সে পাবে না। পায়ের কাছে ভাঙা শরীরটার দিকে চোখ নামিয়ে তাকাতে শিউরে উঠল রানা। ঘাড়ের পিছনটা এভাবে কিভাবে ছিঁড়ে নিয়ে গেল? এ যেন মনে হয়–না। বড় বেশি রোমহর্ষক, বড়

বেশি অবিশ্বাস্য বলে ধারণাটা বাতিল করে দিল রানা। তবে, একেবারে উড়িয়েই বা দেয় কিভাবে–একবার শিকারী টেরিয়ার খুন করার পর একটা ইঁদুরকে পরীক্ষা করেছিল ও; এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরেকবার চোখ নামিয়ে বিস্ফারিত চোখ, নিরীহ ও ভদ্র গোছের অবয়ব, জমাট বাঁধতে শুরু করা রক্তের ভেতর ভাঙা সাদা হাড় দেখল। বিবমিষার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ডায়েরীটা পকেটে ভরে ঘুরল ও, দ্রুত পা চালিয়ে পালিয়ে এলো ওখান থেকে।

বাইরে অন্ধকার, বেশ খানিক দূর থেকে ভেসে আসছে গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ আর ট্যুর অপারেটরদের হাঁকডাক। সন-ই-লুমিয়েয়ার পর্ব নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। হাঁটু থেকে বালি ঝেড়ে চিঅপস্-এর বিশাল কাঠামো ঘুরে হাঁটছে রানা, ওদিকে কয়েকটা কার-এর হেডলাইট অন্ধকারে আলোর টানেল তৈরি করছে। নেপোলিয়নের হিসাবটা যেন কি ছিল? গিজাহ্-এর তিনটে পিরামিডে যত পাথর আছে, গোটা ফ্রান্সকে দশফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলার জন্যে তা যথেষ্ট।

বালিতে পায়ের নরম শব্দ রানার কানে একটু দেরিতে ঢুকল, ও ঘুরলও উল্টোদিকে। ডান কানের পিছনে যেন একটা বাজ পড়ল, সেই সঙ্গে পায়ের নিচে ফাঁক হলো গভীর এক পাতাল। ধীরগতিতে ডিগবাজি খেয়ে ওটার ভেতর পড়ল, বারবার পাক খাবার সময় দেখতে পেল চিঅপস্-এর চৌকো অবয়ব চারশো পঞ্চান্ন ফুট নয়, বরং সীমাহীন অনন্ত আকাশের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় হারিয়ে গেছে।

সাত

কেউ একজন মাথায় টোকা মেরে রানাকে চোখ খুলতে বলছে। শব্দটা বহু দূর থেকে অসংখ্য বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে ভেসে এলেও ভোঁতা নয়, তার ওপর বিরতিহীন। রানা অপেক্ষা করছে, ভাবছে লোকটা যে-ই হোক এক সময় বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। কিন্তু যাচ্ছে না, বরং আরও নিয়মিত টোকা মারছে; প্রতিটি টোকার সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে মাথাটা, মাথা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে একটা ব্যথা। এভাবে এড়ানো যাবে না। দেখা দরকার কে ওকে এভাবে বিরক্ত করছে। ঠোঁট নেড়ে প্রতিবাদ জানাতে চাইল, চোখ খোলার জন্যে বাধ্য করছে নিজেকে। কঠিন কাজ। নিশ্চয়ই খুব গভীর ঘুমে ছিল ও। আমাকে বিরক্ত করার জন্যে মর ব্যাটারা! আরে, মোচড় খাওয়া কুয়াশার ভেতর কে ওটা? ভাল করে দেখার জন্যে চোখ কোঁচকাল রানা। মুখটা যেন মুখোশ, গোল ও চকচকে, ভেতরে ঢোকা চোখ জোড়া থেকে যেন অশ্রুর ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে নামছে। রানা বিহ্বল। মুখ বা মুখোশের কোন কিছুই নড়ছে না। ওটার কোন নাকও নেই। তাছাড়া, এত গোল কেন? এরকম চকচক করবে কেন?

ধীরে ধীরে মাথাটা পরিষ্কার হলো, তারপর বুঝতে পারল কি দেখছে। ওর সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার শার্টের বোতাম।

'ওর জ্ঞান ফিরেছে,' গলার আওয়াজ, ভাষাটাও, চীনা।

নির্দয় একটা হাত রানার চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল পিছন দিকে। চৌকো একটা মুখ দেখতে পেল রানা, এত চ্যাপ্টা যে নাক নেই বললেই চলে। মুখে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি প্রচুর শুকনো দাগ, যেন ছুরির ফলা দিয়ে কেউ রক্তাক্ত নকশা কেটেছিল। আচ্ছা, সন-ই-লূমিয়েয়ার-এ দেখা লোক দু'জন তাহলে নেপালি বা তিব্বতী নয়, চীনা! অন্তত এই লোকটা অবশ্যই তাই। রানা কোন কথা না বলে মাথাটা আরও পরিষ্কার হবার অপেক্ষায় থাকল, পরীক্ষা করে বুঝতে পারল একটা চেয়ারের পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে ওর হাত দুটো। খুব শক্ত করে বেঁধেছে, মনে হচ্ছে হাড় ভেঙে যাবে। ওর পা দুটোও চেয়ারটার সামনের দুই পায়ার সঙ্গে বাঁধা। লক্ষণ শুভ নয়। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো দ্বিতীয় লোকটার হাতে একটা ডিভাইস দেখে। ডিভাইসটার সঙ্গে একটা হেভী-ডিউটি ব্যাটারির সংযোগ দিচ্ছে সে। ছোট একটা ধাতব বাক্সের মত দেখতে জিনিসটা, অন/অফ করার সুইস সহ কাঁচের প্যানেলের ভেতর লাল রঙের মাত্রা পরিমাপক একটা ডায়াল। একটা লিভারও আছে, এই মুহূর্তে খাড়া একটা গর্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। সবচেয়ে অশুভ হলো একজোড়া লম্বা তার, বাক্সের পাশ থেকে বেরিয়ে ধাতব কুমিরের দাঁতে গিয়ে ঠেকেছে।

মাথার পিছনের ব্যথাটা ভুলে গেল রানা। সত্যি কথা বলতে কি, ডিভাইসটা দেখার পর ব্যথাটা আর অনুভবই করছে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়েছে ওকে নিয়ে কি করতে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু ওরা চীনা, বন্ধু মানুষ, একটা ভুল করে ক্ষমাও চেয়েছে! এখন তাহলে এ-সব কি ঘটছে?

'এই যে, ভাই, সব খবর ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল রানা, ম্যান্ডারিন চীনা ভাষাতেই। 'এখনও যদি আমাকে চিনতে পেরে না থাকো—আমি...' হঠাৎ থেমে গেল, উপলব্ধি করল মাথাটা এখনও ঠিকমত কাজ করছে না। চীনা হলেই বন্ধু হবে, এমন কোন

নিশ্চয়তা আছে? এসপিওনাজ জগতে কে যে কাকে দিয়ে কি স্বার্থ উদ্ধার করবে, কেউ তা বলতে পারে না। দিল্লীর হিন্দু পুরোহিত পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করে, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের ইমাম পাকিস্তানের গোপন সামরিক তথ্য ভারতে পাচার করে। তাইওয়ানিজ চীনারা কবীর চৌধুরীর হয়ে কাজ করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এরা এমন কি মার্কিন চীনাও হতে পারে–হয়তো মস্কোর হয়ে কাজ করছে। এখন যদিও সুপারপাওয়ার নয় রাশিয়া, তবে ঢোঁড়া হলেও সাপ তো–বিষ ঢালতে না পারলেও ছোবল মারতে ঠিকই পারবে। কাজেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করাটা ঠিক হবে না।

'তুমি মাসুদ রানা,' রানাকে অবাক করে দিয়ে ওদের একজন বলল। 'আমরা তোমাকে চিনি। তবে যতক্ষণ পারো নিরবে সব সহ্য করে যাও। শুধু যখন প্রশ্ন করব, জবাব দিয়ো। তার আগে যাই বলো, আমরা শুনতে পাব না।'

'তোমরা যদি চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট...'

'চোপ! শালা!' কঠিন সুরে অনর্গল অশ্রাব্য চীনাখিস্তি আওড়াল দ্বিতীয় লোকটা। 'ফের কথা বলবি তো মুখের ভেতর পেশাব করে দেব।'

প্রথম লোকটা ডিভাইসে ব্যাটারির সংযোগ দেয়ার পর সঙ্গীর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। ওরা এখন তৈরি। দৈত্যাকার সেই বিস্ময়ের কোন চিহ্ন এখন পর্যন্ত রানা দেখতে পায়নি। চীনাদের একজন টেলিফোন করার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল

আগোছাল ও নোংরা কামরাটার চারদিকে তাকাল ও, মনোনিবেশ করা যায় এমন কিছু একটা খুঁজছে। নির্যাতন সহ্য করার জন্যে এটা একটা ভাল উপায়–অর্থহীন বিষয়ে মাথা ঘামাও, গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু জানতে চাইবে সেগুলো ভুলে থাকো। রানার চোখ স্থির হলো নগ্ন বালবকে ছাড়িয়ে এসে দেয়ালে সাঁটা একটা ক্যালেন্ডারের ওপর। মিশরীয় তরুণীর মুখ ও বাহু ছাপা হয়েছে,

পেলব হাত তুলে একটা মোটরসাইকেল দেখাচ্ছে সে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, যেহেতু ফটোটা তোলার সময় তাকিয়ে ছিল ক্যামেরাম্যানের দিকে–অর্থাৎ চীনা লোক দু'জন কি করছে তা সে দেখতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, একে দিয়ে চলবে। মেয়েটার সাহায্য নিয়ে এই কঠিন সময় পার করে দেবে রানা।

'মিস্টার রানা,' এবার ভাষাটা ইংরেজি, এবং বিশুদ্ধ। 'আমরা সিদ্ধান্ত বদলেছি। একটা মাত্র সহজ প্রশ্নের উত্তর দিলে অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন আপনি। ট্র্যাকিং সিস্টেমের ব্লুপ্রিন্টটা কোথায়?'

এরকম দুরবস্থার মধ্যেও হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। 'ওটা আমার কাছে নেই। আমি পাইনি।'

ধাতব দাঁত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা হেসে উঠল, তারপর পরস্পরের সঙ্গে ঠুকল ওগুলো।

'তাহলে আক্কাসকে আপনি খুন করলেন কেন?'

প্রশ্নটা ঘাবড়ে দিল রানাকে। ব্যাপারটা কি, আক্কাসকে নিজেরা খুন করে ওর ঘাড়ে কেন দোষ চাপাতে চাইছে? ব্যারাকিউডার মত মুখ নিয়ে অতিকায় সেই দানবটা আক্কাসের ঘাড়ের পিছনটা কামড়ে তুলে নিয়েছে, চিবিয়েছে হাড় ও মাংস। তাহলে এই প্রশ্নটা করার মানে কি? এ নিশ্চয়ই কোন ধরনের ফাঁদ পাতছে ওরা। ওদের কি সত্যি ধারণা মারা যাবার আগে ব্লুপ্রিন্টটা দিয়ে গেছে আক্কাস? কিংবা এমন কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে পরে যেখান থেকে রানা সেটা উদ্ধার করতে পারবে? হ্যাঁ, ওরা এরকম কিছুই ভাবছে।

উত্তর দেয়ার আগে বড় করে দম নিল রানা, কারণ জানে এর ফলে প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে ওকে। 'দুঃখিত, বন্ধুরা। তোমরা ভুল করছ। আমি আক্কাসকে খুন করিনি।' ইন্টারোগেটর লোকটার চোখে-মুখে কোন ভাব বা আবেগ ফুটল না। শুধু ছোট্ট করে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার কোমরের

বেল্টটা খুলতে শুরু করল। রানার পেট ঠাণ্ডায় জমে গেল। ওর শরীরে এখন যে ঘামের ধারা বইছে সেগুলো পেটের ওপর দিয়ে গড়ালে জমাট বেঁধে যাবে। মেটাল বক্স হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও। লোকটার চোখ দুটো যেন লোলুপতা বা কামুকতায় চকচক করছে। ব্যথা হলো তার রক্ষিতা। রানার ট্রাউজারের ওপরের অংশ হুকমুক্ত করা হয়ে গেছে, এখন এক এক করে বোতামগুলো খোলা হচ্ছে। তারপর চেইনটাও টান দিয়ে নামানো হলো। ও যেন ছোট্ট শিশু, ল্যাভাটারিতে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর ট্রাউজার ও আন্ডারপ্যান্ট টেনে হাঁটুর কাছে আনা হলো। ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে মেয়েটার চোখে বিস্ময় দেখতে চাইল রানা। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি, তার দিকে তাকাতে বিব্রত বোধ করছে ও। এ যেন ডেনটিস্ট-এর চেম্বারে সেই মেয়েটা, যে এক গ্লাস বেগুনি পানি দিয়েছে, কিন্তু অসাড় মুখ নিয়ে ওই পানি দিয়ে কুলকুচো করতে পারছ না তুমি–তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তোমার এই আড়ষ্টতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে সে।

'এটাই আপনার শেষ সুযোগ। মাইক্রোফিল্মটা কোথায়?'

'একবার না বললাম... জাহান্নামে যাও তোমরা!'

জবাবে রানাকে লোকটা চড় মারল না। সে একজন প্রফেশন্যাল, শক্তি সঞ্চিত রাখার সামর্থ্যও তার আছে। চড় ও ঘুসি মেরে একটা লোকের মুখকে ছাতু বানালে যে কাজ হবে তারচেয়ে দশ লাখ গুণ বেশি কাজ দেবে জননেন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট চালালে। সে পিছিয়ে গেল, তার সঙ্গী ধাতব নখ নিয়ে ব্যগ্রভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। এই লোকটার তাড়াহুড়োর মধ্যে একটা অশ্লীলতা আছে। তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ পেল রানা, ঝট করে ঘুরিয়ে নিল মুখটা। তারপরও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ধাতব আঙটাগুলো খুলে ফাঁক হয়ে গেল। পরক্ষণে ব্যথায় চোখ-মুখ কোঁচকাল রানা, নরম মাংসে কামড়

বসিয়েছে ধাতব দাঁত। এই ব্যথাই তো অসহ্য। এর বেশি কিভাবে সইবে?

অপারেটর ঠোঁট কামড়ে এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল, তারপর অন/অফ সুইচে হাত রেখে রানার দিকে ফিরে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল যেন ফটো তোলার জন্যে ভাল একটা পোজ-এর অপেক্ষায় আছে। রানা বুঝতে পারছে, ওর সহ্যক্ষমতার আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে লোকটা। হিসাব কষছে বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে কাতর শরীরটা লাফ দিয়ে কতটা ওপর পর্যন্ত উঠবে।

লোকটা সুইচে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রানা অনুভব করল সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ থেকে স্নায়ু-ঝাঁকানো একটা কম্পন সারা শরীরে এক নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল। এটা ঠিক ব্যথা নয়, তবে অপ্রীতিকর একটা অনুভূতি জাগাল, শির শির করছে গা। মেশিনটা সচল হয়ে জানান দিচ্ছে ব্যথা দেয়ার জন্যে তৈরি সে। ক্যালেন্ডারের দিকে মুখ তুলে মেয়েটার কালো, কোমল ও গভীর চোখ দুটোর দিকে তাকাল রানা, চেষ্টা করল ওগুলোর ভেতর ডুব দিতে।

'আপনি বোকামি করছেন, মিস্টার রানা। কারণ এক সময় আমরা যা জানতে চাই সবই আপনি বলবেন।' রানার দৃষ্টি এক চুল নড়ল না। 'আমরা অল্প দিয়ে শুরু করছি, শুধু একটু ধারণা দিতে চাই এরপর কি আসছে।'

মিশরীয় তরুণীর কালো ও কোমল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকো। ওর সুন্দর চেহারাই বলে দিচ্ছে ভাল একটা মেয়ে, তোমাকে একটা মোটরসাইকেল কিনতে বলছে। একটা মোটরসাইকেল পেলে এই কামরা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে তুমি...

চিৎকারটা শুধু রানার গলা থেকে নয়, যেন বেরিয়ে এলো ওর সমগ্র অস্তিত্ব থেকে, এবং মনে হলো বেরুবার সময় সঙ্গে নিতে চাইছে শরীরের মূল সবগুলো অঙ্গ। অনুভব করল ওর শরীরের

ভেতর সবকিছু খুলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে যাতে বেরুবার জন্যে প্যাসেজ হিসেবে গলাটাকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু ওর গলা তো যথেষ্ট বড় নয়। চিৎকার মাথা থেকে বেরুচ্ছে, বেরুচ্ছে কান থেকে। ব্যথা পাবে জানত, সেজন্যে নিজেকে তৈরি করেও রেখেছিল, কিন্তু এ তো পাগল করে দেবে না হয় খুন করে ফেলবে। এটাকে ওর শরীরের ভেতর আক্রমণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়েছে কিনা মনে করতে পারছে না। যেন ওর গোটা নার্ভাস সিস্টেম ধারাল কোদাল দিয়ে উল্টে দেয়া হয়েছে।

'দেখতেই পাচ্ছেন।' ব্যথা ও কষ্ট চোখের সামনে সমস্ত কিছুর ওপর লালচে কুয়াশা ছড়িয়ে দিয়েছে, তার ভেতর থেকে ভেসে এলো আওয়াজটা। 'ব্যাপারটা প্রীতিকর নয়। এটা থামবেও না–চলবে...চলবে...চলতেই থাকবে।' রানার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। অনুভব করল ধারাগুলো বুক বেয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কব্জি দুটোয় নিষ্ঠুর একটা ব্যথা দপ্‌দপ্ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, বৈদ্যুতিক ধাক্কা ওকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়ায় চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা হাত দুটোয় কি ভীষণ টান পড়েছিল। 'তবে ঘাবড়াবেন না। আপনার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যখন কিছুই অনুভব করবেন না, তখন। কারণ তখন আর আপনি একজন পুরুষ থাকবেন না।'

আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো! রানা ভাবছে। দুনিয়া বা স্বর্গে অন্য আর কোন শক্তি আছে কি যে ওকে এই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার মত কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে?

'মিস্টার রানা, ভেবে দেখুন। আপনি কি কথা বলবেন? এখন, নাকি পরে?'

মাথাটা তুলে আরেকবার মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। এসো, সুন্দরী! আমাকে জাদু করো! তোমার ওপর আমার ভরসা আছে! দু'জনের মধ্যে মধুর কিছু একটা ঘটছে।

রানা তৈরি হলো, জানে একের পর এক ঢেউ-এর মত

আসবে ব্যথা। প্রথম ঢেউটা ফুলে-ফেঁপে ছুটে এলো, পরিচিত জায়গায় নাক গলাল, এর আগে ঢুঁ মেরে যাওয়া ফুটো ফাটলে ঢুকল। তারপর সামনে বাড়া শুরু হলো, একটাকে ছাড়িয়ে আরেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে নতুন এলাকার সন্ধানে। রানার মুখ যেন সেলাই করে দেয়া হয়েছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা খুলতে পারছে না। গলা ফুলতে ফুলতে বিস্ফোরিত হবার দশা। বাঁধন ছিঁড়ে কামানের গোলার মত ছুটতে চাইছে শরীরটা। দুই পায়ের মাঝখানের এই ব্যথা শুধু ওর শরীরে নয়, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওর আত্মায়।

'না!'

ঢেউগুলো পিছিয়ে পড়ল, ব্যথার সাগর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। মাথাটা ঘামে ভেজা বুকে নেমে এসেছে, ব্যথায় দপ্-দপ্ করা কান দুটো খাড়া করল রানা ওই নারীকণ্ঠের আরও একটা আওয়াজ শোনার আশায়।

'গর্দভ! খচ্চর! ওকে তোমরা খুন করতে চাইছ?' ম্যান্ডারিন ভাষায় দ্রুত কথা বলছে মেয়েটা, তবে রানার বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। 'একটা লাশের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়?'

মিন মিন করে নিজেদের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে লোক দু'জন। একটা চোখ সামান্য একটু খুলে আগন্তুক মেয়েটাকে একবার দেখার চেষ্টা করল রানা। ট্রাউজারের একজোড়া পা দেখতে পেল, একটা অসহিষ্ণু গোড়ালি মেঝেতে টোকা দিচ্ছে। 'তোমাদের কি আবার মনে করিয়ে দিতে হবে এই অপারেশনে কে নেতৃত্ব দিচ্ছে? ওর বাঁধন খুলে দাও। আমি ওকে এখুনি সুস্থ দেখতে চাই। ওর কাছ থেকে কথা বের করার জন্যে আমাদের কাছে ড্রাগ আছে।'

রানা ভাবল, ও, আচ্ছা, নিঃস্বার্থ বন্ধু কেউ নও!

'কিন্তু ম্যাডাম। আপনার ওষুধের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি।'

এ হলো দুই স্যাডিস্টের প্রথমজন। 'এই পদ্ধতিতে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সাফল্যের হার শতকরা নব্বুই ভাগ। আমরা না চাইলে সাবজেক্ট মরবেও না।'

'তা হোক। আমি যা বলছি তাই করো।'

রানা ধরে নিল সবার চোখ এখন মেয়েটার দিকে, এই সুযোগে মাথাটা একটু ঘোরানো যায়। আধখোলা চোখ দিয়ে এক ঋজু তরুণীকে দেখতে পেল। প্রথমেই মনে পড়ল, এই পরমাসুন্দরী ওর পরিচিত। হ্যাঁ, একে দেখেছে সন-ই-লূমিয়েয়ারে। বোঝাই যাচ্ছে, এ-ও ওদেরই একজন। শুধু ওদের একজন নয়, সেই লীডার। অপর দু'জনের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়। নিজেদের পদ্ধতিতে এত দিন লোকজনকে টরচার করার পর কোন মেয়ের কাছ থেকে হুকুম পেতে কেমন লাগে। এত রূপ, নেতাদের কারও সেক্রেটারী হলেই তো পারত!

ধাতব আঙটা চামড়া তোলা মাংস থেকে খুলে নিচ্ছে ওরা, প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো রানার। ক্লিক করে একটা ছুরির ফলা উন্মুক্ত হবার শব্দ ঢুকল কানে, অনুভব করল পায়ে বাঁধা রশি কাটা হচ্ছে। নিজেকে রানা সতর্ক করল। এখনই সময়। ওর একমাত্র সুযোগ আসন্ন। এই সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে ও শেষ। এটা বা ওটা, যে-কোন একটা পদ্ধতিতে খুলে ওর ভেতরটা সার্চ করা হবে, তারপর যখন কিছু পাবে না তখন ওকে খুন করবে ওরা। মেয়েটা দয়ার সাগর নয়, প্র্যাকটিক্যাল।

ঝুঁকি নিয়ে আরেকবার তাকাল রানা। ডিভাইসটার অপারেটর মুখ হাঁড়ি করে কানেকশন ওয়্যারগুলো আঙুলে পেঁচাচ্ছে। আকস্মিক উজ্জ্বল রোদের মত একটা আইডিয়া এলো মাথায়। এতে কাজ হতে পারে, অন্তত সম্ভাবনা আছে। সামনের দিকে একটু ঢলে পড়ল রানা, অনুভব করল ছুরির ফলা এখন কব্জির বাঁধনগুলো ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে কাটছে।

অর্ধেক রশি কাটা হলো। চারভাগের তিনভাগ। আটভাগের

সাত। শরীরটা শক্ত করল রানা। তারপর যেইমাত্র রশি ছিঁড়ল, অমনি লাফ দিল ওকে নপুংসক বানাবার যন্ত্রটা লক্ষ্য করে। ডিভাইসটা থেকে এখনও যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে, লাল একটা আলোও জ্বলছে। ও কি করতে চাইছে বুঝতে দেরি করে ফেলল অপারেটর লোকটা। আঙুলে জড়ানো তার খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাল। লিভারটা ধরে ঠেলে দিল রানা। গজ-এর কাঁটা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক দেখা গেল, একই সঙ্গে অপারেটরের কুণ্ডলী পাকানো শরীর শূন্যে উঠে পড়ল। গলা থেকে দু'রকম আওয়াজ নিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। পোড়া ও ঝলসানো মাংসের গন্ধে ভরে উঠল কামরা। লোকটার শরীর দেয়ালে সেঁটে গেল অসুস্থকর গা রি-রি করা সংঘর্ষে। তবে ধাক্কা খাওয়ার আগে, সময়ের হিসেবে এক সেকেন্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ আগে, মারা গেছে সে।

ক্ষিপ্র একটা ভঙ্গিতে মাথাটা এক পাশে সরিয়ে নিল রানা, ছুরির ফলা ওর গলাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ডান হাত চালাল ও, প্রতিপক্ষের বাহুটাকে ঠেকিয়ে দিল মাঝপথে, তা না হলে চোখে লাগত ঘুসিটা। রানার বাম হাতও খালি, লোকটার গলার পাশে নার্ভের ভেতর দুটো আঙুল প্রায় গেঁথে দিল। মেঝেতে দড়াম করে পড়ল যেন একটা গাছ।

দুই অনড় শত্রুর দিকে তাকিয়ে ট্রাউজারে হাত মুছল রানা, তারপর ধীরে ধীরে মেয়েটার দিকে ঘাড় ফেরাল।

গত কয়েক সেকেন্ডের ঘটনায় যেন সম্মোহিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্রাউজার পরা শেষ করল রানা। ভাবছে, কি ব্যাপার, ওর দিকে পিস্তল তোলেনি কেন? এতক্ষণে কি তাহলে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের ভুল ভাঙল? 'আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।' ওর মুখে গম্ভীর হাসি। 'বোধহয় আরও দু'একজনের।'

তারপরই দরজা টপকে সিঁড়ির মাথায় চলে এলো রানা,

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে, প্রতিবার দুটো করে ধাপ টপকে। কাঁধের ধাক্কায় দু'দুটো দরজা খুলে ঠাণ্ডা-আরাম বাতাসে বেরিয়ে এলো। সরু একটা গলি ধরে ছুটছে। তারপর পৌঁছে গেল বড় একটা রাস্তায়। এখানে লোকজন হাঁটছে। গতি কমিয়ে তাদের সঙ্গে ও-ও হাঁটতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনে নিজেকে আবার আশ্বস্ত করল—এখনও বেঁচে আছে ও।

আট

কায়রো থেকে তিনশো পঁচাত্তর মাইল দক্ষিণে, নীলনদের পুব তীরে ট্যুরিস্টদের প্রিয় একটা শহর ল্যাক্সর-এর কাছাকাছি ডিং ডং ক্লাবটা খুঁজে পাওয়া গেল। ক্লাব ভবনটার ছিরিছাঁদ বলতে কিছু নেই; খোলা কারাগার, মেথোডিস্ট চার্চ, ছাত্রদের হোস্টেল বা সৈনিকদের ব্যারাক বলে চালিয়ে দেয়া যায়। তবে দালানটাকে ঘিরে রেখেছে কয়েক সারি পাম গাছ, এ যেন অনেকটা এর দৈন্যদশা ঢাকার জন্যে প্রকৃতির গরজ।

রানা হতাশ বা বিমর্ষ নয়। দুই রাত আগের অ্যাকশন থেকে পাওয়া কষ্ট ওকে বরং দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হতে সাহায্য করেছে। হাতে একটা সূত্র আছে, পরখ করে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, কঠিন ও পৈশাচিক একটা খেলার আয়োজন চলছে কোথাও, সেই খেলায় সে-ও অংশ নিচ্ছে। ওর ভূমিকা এই মুহূর্তে যতই নগণ্য হোক, জিততে হলে খেলাটা ওকে খেলে যেতে হবে।

ক্লাবের বাইরে গাড়ির সমাবেশ দেখারই মত। ক্যাডিলাক আর মার্সিডিজের ছড়াছড়ি, অন্তত তিনটে রোলস রয়েসও দেখতে পেল রানা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, নাম্বার প্লেট সবগুলোই আরবি ভাষায় লেখা, অর্থাৎ স্থানীয় মিশরীয়রাই এগুলোর মালিক।

ডিনার জ্যাকেটের নিচে কাঁধ উঁচু করল রানা, বহুরঙা উর্দি পরা দারোয়ানের চোখে চোখ রাখল। লোকটার কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে খাপে ভরা বিরাট একটা ছোরা, প্রায় তরোয়ালই বলা যায়। ঈগলের মত বাঁকা তার নাক, সেটা কুঁচকে রানার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন বুশের কাছে কৌশলে হেরে গিয়ে আল গোর চাকরির খোঁজে তার কাছে চলে এসেছে। মুখে হাসি নেই, মাথাটা ঝাঁকাল সে গম্ভীর ভঙ্গিতে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে পা রাখল রানা।

ভেতরটা বাইরের ঠিক উল্টো। এন্ট্রান্স হলটার সিলিং অনেক উঁচু, খিলান আকৃতির জানালায় বহু রঙের জাফরি কাটা। ডান দিকে হ্যাট-কোট খুলে রাখার জন্যে আলাদা একটা কামরা আছে, পাশেই কয়েকটা টেলিফোন বুদ। রিসেপশন ডেস্কটা বাম দিকে, তিন-চারটে তরুণী বসে নিজেদের মধ্যে গল্প আর হাসাহাসি করছে। ডেস্কের এক ধারে একটা নোটিশ বোর্ড টাঙানো। আরেক ধারে একটা খোলা লেটারবক্স। নোটিশ বোর্ডের সামনে একবার থামল রানা। কোথায় কখন কি ঘটবে, সব লেখা আছে বোর্ডটায়–ঘোড়দৌড়, বলডান্স, সুইমিং-পুলে সাঁতার প্রতিযোগিতা, উট-দৌড়, ব্রিজ টুর্নামেন্ট ইত্যাদি। যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের নামও লেখা আছে। তার মধ্যে গামা বা মোহাব্বত বলে কেউ নেই। জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। তখন হাতে একটা গ্লাস থাকা দরকার, বিশেষ করে আশপাশের প্রায় সবার হাতেই যখন রয়েছে।

বার আরও একটা আহ্লাদ জাগানো চমক। নড়াচড়ার জন্যে প্রচুর জায়গা। চারদিকে আরাম করে বসার আয়োজন।

মাঝখানের উঁচু ও গোল মঞ্চটা মখমলের পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সিলিং থেকে ঝুলছে কয়েকটা ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি। টাইলস্ লাগানো মেঝের কিছুটা কার্পেটে ঢাকা। গোটা দালানই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাসত্ত্বেও অলস ভঙ্গিতে মাথার ওপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। বারটা একদিকের পুরো দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর তৈরি করা হয়েছে, দেয়ালটা আয়নায় মোড়া। সোফা ফেলা হয়েছে শুধু জানালাগুলোর দু'পাশে। চল্লিশটার মত টেবিল, আকার অনুসারে প্রতি টেবিলে দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত চেয়ার। দূর প্রান্তে দরজা দিয়ে মোমবাতির আলোয় আলোকিত ডাইনিং রূম দেখা যাচ্ছে, ওয়েটাররা গাঢ় নীল ওয়েস্টকোট পরা। দুই কি তিনটে দম্পতিকে মেন্যু পড়তে দেখা গেল।

গদি মোড়া টুলে বসে বারটেন্ডারকে ডাকল রানা, একটা বিয়ার চাইল। ওর আশপাশের লোকজনদের বেশভূষা বিচিত্রই বলতে হবে। খুব কম পুরুষই ডিনার জ্যাকেট পরেছে। ঝুলে থাকা হেডড্রেসসহ সাদা আলখেল্লা পরা লোকেরাই সংখ্যায় বেশি। ফেজ টুপি পরা কয়েকজনকে মনে হলো তুর্কী। আরবি বা ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে কাপড়চোপড় পরলে তাকে মুসলমান বলে ধরে নেয়াটা অন্তত ল্যাক্সর সহ মিশরের বেশ কয়েকটা শহরে ভুল প্রমাণিত হবে। এ-ধরনের পোশাক ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও পরে, তাদের মধ্যে অনারবদের সংখ্যাও কম নয়। স্থানীয় প্রায় সবাই খুদে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময় হাত নাড়ছে অনবরত। তবে তাদের সঙ্গিনীরা প্রায় সবাই বোরকা পরা ও চুপচাপ। তাদের শুধু চোখ দেখা যায়, যদিও সেই চোখের দৃষ্টি বড় বেশি চঞ্চল–মাঝেমধ্যে ধারাল কাটারি, আবার কখনও গোপন মাধুরী। মিশরীয়ই, তবে জিনস ও শার্ট পরা মেয়েরাও আছে–খিলখিল করে হাসছে, পা দোলাচ্ছে, নানান অঙ্গভঙ্গি করে পুরুষ সঙ্গীদের মনোরঞ্জন করছে কে কি ভাবল পরোয়া না করেই।

তবে এখানে তুমি মিশরীয় নারী নিয়ে গবেষণা করতে আসোনি, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। তোমার হাতে কাজ রয়েছে। বিয়ারে চুমুক না দিয়ে বারটেন্ডারের চোখে পড়ার জন্যে গ্লাসটা উঁচু করে ধরল ও। আর ঠিক তখনই দেখতে পেল মেয়েটিকে। প্রতিচ্ছবি; বার-এর পিছনের লম্বা আয়নায়। এ হলো সেই সন-এই লুমিয়েয়ারে দেখা পরমাসুন্দরী। যে মেয়ে নাক গলানোয় মাত্র দু'দিন আগে ওর জীবন রক্ষা পায়। কামরায় সে ঢুকছে পাল তোলা বোটের মত তরতর করে। আরও যেন সুন্দর লাগছে আজ তাকে। পরীই, শুধু ডানা নেই বলে উড়তে পারছে না। তার ড্রেসটা যেন চকচকে অথচ ক্যালো ও নমনীয় খড় দিয়ে বোনা, এত লম্বা যে পিছনে লুটাচ্ছে, অপর প্রান্তটা উঠে এসে থেমেছে তার সরু কাঁধের সুদৃশ্য রেখার ঠিক নিচে। স্তনযুগল গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কোমল রেশমি চুল কালো জলপ্রপাতের মত মাথার দু'পাশ থেকে নেমে এসে নিতম্বে পড়েছে। তেল, শ্যাম্পূ, এমনকি কোন ক্লিপও ব্যবহার করা হয়নি বলে মনে হলো। মুখটা স্রেফ জাদু, এবারই প্রথম ভাল করে দেখার সুযোগ পেল রানা। চোখ জোড়া বাঁকা ও গাঢ় ভুরুর নিচে সাজানো একজোড়া গাঢ় নীল আয়ত আয়না, প্রায় বেগুনি। সরু নাক, সন্দেহ জাগে একটু ঢালু। মুখ একই সঙ্গে কঠিন ও কোমল; যৌনাবেদন যেমন আছে, তেমনি আছে আঘাত করার ঝোঁক। দৃঢ় প্রত্যয় আর স্বাধীনচেতা ভাবটাই বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছে উঁচু হয়ে থাকা চোয়ালের হাড় আর কিনারা। হাঁটার ধরন বলে দিচ্ছে উদ্দেশ্য বা কাজ ছাড়া সে নড়ে না। নিজেকে নিয়ে গর্বিত, তবে সচেতনভাবে নয়; চলন দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক এখানে সে একজন শত্রুকে পরাজয় স্বীকার করাতে এসেছে। চ্যাপ্টা, কালো ব্যাগটা অস্ত্রের মত করে ধরে আছে।

অকস্মাৎ জেগে ওঠা বিষণ্ন একটা ভাব বুকে নিয়ে রানা ভাবল, অনেকদিন আগে ভালবেসে ফেলেছিল এমন এক মেয়ের

সঙ্গে এর অনেক কিছুই মেলে। পরমুহূর্তে নিজেকে সতর্ক করে দিল ও। সাবধান! এই মেয়ে ওর প্রতিপক্ষ। ভেতরে কোথায় কি ঘটছে ওর জানা নেই, কিন্তু চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা ওর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছে না। এই মেয়ে যতই সুন্দর হোক, চীনা। কাজেই, যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে যে সে শত্রু নয়, ততক্ষণ কড়া পাহারায় রাখতে হবে নিজেকে। চীনা যখন, ধরে নিতে হবে সে-ও চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট। এখানে নিশ্চয়ই গ্রীক প্রেমের দেবতা এরস তাকে ডেকে আনেনি, ডেকে এনেছে শয়তানের দ্বারা সম্মোহিত সেই দেবতা যে স্পাই আর ডাবল এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ করে। হুশিয়ার!

মনের পরামর্শ মেনে নিয়ে সামনে থেকে বারটেন্ডারকে বিদায় করে দিল রানা, হড়কে টুল থেকে নেমে তিন পা ফেলে পৌঁছে গেল মেয়েটার পাশে। 'গুড ইভিনিং। সত্যি দারুণ একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম।'

'মেজর মাসুদ রানা।' ঔদার্য দেখিয়ে হাসতে কার্পণ্য করল না মেয়েটা; সে হাসি যদি অকৃত্রিম না-ও হয়, তাতে মুগ্ধ হবার উপাদান যথেষ্টই আছে।

'আবারও আপনি অবাক করলেন আমাকে। অনুমতি দেন তো আপনার জন্যে অর্ডার দিই।'

কোমল ও মায়া ভরা, অথচ একই সঙ্গে নিষ্ঠুর একটা মুখ; খুঁটিয়ে দেখছে নিনা সুসমি, সেইসঙ্গে দেঁজা ভ্যু-র শিকার–যেন এই দৃশ্য ও ঘটনা তার জীবনে আরেকবার ঘটেছে। সত্যি কি মাত্র দু'দিন থেকে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের সামরিক শাখার এশিয়ান ডেস্ক থেকে পাঠানো ফাইলে এই লোকের ফটো দেখছে সে? ওর সঙ্গে বার-এর দিকে যেতে নিজেকে রাজি করিয়ে বুঝতে পারল এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে কেন ওকে গোটা বিশ্বে একই সঙ্গে ভয় ও শ্রদ্ধা করা হয়। ওর শরীর নড়ে না বরং যেন বয়ে যায় মাপা এক ছন্দে ফেলা পদক্ষেপে। ও যেন একটা প্যান্থার বা অন্য

কোন প্রাণী, যে কিনা গতি ও গোপনীয়তার মধ্যে বেঁচে থাকে; মৃত্যু আর জীবন ওর খেলা ও ব্যবসা, দুটোই।

'আমি বলি আমাদের এই সাক্ষাৎ উৎসব হয়ে উঠতে পারে, আপনার কি অভিমত?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে সবচেয়ে দামী শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল রানা। সুসমি অনুভব করল, ওর ঠাণ্ডা চোখ তার শারীরিক ঐশ্বর্য মাপজোক করছে। 'সবাই জানে, তারপরও না বললে যেন অবিচার করা হয়–আপনি দেখতে ভারী সুন্দর। ইলেকট্রিফাইং আরও উপযুক্ত শব্দ।'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গ্লাসটা ধরল সুসমি। 'দুঃখিত। আমার সৌন্দর্যকে ওভাবে ব্যবহার করার কথা আমি কখনও চিন্তাও করি না।'

শুকনো একটু হেসে নিজের গ্লাসটা একটু উঁচু করল রানা। 'মানবজাতির কল্যাণে।' দু'জনেই জানে যে গোটা ব্যাপারটাই অভিনয়। রানার মাথার ভেতর প্রবল ঝড় বইছে। মেয়েটা এখানে কি করছে? ওকে কি অনুসরণ করা হয়েছে? ওকে যদি এখনও তাদের দরকার, কায়রোয় কেন ধরতে চেষ্টা করেনি? সেখানেই তো সহজ হত কাজটা। মেয়েটার উপস্থিতিতে স্বস্তি ও আশার ক্ষীণ একটু রেশ বোধহয় আছে। চিঅপস্ পিরামিডের কাছে ওর পকেট থেকে বিন আক্কাসের ডায়েরীটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেয়েটা যদি মোহাব্বত গামা সূত্রের পিছু নিয়ে এখানে এসে থাকে, তাহলে সূত্রটা নিশ্চয়ই ভুয়া না হবারই বেশি সম্ভাবনা। এর আরও একটা মানে হলো, মোহাব্বত গামার আয়ু বিন আক্কাসের চেয়ে সামান্য একটু বেশি। লোকটাকে ওর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে। তার আগে...আচ্ছা, মেয়েটা কি একা এসেছে?

গ্লাস নামিয়ে বিপজ্জনক গভীর নীল চোখে তাকাল রানা। 'বয়ফ্রেন্ডরা না থাকায় নিশ্চয়ই আপনি নিঃসঙ্গ বোধ করছেন?'

'শূন্যস্থান পূরণ করা কোন ব্যাপার নয়।'

আবার চেষ্টা করল রানা। 'কেমন কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না, আজ রাতে দু'জনেই আমরা ডিং ডং ক্লাবে সময় কাটাতে এসেছি।'

'জীবন এরকম অদ্ভুত ঘটনারই সমষ্টি, মেজর রানা।'

এবার রানা সরাসরি জানতে চাইল। 'কে আপনি? আমার সম্পর্কে কোত্থেকে জানলেন?'

সুসমি মাথাটা পিছন দিকে দ্রুত ঝুলিয়ে দিল, আবার প্রায় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সম্মোহিত হয়ে পড়ল রানা। মেয়েটার চোয়ালের স্পষ্ট ও দৃঢ় রেখা যেন তার মানসিকতাই প্রকাশ করছে–সংকল্পে অটল। 'আমি নিনা সুসমি। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস থেকে আমাকে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হয়েছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন দেশের খুনীদের তালিকা আছে।'

'তারা অনেকে হয়তো আপনাদের হয়েও কাজ করে,' বলল রানা। 'তবে এটা আসলে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়।'

'প্রাসঙ্গিক বিষয় কোন্‌টা জানার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, মেজর রানা।' সুসমি হাসছে না।

'আমার ধারণা, আমাদের কাজের ধরন প্রায় একই, আমরা দু'জন সম্ভবত একটা জিনিসের পিছনেই ছুটছি। ব্যাপারটা খুব একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে, তাই বলছিলাম আপনার যদি সময় হয়...'

রানা কি বলতে চায় বুঝতে পেরে অকস্মাৎ বিষধর নাগিনীর মতই ফুঁসে উঠল সুসমি, এই মুহূর্তে তার চেহারায় কোন যৌনাবেদন নেই। চোখ জোড়া থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তার এই আকস্মিক ও মাত্রা ছাড়ানো ক্রোধ রীতিমত হকচকিয়ে দিল রানাকে। 'সাবধান! আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কোন রকম বাজে ইঙ্গিত করবেন না!'

'না-না!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি আপত্তিকর কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এ আপনার ভুল ধারণা। তবু দুঃখিত। বরং

কাজের প্রসঙ্গেই একটা প্রশ্ন করি। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের লিউ ফু-চুং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু...'

'অপারেশন্যাল চীফ, এবং আমার ইমেডিয়েট বস্-ছিলেন। হঠাৎ তার প্রসঙ্গ কেন?'

'লিউ জানে, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস জানে, এখানে আপনারা আমার সঙ্গে বারবার কি জঘন্য আচরণ করছেন?'

'জানলে বা না জানলে কি আসে যায়?' তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সুরে পালটা প্রশ্ন করল সুসমি। 'আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, কাজেই তারাও নিশ্চয়ই চান যে-কোন মূল্যে দায়িত্বটাই আমি প্রথমে পালন করি। তাছাড়া, আপনাকে তো বললামই, আমাকে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হয়েছে। আর কোন প্রশ্ন, মেজর রানা?'

'আর মাত্র একটা। আপনি বা আপনারা জানেন তো যে চীন বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র?'

সুসমি তিক্ত হেসে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করেন, এসপিওনাজ জগতে কেউ কারও বন্ধু হয়? আমার তো ধারণা, অভিজ্ঞতাও, বন্ধুরাই সুযোগ পেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।'

হাতঘড়ি রোলেক্সে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। সাতটা বেজে দশ। 'আপনার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া বা বিরোধ নেই, আপাতত বলার কথা শুধু এটুকুই।' টুল ছেড়ে সিধে হলো, বারের ওপর কিছু মিশরীয় পাউন্ড রেখে তাকাল সুসমির দিকে। 'মাফ করতে হবে, আমার কাজ আছে। আপনার সঙ্গে আনঅফিশিয়ালি দেখা হওয়ায় সত্যি আমি আনন্দ পেলাম।'

'আনন্দটা একা শুধুই আপনার,' বলল সুসমি, রানার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানোর প্রতিদান দিল না, বরং ওকে চলে যেতে দেখে রাগ হয়ে জমে থাকা গরম নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল-যে-কেউ দেখলে মনে করবে হাঁপাচ্ছে। সে ভাবছে-কি ভয়ংকর এক লোক! নির্দয় খুনী! পিশাচ! প্রতিটি কথায় বিদ্রূপ। বেশি স্মার্ট।

কিন্তু, অথচ…? নিজেকে সুসমি জিজ্ঞেস করল, তার প্রতিক্রিয়া মাত্রা ছাড়াচ্ছে না তো? নিজের ভেতর নিন্দনীয় পদার্থ যা আছে তার কল্যাণে লোকটাকে আকর্ষণীয় লাগছে না কি? লোকটার ভেতর কি সেই একই অতল গভীরতা আর বিপদের আভাস নেই যেগুলো তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাওজি হুতাও-এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল? মনে রানার সঙ্গে প্রেমিকের তুলনা চলে আসায় অপরাধ বোধ করল সুসমি, গরম ও লালচে হয়ে উঠল মুখ। নিজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সে শুধু একটা জরুরী অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে আসেনি, ব্যক্তিগত একটা বদলাও তাকে নিতে হবে।

মন খারাপ করে বসে থাকল সুসমি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি, অথচ এরইমধ্যে দু'দু'জন সহকারীকে তার হারাতে হয়েছে। বেইজিংকে এর ব্যাখ্যা দিতে জান বেরিয়ে যাবে তার। এখনও মাইক্রোফিল্মটা সংগ্রহ করতে না পারাটা অবশ্যই তার অযোগ্যতা হিসেবে দেখা হবে। আজ রাতটাই তার শেষ সুযোগ।

ডাইনিংরুমে ঢুকল রানা, মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। গোটা ব্যাপারটা শান্ত ভাবে ও যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। ওই শালী মেয়েটা! বুদ্ধি-বিবেচনা কেড়ে নেয়ার মত এত রূপ তার হলো কেন? চীনারা এই জিনিস পেলই বা কোত্থেকে? জঙ্গলের ভেতর গোপন কোন ফ্যাক্টরিতে বানাচ্ছে না তো? বিশ্বাস হয়ঁ চীনা কোন মেয়ে ব্রিটিশদের মত নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারছে? আর শালার ওই ড্রেসটা! বাজি ধরে বলা যায় যে লোক ওটা বানিয়ে দিয়েছে রোজ রাতে সুসমিকে স্বপ্ন দেখে সে। আহ্, শালীর নামটাও কেমন রসে টইটুম্বুর আর সেক্সি-সেক্সি।

'ইয়েস, সার?' ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হেড ওয়েটার।

'আমি কোন টেবিল চাইছি না। তোমাদের একজন মেম্বারকে খুঁজছি। ভদ্রলোকের নাম মোহাব্বত গামা।'

হেড ওয়েটারের দুটো ভুরুই কপালে উঠে গেল। 'সার, মিস্টার মোহাব্বত গামাই তো এই ডিং ডং ক্লাবের মালিক। আপনি সম্ভবত এখন তাঁকে প্রাইভেট গেইমিংরুমে পাবেন।'

অ্যাড্রেনালিন পাম্প হচ্ছে, অনুভব করল রানা। এবার বোধহয় কোথাও পৌঁছানো যাবে। পাশের একটা দরজা দিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো, হেড ওয়েটারের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। এদিকের করিডর নির্জন, কার্পেটে পায়ের গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে। দালানটা নিশ্চয়ই ইংরেজি L অক্ষরের আদলে তৈরি করা হয়েছে। ডান দিকে, খোলা একটা দরজার ভেতর, রুলেত হুইলের পরিচিত আকৃতি দেখতে পেল, তবে কামরাটায় কোন আলো নেই। এর মানে, ধরে নিতে হবে, ডিনারের আগে খেলা শুরু হয় না। বাম দিকের একটা কামরা থেকে বিলিয়ার্ড বলের ঠকাস-ঠকাস আওয়াজ ভেসে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে আবার পিছনে তাকাল। করিডরে একা ও। দরজায় নক করল, আস্তে করে, তারপর হাতলটা ঘোরাল।

রানার দিকে পিছন ফিরে একটা শট নেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে এক লোক। ঢিলে-ঢালা সান্ধ্য পোশাক পরা তিন মিশরীয় সুন্দরী কামরার ভেতর ঘোরাফেরা করছে। ফটোগ্রাফারের জন্যে অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত মডেলদের মত লাগছে ওদেরকে। রানার আগমন ওদের প্রত্যাশা এতই বাড়িয়ে দিল যে বাতাস শুঁকে দেখছে টাকার গন্ধ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু যখন দেখল নেই, আবার তাদের চেহারায় হতাশ ও ক্লান্ত ভাবটা ফিরে এলো। প্রথম মেয়েটা একটা জ্বলন্ত চুরুট ধরে আছে, দ্বিতীয়জন ধরে আছে কিউ চক, কিন্তু তৃতীয় মেয়েটার কাছে এমন কিছু নেই যা নিয়ে মজা করবে। কামরার বাতাস চুরুটের ধোঁয়া ও গন্ধে ভারী হয়ে আছে। লোকটা শট না মারা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকল রানা, তারপর খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'মিস্টার গামা?'

লোকটা রানার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে শান্ত পায়ে

টেবিলটা ঘুরে এসে একটা মেয়ের হাত থেকে চক নিল। প্যাড লাগানো জ্যাকেট পরে আছে, বেঁটে ও মোটা আঙুলগুলোয় ঝলমল করছে হীরে। এরকম কদর্য, বেঢপ হাতে অলঙ্কার আসলে মানায় না। লোকটার নামের সঙ্গে গায়ে-গতরের মিল নেই—মুখটা লম্বাটে, চোখ সরু, নাক বোঁচা, কপালে কাটাকুটির দাগ। তবে সব মিলিয়ে চেহারায় কর্তৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য আছে। কিংবা ওটা হয়তো শুধু গোঁয়ার্তুমির ভাব। তবে লোকটা যে নিষ্ঠুর তাতে রানার কোন সন্দেহ নেই। 'কে তাঁকে চান?'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে চকটা ফিরিয়ে দিল লোকটা, তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কিউটা দ্রুত পিছিয়ে এলো, পরক্ষণে সামনে বাড়ল। শটটা কঠিন। লোকটা ব্যর্থ হলো।

'আমার নাম রানা। মাসুদ রানা।'

লোকটা চুরুট নিয়ে টানছে, এখনও রানার দিকে একবারও তাকায়নি। 'তো এই নামের বিশেষ কোন তাৎপর্য?' গলায় তিরস্কার বা অবজ্ঞা, আরেকটা শট নেয়ার জন্যে তৈরি হলো সে। মেয়েদের চোখে-মুখে সামান্য হলেও অসন্তোষের ছায়া ফুটল।

'আপনার সঙ্গে বিন আক্কাসের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতায় ধারাল একটা উত্তেজনা দেখা দিল। শট নেয়ার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে সিধে হলো মোহাব্বত গামা। ঘুরল সে, এই প্রথমবারের মত সোজা রানার চোখে তাকাল। মনে হলো মাংস আর হাড় সরিয়ে ওর মাথার ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করছে লোকটা। 'তো?' আওয়াজটা পিস্তলের গুলি।

'কিছুদিন তাকে আর আপনি দেখবেন না।'

'কি বলতে চাইছেন?' কিউ-এর চারপাশে গামার হাত লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল।

'সে মারা গেছে।'

মেয়েগুলোর দিকে ফিরে দরজা লক্ষ্য করে মাথা ঝাঁকাল গামা। চক ও চুরুট রেখে লাইন ধরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল

তারা। 'এই খবর আমাকে জানানোর পিছনে আপনার উদ্দেশ্য?'

'উদ্দেশ্য আপনি যদি কিছু বিক্রি করতে চান তো আমি সেটা কিনব।'

'কিনব তো আমিও।'

বন করে আধ পাক ঘুরে রানা দেখল ওর পিছনে নিনা সুসমি দাঁড়িয়ে। এ স্রেফ এক সর্বনাশী! ওর জন্যে একটা কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। যেখানেই যাচ্ছে ও, ছায়ার মত লেগে থাকছে সঙ্গে। সে কি একা এসেছে, নাকি দরজার বাইরে দু'একজন সঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে?

পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল গামা। 'বেশ, বেশ। দারুণ, ইন্টারেস্টিং। বোঝাই যাচ্ছে আপনারা দু'জন একসঙ্গে নন। আমার মনে হচ্ছে, এরকম একটা পরিস্থিতিতে কোনও ধরনের নিলাম অনুষ্ঠানই বিধিসম্মত হবে।' চেহারায় এবার গোয়ার্তুমির ভাবটা প্রকট হয়ে উঠল। একমুহূর্ত পরই হয়তো আবার সে বিলিয়ার্ড খেলায় মন দেবে। 'ভাবছি, দর হাঁকায় আপনি কি ভদ্রমহিলার সঙ্গে পেরে উঠবেন, মিস্টার রানা?'

নিজের কৌতুক উপভোগ করছে মোহাব্বত গামা, এই সময় দরজাটা খুলে গেল। অ্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে ভেবে শক্ত হলো রানা। তবে না, শকুনের মত চেহারা নিয়ে লোকটা ক্লাবের একজন কর্মচারী। রানা ও সুসমিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে তারপর মনিবের দিকে ফিরল সে। 'হুজুর, আপনার ফোন! খুব নাকি জরুরী!'

গামার চোখে-মুখে বিরক্তি। 'এই গাধা, কলটা এখানে ট্র্যান্সফার করতে পারো না?'

'হুজুর, তা সম্ভব নয়। কলটা বাইরের লাইন থেকে টেলিফোন রুমে এসেছে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা ও সুসমির দিকে তাকাল গামা। 'এই বিরতি বোধহয় দরকার ছিল আপনাদের। আলোচনা

করার সুযোগ পাবেন কে কত টাকা দিয়ে ডাক শুরু করবেন।'

রানা ও সুসমি পরস্পরকে আরেকবার দেখে নিল।

গামা হাসল। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। নিলামে তোলার মত সত্যি একটা কিছু আছে আমার কাছে।' ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটা মেটাল ক্যানিস্টার বের করে দেখাল ওদেরকে। 'এর ভেতর রেখেছি সেটা। হৃদয়ের কাছাকাছি। জ্যাকেট একটু খুলে বাম বগলের নিচে হোলস্টারে ভরা ব্রাউনিং পিস্তলটাও দেখাল।' পরিষ্কার, ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে, পালা করে দু'জনের ওপর চোখ রেখে ক্যানিস্টারটা পকেটে রেখে দিল। বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবল রানা, তবে চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। গামা একা হলে ওর জেতার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শকুনসদৃশ কর্মচারী সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার বগলের নিচে পরিচিত ফোলা ভাবটা নিশ্চয়ই টিউমারের আভাস দিচ্ছে না। বিনয়ের একটা ভাব প্রকাশ করে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গামা, পিছু নিয়ে শকুনটাও। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

রানা ঘুরল, মুখ তুলে তাকাতে দেখল সুসমির নীল চোখে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। 'এবার বলুন আমাকে। আসলে ঘটছেটা কি?'

মোহাব্বত গামা দ্রুত পায়ে টেলিফোন-রুমের দিকে যাবার পথে দুই হাত এক করে ঘষছে না ঠিকই, তবে এই মুহূর্তে যে কেউ তাকে দেখলে বলে দিতে পারবে যে নিজেকে নিয়ে ভারি খুশি সে। খুশি হবে না-ই বা কেন? ব্যবসা করার জন্যে দু'জন ধনী খদ্দের সশরীরে হাজির হয়েছে; দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পণ্যের দাম শুধু বাড়াতেই পারে। দু'জনের মধ্যে বিন আক্কাসকে যে-ই সরিয়ে দিয়ে থাকুক, তার মস্ত উপকার করেছে সে, কারণ আগে হোক বা পরে এই সরাবার কাজটা তাকেই করতে হত। এ শুধু টাকার প্রশ্ন নয়। তার জন্যে এতে আরও তাৎপর্য বা নানা রকম লাভ আছে।

এখন নিশ্চিত হওয়া গেল কবীর চৌধুরী তাকে দায়ী করার বা ধরার কোন সূত্রই খুঁজে পাবে না। প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে চেহারা বদলে সে যখন বসবাসের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবে, যাবার সময় অবশ্যই পিছনে এমন কাউকে রেখে যাবে না যে তার সঙ্গে বেঈমানী করার ক্ষমতা রাখে। এমন কি যে বিপুল ধন-সম্পদ হাতে আসতে যাচ্ছে সে-সবের প্রকৃত উৎস, কবীর চৌধুরীর সুন্দরী অথচ বিশ্বাসঘাতিনী সেক্রেটারি মেয়েটা, সে-ও বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছে হঠাৎ পুরানো মনিবকে ছেড়ে তার সঙ্গে প্লেনে ওঠার আগেই। মুখে গম্ভীর হাসি, টেলিফোন-রূমের দরজা ঠেলে খুলে ফেলল গামা।

খাকি ওভারঅল পরা একজন মেকানিক দরজার দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসে আছে। টুলস্ ভরা টিনের একটা বাক্স দেখতে পেল গামা। বুদের দিকে এগোচ্ছে সে, সেটার ভেতর টেলিফোনের রিসিভার ঝুলছে। ঠিক লোকটাকে পাশ কাটানোর সময় হঠাৎ ঘরটা খুব ঠাণ্ডা লাগল তার। সে যেন একটা রিফ্রিজারেটারে ঢুকল। তবে ঠাণ্ডাটা বাতাসে নয়। সেটা তার ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়া বিপদের পূর্বাভাসে। থেমে ঘুরতে গেল, হাত ঢুকে যাচ্ছে জ্যাকেটের ভেতরে। কিন্তু না হলো ঘোরা, না ছুঁতে পারল পিস্তল। বিরাট আকারের আঙুল তার ঘাড়ের পিছনটা আঁকড়ে ধরল, তারপর ঠেলে নিয়ে চলল, যতক্ষণ না দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষে থেঁতলে গেল মুখটা। গামা অনুভব করল তার নাক ভেঙে গেছে, কপালের হাড় ফেটে গেছে, সামনের কটা দাঁতও মাঢ়ীতে নেই, মুখের ভেতরটা রক্তে ভর্তি। এরপরও হাতটা তাকে ছাড়ছে না, বরং আরেক হাতের সাহায্যে এমন মোচড়াল যেন ঘাড় থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যাবে মাথাটা। বেঢপ ও প্রকাণ্ড, বোকা বোকা ও মাংসল মুখ মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। রোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসা ঘাম ফোঁটা হয়ে চকচক করছে। শুয়োরের মত ছোট চোখ জোড়ায় অশুভ ঝিলিক। মোহাব্বত গামা চিৎকার করতে

চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। তাকে ধাক্কা দিয়ে এক কোণে ফেলে দিল জানোয়ার, তারপর দাঁত বের করল।

নয়

নিষ্পলক ও ঠাণ্ডা একজোড়া গাঢ় নীল চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে রানা। মেয়েটা কি সত্যি কথা বলছে? ট্র্যাকিং সিস্টেম-এর মালিক চীন নয়। বাংলাদেশের মত ব্যবসা করার ওই একই প্রস্তাবে তারাও সাড়া দিতে এসেছে। এই প্রস্তাব কার তরফ থেকে দেয়া হয়েছে সে-সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নেই। তবে কোন রুশ ডিফেক্টর যে এর সঙ্গে জড়িত নয়, এটা তারা জানে।

সুসমির এ-সব কথা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন তারা ধরে নিয়েছিল বিন আক্কাসকে রানা খুন করেছে। আর ডিফেক্টর রুশ বা চীনা নয়, এ তো রানার জানাই আছে। ডিফেক্টর যে-ই হোক, সে কবীর চৌধুরীর লোক–এর স্বপক্ষে নিরেট কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও এটাই সত্যি বলে ধরে নিতে হবে। দুনিয়ায় যত জীবিত বিজ্ঞানী আছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সেই পাগল, শুধু তার পক্ষেই সম্ভব যুগান্তকারী কিছু একটা আবিষ্কার করে নিজের বেয়াড়া খেয়াল-খুশিমত সেটাকে ব্যবহার করতে চাওয়া–তা-ও মানবকল্যাণের নামে। এরকম একটা মহামূল্যবান আবিষ্কার কেউ যদি চুরি করে পালায়, কবীর চৌধুরীর মত বিকৃত

মস্তিষ্কের একজন মানুষ সেটা ফেরত পাবার জন্যে কতটুকু নির্দয় হবে তার প্রমাণ এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছে রানা। চকচকে দাঁত নিয়ে অতিকায় সেই লোকটা—কে সে? কবীর চৌধুরীর দেহরক্ষী? লোকটা আব্বাসকে খুন করেছে। তার তালিকায় এরপর কে? রানা হঠাৎ করে ভারি অস্বস্তিবোধ করছে। টেলিফোন ধরতে গিয়ে বড় বেশি দেরি করছে গামা।

সুসমির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কয়েক মিনিটের জন্যে মাফ করতে হবে। আমাকে বাদ দিয়ে কোন রকম নিগোসিয়েশনে যাবেন না।'

সুসমির সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টির সামনে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানা, মনে একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা। নীলনয়না মিশরীয় রূপসীরা দৃষ্টি আকর্ষণের কত চেষ্টাই না করল, কিন্তু তাদের দিকে ওর কোন মনোযোগ নেই। এন্ট্রাস-হল পেরিয়ে এসে টেলিফোন-রূমের দরজা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল ও। একটা জানালা খোলা, পর্দাটা বাতাসে নড়ছে। দুটো বুদ, তার মধ্যে একটা খোলা, তবে ভেতরে কেউ নেই। দ্বিতীয়টা বন্ধ, গায়ে লটকানো নোটিশ বোর্ডে আরবি ও ইংরেজিতে লেখা—'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আপাতত অচল'। দরজাটা খুলল রানা, উষ্ণ রক্তমাখা মাংসের স্তূপ ঢলে পড়ল ওর পায়ের সামনে। ফাঁক হয়ে থাকা ঘাড়ের পিছনটা দেখল, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবণতার সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। মৃত্যু বা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ওর জন্যে নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু এ স্রেফ পৈশাচিকতা, স্রেফ অশ্লীলতা। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা, লাশটা ওল্টাল। দ্রুত সার্চ করে নিশ্চিত হতে বেশি সময় লাগল না।

মাইক্রোফিল্ম আর ব্রাউনিংটা নেই।

খোলা জানালার সামনে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরেটা ভাল করে একবার দেখে নিল রানা, তারপর জানালার কার্নিস থেকে

জমিনের দূরত্ব আন্দাজ করল। ছ'ফুট। গরাদবিহীন জানালার কার্নিসে বসে নিচে লাফ দিল ও। নিচে পড়ে বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড। কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে না। ধীরে ধীরে সিধে হলো। চারদিকে অন্ধকার, তবে আকাশে চাঁদ না থাকলেও তারা আছে, তারই আলোয় একটু দূরে দামী গাড়িগুলো চক-চক করছে। সামনের এক ঝাঁক পাম গাছের দিকে এগোল ও। একটা গাছের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। লোকটা কি আবার বাতাসে মিলিয়ে গেছে? সে কি সত্যি কোন মানুষ? হঠাৎ একদিকে একটু আলোর আভাস পাওয়া গেল, রানা দেখল প্রকাণ্ড একটা কায়া ছোট একটা ট্রাকের ক্যাব-এ উঠছে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এলো। সেই সঙ্গে নিভে গেল আলোটাও।

রানা আগেই ছুটতে শুরু করেছে, অর্ধবৃত্তাকার একটা পথ ধরে পৌঁছে গেল ট্রাকটার পিছন দিকে ঠিক যখন স্টার্টার জ্যান্ত করে তুলেছে এঞ্জিনটাকে। ইস্, শুধু যদি পিস্তলটা থাকত সঙ্গে! একে তো অসুর, তার ওপর সশস্ত্র, খালি হাতে এর সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা নেহায়েতই নিবুদ্ধিতার কাজ হবে। কিন্তু উপায় কি?

এঞ্জিন স্টার্ট নিতে রাজি হচ্ছে না। রানাও ট্রাকের পিছনে পৌঁছে গেল। হাতল ধরে ঘোরাল ও। দরজার একটা কবাট খুলে গেল। লাফ দিল রানা, পড়ল এক গাদা কেইবল্, তার, পাইপ আর টুল বক্সের মাঝখানে। এবার, এতক্ষণে, স্টার্ট নিল এঞ্জিন, ট্রাক থর-থর করে কাঁপতে শুরু করল। দরজা বন্ধ করার পর দম আটকে অপেক্ষায় আছে রানা, ভাবছে এবার রওনা হবে।

এই সময় পিছনের দরজা খুলে গেল বাইরের দিকে। রানার হৃৎপিণ্ড এক লাফে যেন মুখে উঠে এলো। তারপর চিনতে পারল নিনা সুসমিকে, হামাগুড়ি দিয়ে ওর পাশে চলে আসছে।

সুসমি একা আসেনি। সঙ্গে সঙ্গী হিসেবে একটা বেরেটা .25-ও নিয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে সেটা রানার দু'চোখের ঠিক মাঝখানে তাক করা।

অস্ত্রটা একবার দেখে নিয়ে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে সুসমির দিকে তাকাল রানা। 'আমরা যদি এভাবে দেখা করতে থাকি, লোকজন নানা কথা বলে বেড়াবে না?'

অস্ত্রটা এবার রানার হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক করল সুসমি, কথা বলল ফিসফিস করে। 'গামার কি হয়েছে?'

'সে নেই।'

'আর মাইক্রোফিল্ম?'

ট্রাকের ক্যাব লক্ষ্য করে মাথাটা ঝাঁকাল রানা। সতর্কতার সঙ্গে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যাব-এর পিছনটা একবার দেখল সুসমি, তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে পেলব একটা হাত ঢুকিয়ে দিল ওর জ্যাকেটের পকেটে, ওর চোখে চোখ রেখে। রানার ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। 'অথচ আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনার ভেতর অনুভূতি বলে কিছু নেই।'

নিজের কাজে অবিচল, রানাকে ভাল করে সার্চ করছে সুসমি। 'মনে কোন ভুল ধারণা রাখবেন না, মেজর। যে-কোন মূল্যে মাইক্রোফিল্মটা আমি উদ্ধার করব–যে-কোন মূল্যে।'

'হুবহু আমার সেন্টিমেন্ট। সেজন্যেই তো এত কষ্ট করে একটা ট্রাকের পিছনে বসে আছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বেরেটার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'ওটা বরং আপনি সরিয়ে রাখুন। গুলি করে ওদেরকে আপনি জানাতে চান না যে এখানে আমরা লুকিয়ে আছি।'

ট্রাকের কেবিন বা ক্যাবে বসে দাঁত বের করে ধাতব হাসি হাসছে জানোয়ার, ড্যাশবোর্ডে সেট করা ছোট্ট স্পীকার থেকে ভেসে আসা রানা আর সুসমির কথাবার্তা শুনছে। গুরু, ওস্তাদোঁ কা ওস্তাদ, মহামান্য জাদুকর, প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী, নমস্য সমাজ-সংস্কারক, মহামান্য কবীর চৌধুরী তার প্রতি খুশি হবেন। নির্দেশ মোতাবেক দু'জন বেঈমানকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে

সে। আর এখন, বলা যায় বোনাসই, সংগঠনের জন্যে বিরক্তি ও সম্ভাব্য ঝামেলার দুই উৎসকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে। জানোয়ার তার কনুই দুটো দু'দিকে ছড়াল, তারপর হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রস্তুতি নিল লং ড্রাইভের।

জানোয়ারের আসল নাম তাহির আখতার। পাকিস্তানের পেশোয়ারে তার জন্ম। বাবা ছিল একটা সার্কাস পার্টির দর্শনীয় বস্তু—প্রকাণ্ড দেহ, গায়ে দানবীয় শক্তি, হাতির সঙ্গে টাগ-অভ-ওঅর প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রতিবারই জিতত। সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে অনুষ্ঠান করতে যায় সার্কাস পার্টি, ওখানকার জেলখানা থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত এক মহিলা কয়েদীর সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রেম হয়। মহিলার জেল হয়েছিল ডাকাতির অভিযোগে। তাদের বিয়ের ফসল তাহির আখতার। পরিচয় ও বিয়ে যেমন অতি দ্রুত ঘটে, দাম্পত্যকলহ ও বিচ্ছেদ ঘটতেও বেশি সময় লাগেনি। বালক আখতার মায়ের সঙ্গে আফগানিস্তানে থেকে যায়। স্কুল থেকেই তাকে নিয়ে সমস্যার শুরু। বয়স যখন মাত্র দশ, দেখে মনে হত স্বাস্থ্যবান তরুণ। সমবয়েসী ছেলেরা তার সঙ্গে ফুটবল খেলতে ভয় পেত, উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তাকে খেলতে নিলেও রোজই দু'একজনকে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হত। ফলে স্কুল জীবনে খেলাধুলোর বিশেষ সুযোগ পায়নি সে।

আঠারো বছর বয়সে রীতিমত পাহাড়সদৃশ পালোয়ান হয়ে উঠল তাহির আখতার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম সূত্রে পাওয়া গরম মেজাজ আর হিংস্র ভাব প্রকাশ পেতে শুরু করল। স্কুলে সঙ্গী খেলোয়াড়রা আহত হওয়ার পিছনে দায়ী ছিল তার প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি, কলেজের খেলোয়াড় সঙ্গীরাও আহত হতে শুরু করল একই কারণে—তবে তার শক্তি আরও অনেক বেড়ে যাওয়ায় সবাই শুধু আহত হলো না, তাদের একজন মাঠে এবং একজন হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মারা গেল। আখতার গ্রেফতার

হলেও, ঘটনাগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা হওয়ায় তার কোন শাস্তি হয়নি। তবে ফুটবল খেলার ওখানেই তার ইতি ঘটে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে মাঠে ঢুকতে নিষেধ করে দেয়। আর সেই থেকে শুরু হয় গুম খুন। প্রথমে নিখোঁজ হলেন কলেজের ফুটবল প্রশিক্ষক। তারপর ভাইস প্রিন্সিপাল। সবশেষে দু'জন ছাত্র। পুলিস একটা কেসেরও সমাধান করতে পারেনি, এমন কি এতগুলো লোকের লাশও তারা খুঁজে পায়নি।

এরপর আফগানিস্তানে শুরু হলো তালেবানদের তাণ্ডব। সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল আখতার। তাদের হাতে বন্দী হয় সে। কি কারণে বলা কঠিন, তালেবানদের লোহার রড আর রাইফেলের বাঁট তার মুখটাকেই বেশি পছন্দ করে। চোয়াল আর মাঢ়ী গুঁড়িয়ে পাউডার করে দেয়। মারা গেছে মনে করে তালেবানরা তাকে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যায়। মুমূর্ষু আখতার কিভাবে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে এলো তা সে-ই ভাল বলতে পারবে, তবে কোন সন্দেহ নেই যে আসুরিক শারীরিক শক্তিই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। নিজের অবস্থা কাহিল, তাসত্ত্বেও পালাবার পথে তিনজন তালেবান, দু'জন পাকিস্তানী সীমান্তরক্ষী ও দু'জন পাকিস্তানী আদিবাসীকে খুন করে সে—প্রথম তিনজন ধরতে আসায়, সীমান্তরক্ষীরা থামতে বলায় আর আদিবাসীরা তাকে দেখে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করায়।

পেশোয়ারে এসে নিজের বাবার খোঁজ পাবার চেষ্টা করে আখতার। খবর পায় বাবা প্রচুর সয়-সম্পত্তি রেখে মারা গেছে, তবে সে-সব ভোগ-দখল করছে সৎ-মা ও তার দুই ছেলেমেয়ে। অকারণে প্রথমে ছেলেমেয়ে দুটোকে, তারপর সৎ-মাকে খুন করে সে, তারপর নগদ টাকা আর সোনার গহনা-গাঁটি নিয়ে পালিয়ে আসে করাচীতে। শহরে পা দিয়ে প্রথমেই সে খোঁজ নিতে শুরু করে ভাল প্লাস্টিক সার্জেন ও ডেন্টিস্ট কোথায় পাওয়া যাবে।

চেম্বার সহ বাড়ি আছে ডাক্তারদের, করাচীর এরকম একটা এলাকায় ঘুর ঘুর করছিল আখতার, এই সময় তার পিছনে লোক জমা হতে শুরু করে। এটা নতুন কিছু নয়, তার আকার ও মুখের বীভৎস চেহারা দেখে মনে ঘৃণা জাগলেও মানুষ কি এক আকর্ষণে তার পিছু নেয়। তার দুর্ভাগ্য নাকি সৌভাগ্য বলা কঠিন, অভিজাত পাড়ায় লোকজনের এত ভিড় দেখে পুলিসও এসে পড়ে। পুলিস তাকে চিনতে পারলে অ্যারেস্ট করবে, এ-কথা আখতার জানত, তাই খাকি ইউনিফর্ম দেখেই খিচে দৌড় দেয় সে। পুলিসও পিছু নেয়, কিন্তু রক্ত-মাংসের এরকম একটা রেল এঞ্জিনের সঙ্গে তারা পারবে কেন।

ছোটবেলা থেকেই আখতারের বুদ্ধি একটু কম। দৌড়ে পুলিসের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া তার জন্যে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু তা না করে সে পাঁচিল টপকে ওই এলাকারই একটা বাড়ির বাগানে ঢুকে গোলাপ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

দু'ঘণ্টা পর বাগানের মালী তাকে দেখে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বাড়িটা সম্প্রতি একজন ডাক্তার ভাড়া নিয়েছেন, এখানেই তাঁর চেম্বার, তবে রোগী তিনি খুব কমই দেখেন। মালীর চিৎকারে তিনি, অর্থাৎ ছদ্মবেশী কবীর চৌধুরী বেরিয়ে আসে।

বেঢপ, বিকট, কুৎসিত, রোমহর্ষক আকার-আকৃতি কি কারণে কে জানে কবীর চৌধুরীকে সাংঘাতিক আগ্রহী করে তোলে। বাগানে ঢুকে আখতারকে দেখে তার চোখ-মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতূহলও জাগল—সেই মুহূর্তে তার দিকে একটা চোখ রেখে আখতার যে অজ্ঞান মালীকে গলা টিপে খুন করছে, এটা তার কাছে কোন গুরুত্বই পেল না।

আখতার মালীর নিষ্প্রাণ দেহ ছেড়ে সিধে হলো। হাবভাব দেখে মনে হলো, ঘুরে পাঁচিলের দিকে হাঁটা ধরবে, শুধু যেতে পারছে না কবীর চৌধুরীর চোখে-মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে অভয় ও প্রশ্রয়ের ভাব ফুটে রয়েছে দেখে।

'তোমার একটা কাহিনী আছে,' উর্দুতে বলল কবীর চৌধুরী। 'সেটা আমি শুনতে চাই। ভাল লাগলে তোমাকে আমি আমার কাজেও লাগাতে পারি। তুমি কি বলো?'

জবাবে কবীর চৌধুরীর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখ নামিয়ে লাশটা দেখল আখতার।

হেসে উঠে কবীর চৌধুরী বলল, 'ওটাকে তুমি একাই কবর দিতে পারবে। কাজটা সেরে গোসল করতে ভুলো না।' একটা হাত তুলে দেখাল। 'ওদিকের স্টোররুমে কোদাল পাবে, বাথরুমটাও ওদিকে। আমি তোমার জন্যে চেম্বারে অপেক্ষা করছি।'

ছদ্মবেশী কবীর চৌধুরী ওই সময় করাচীতে বসে তার কয়েকজন সহযোগী বিজ্ঞানীকে নিয়ে হিউম্যান ক্লোনিং-এর ওপর গোপনে গবেষণা করছিল। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন প্লাস্টিক সার্জেনও ছিল, নাম লুদভিগ শেফার্ড। জাতে জার্মান এই ডাক্তার এক নাৎসী ওঅর ক্রিমিন্যালের ছেলে, কবীর চৌধুরী তাকে আর্জেন্টিনা থেকে পাকিস্তানে ডেকে নেয়। এই বিকৃতরুচি শয়তান ডাক্তার আর্জেন্টিনায় থাকতে হিউম্যান-গিনিপিগদের ওপর নানা রকম ভয়ংকর ও নৃশংস এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে। সে একবার একটা মানুষের শরীরে অ্যালসেইশান কুকুরের মাথা জোড়া লাগিয়ে পরিবর্তিত প্রাণীটিকে তিন হপ্তা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। যৌনাঙ্গ প্রতিস্থাপন নিয়েও পরীক্ষা চালিয়েছে শেফার্ড—শুধু পশুর ওপর নয়, মানুষের ওপরও। যাই হোক, তাহির আখতারের দীর্ঘ জীবনকাহিনী শোনার পর তার সম্পর্কে কবীর চৌধুরীর আগ্রহ ও উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তাকে সে বলল: জীবনে তুই অনেক পাপ করেছিস, কিন্তু সে-সব পাপকর্মের পিছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তোর মত আমিও একজন পাপী, কিন্তু আমার সমস্ত পাপ মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে। এখন তুই আমার সঙ্গে থাকিস বা না থাকিস, পাপ তোকে

করতেই হবে। কারণ এতে তুই অভ্যস্ত হয়ে গেছিস। তবে, আমার সঙ্গে থেকে যে-সব পাপ করবি সেগুলো হবে পুণ্যেরই নামান্তর, কারণ আমাদের সাধনা একদিন সফল হবেই, এবং সেদিন পৃথিবীর বুক থেকে রোগ-শোক, জ্বরা-ব্যাধি, হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। দুনিয়াটাই তখন হবে স্বর্গ। আর যদি আমার কাছে না থাকিস, তোর পাপ হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ; সৃষ্টিকর্তা তোকে কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

কবীর চৌধুরীর কথা শুনে তার পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল আখতার, গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এলো, 'হুজুর, আপনিই আমার ঈশ্বর!'

'দূর পাগল!' বলে সস্নেহে তাকে দাঁড় করিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'শোন, আমি তোকে পাপের সাজা থেকে মুক্তি দিচ্ছি।'

'কিভাবে, হুজুর?' ভক্তিতে বুজে এলো আখতারের স্বর।

'তোর নাম বদলে দিয়ে। পাপ কার হয়?—মানুষের। আমি আজ থেকে তোর নাম রাখলাম জানোয়ার। ওদের কিছুতেই পাপ হয় না।'

এরপর সহকারী ও শিষ্য লুদভিগ শেফার্ডকে ডেকে আখতার ওরফে জানোয়ারকে তার হাতে তুলে দিল কবীর চৌধুরী।

ডাক্তার শেফার্ড কয়েক হপ্তা সময় ধরে জানোয়ারের চোয়াল ও মাঢ়ীর ওপর সব মিলিয়ে চোদ্দটা অপারেশন করল, টিস্যু গ্র্যাফটিং ও প্ল্যাটিনাম লাগানো স্টীল কমপোনেন্ট ইনসারশন-এর জন্যে। অবশেষে কৃত্রিম চোয়াল কাজের উপযোগী হলো। মাত্র একটা জিনিস বিসর্জন দিতে হয়েছে। নতুন চোয়াল তৈরি করার স্বার্থে জানোয়ারের ভোকাল কর্ড কেটে ফেলতে হয়। সে বোবা হয়ে যায়; ঠিক মাছের মত। তবে ভোকাল কর্ডের জায়গায় ইলেকট্রিক ইমপালস্ কনডাক্টর বসানো হয়েছে, ওটাই দু'সারি

ভীতিকর ও ক্ষুরের মত ধারাল ইস্পাতের দাঁত খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্ব পালন করে।

সকাল ছ'টায় একটা ঝাঁকি খেয়ে ট্রাক থামতে চোখ মেলে তাকাল রানা। সারা শরীর ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট, ওর বুকে হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে সুসমি। মেয়েটার কাঁধ দুটো সামান্য কুঁকড়ে আছে, যাতে রানার যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে শরীরের উষ্ণতাটুকু পেতে পারে। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে তার ঘুম ভাঙাল ও। অকস্মাৎ চোখ বড় বড় করে তাকাল, চমকে ওঠা বন্য প্রাণীর মত। মাথাটা ঘোরাল সে, বালিশ হিসেবে কি ব্যবহার করছে দেখতে পেয়ে দ্রুত সিধে হয়ে বসল।

ক্যাব-এর দরজা দড়াম করে বন্ধ হলো। উত্তেজনায় রানা টান টান, ট্রাকের পিছনটা কেউ খুললে লাফ দিতে দেরি করবে না। ওর পাশে বসে হাতব্যাগের সাইড পকেট থেকে বেরেটা বের করে দরজার দিকে তাক করল সুসমি। বেশ কিছু সেকেন্ড পার হলো। সাবধানে সামনে এগিয়ে দরজার একটা কবাট সিকি ইঞ্চি ফাঁক করল রানা।

তিন ফুট দূরে বালি আর পাথুরে পাঁচিল। কবাট আরও একটু ফাঁক করে অপেক্ষায় থাকল ও। কিছুই ঘটছে না। পাঁচিলটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু, ওপরে দাঁড়িয়ে আছে খোদাই করা একটা সিংহ, হাজার হাজার বছরের মরু ঝড় আর প্রচণ্ড রোদ তার কাঠামো ক্ষতবিক্ষত করেছে।

ট্রাকের পিছন থেকে নিঃশব্দে বালিতে নামল রানা। গুঁড়ি মেরে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঝুঁকে গাড়ির তলা দিয়ে সামনের দিকটা দেখার চেষ্টা করল। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে শুধু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। আকাশ ছোঁয়া স্তম্ভ, গায়ে নকশা কাটা খিলান, বিধ্বস্ত চৌরাস্তা, হেলে পড়া ফটক ও দরজা, বিজয়তোরণ, সারি সারি স্ফিংকস্, কালের আঁচড়ে ক্ষয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে প্রকাণ্ড আকারের স্ট্যাচু ইত্যাদি।

'কোথায় আমরা?' সুসমি ওর পাশে, দেখাদেখি সে-ও এইমাত্র সিধে হয়েছে।

'কি জানি। এটা প্রাচীন কোন শহর।' চারদিকে চোখ বুলাল রানা। চারদিকেই বালির বিস্তার দেখা যাচ্ছে। 'এখানে অপেক্ষা করুন।'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না সুসমি, তবে চোখে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। সাবধানে এগিয়ে খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা, কিন্তু ক্যাবেও কাউকে দেখতে পেল না। পিছিয়ে সুসমির পাশে ফিরে এলো। 'প্রথম কাজ লোকটাকে খুঁজে বের করা।' বেরেটার দিকে তাকাল। 'ওটা ঠিকমত ব্যবহার করতে জানেন তো?'

গম্ভীর সুরে জবাব দিল সুসমি। 'সময় হলেই দেখতে পাবেন।'

ওরে বদমাইশ, ওর সঙ্গে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক চাও না, চাও প্রেম করতে—নিজেকে শোনাল রানা। এমন ক'টা মেয়েকে তুমি চেনো, সারাটা রাত একটা ট্রাকের পিছনে বসে কাটানোর পরও সদ্য ফোটা গোলাপের মত এত তাজা আর সুন্দর লাগবে? 'ভুলো না, সম্বোধন পাল্টে ভারি গলায় বলল, নিজের অনুভূতির ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা। 'লোকটাকে যখন পাব, তখন যে-যার স্বার্থ দেখব আমরা।'

'রাজি—আমি আমার, তুমি তোমার,' মাথা উঁচু করে, চ্যালেঞ্জের সুরে বলল সুসমি।

'তুমি চাও আমি সামনে থাকি?'

সরু একহারা কাঠামোটার পাশ কাটানো মেনে নিল রানা, তার সুগঠিত গুরু নিতম্বে লাথি কষার প্রবণতাকে দমন করতে হলো। স্ফিংকস্ দিয়ে সাজানো চৌরাস্তা ঘুরে সাবধানে এগোবার সময় সদ্য ওঠা সূর্যের কচি প্রথম রোদ সরাসরি ওদের মুখে এসে লাগছে। উঁচু একটা পাঁচিল পড়ল সামনে, ভাঙা ফাঁক গলে

ভেতরের উঠানে বেরিয়ে এলো। এখানে দু'সারি পাথুরে স্তম্ভ খাড়া উঠে গেছে প্রায় ষাট ফুট। চারদিকে তাকিয়ে অস্বস্তিবোধ করল রানা। এখানে লুকিয়ে থাকার জায়গার কোন অভাব নেই। যদি কেউ থাকে, সব রকম সুবিধে সে বা তারাই শুধু পাবে। ওরা দু'জন পুরোপুরি অরক্ষিত এখানে।

খুনী দানবটা এখানে কেন এলো? সে কি কিছু খুঁজছে? নাকি কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?

স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিতে এক পিলার থেকে আরেক পিলারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে সুসমি। একটা মাছি ভন-ভন করছিল মুখের সামনে, হাত ঝাপটা দিয়ে সেটাকে তাড়াল রানা, বেঢপ ও বিদঘুটে আকৃতির পাথুরে স্তূপগুলোর ওপর সতর্ক চোখ বুলাচ্ছে। এই অংশটা নিশ্চয়ই কোন উপাসনালয়ের অংশ ছিল। অন্তত ভাঙা আসন-এর আভাস দেখে তাই মনে হয়।

এবার ওরা দ্বিতীয় একটা উঠানে ঢুকছে। এখানে মেরামতের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড পাথরে খোদাই করা হয়েছে কোন এক ফেরাউনের মুখ, পাথরটার গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত রাজমিস্ত্রীদের ভারা তৈরি করা হয়েছে। পাথর তোলার জন্যে পুলি আছে। ভারার প্রতিটি ফ্লোর বা স্তর গাঁথুনির ও খোদাইয়ের কাজ করার উপকরণে ভর্তি। কিন্তু শ্রমিকদের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। ফেরাউনের একটা হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে ওপরে তোলা, এবং ফাঁক করা দু'পায়ের মাঝখানে একটা টানেল।

টানেলটার দিকে তাকিয়ে ছিল, রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সুসমি। সামনে আঙুল তাক করে মৌন সম্মতি জানাল রানা, তারপর তার একটা হাত ধরে উঠানের পেরিমিটার ঘুরে এগোল। এই জায়গায় কিছু একটা আছে বোধহয়, তা না হলে ওর গা এরকম শিরশির করছে কেন? এ যেন কোন মোবাইল সার্কাস পার্টি বা যাত্রা দলের প্রপস্ রুম। এই উঠানে রোদ ঢুকতে পারছে না। গম্ভীরদর্শন ফেরাউন যেন মুঠো উঁচু করেছেন

পাঁচিলগুলোর বিরুদ্ধে, আরও কাছে আসতে নিষেধ করে দিচ্ছেন। নীল আকাশের গায়ে ফুটে থাকা প্রকাণ্ড পাথুরে মুঠোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে রানা, এত সকালেই কেমন গরম হয়ে উঠছে পরিবেশ। পাথরটা মনে হলো যেন কাঁপছে।

পরমুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল যেন নয়, সত্যি সত্যি কাঁপছে ওটা। শুধু কাঁপছে না, সামনের দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার দিয়ে সুসমিকে এক পাশে ঠেলে দিল ও, নিজে পিছনদিকে লাফিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলো। দু'টন গ্র্যানিট পাথর বাতাসে শিস তুলে দু'জনের মাঝখানে বালির ওপর আছড়ে পড়ল, পায়ের নিচে জমিন প্রবল একটা ঝাঁকি খেলো। শুকনো ঠোঁট জোড়া একবার চুষে ঢোক গিলল রানা, মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল। বাঁশের তৈরি ভারাটা এখনও কাঁপছে, ওটার সবচেয়ে উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অতিকায় দানব-জানোয়ার। গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, শুনে শুধু ভয়ই লাগল না, ঘৃণারও উদ্রেক হলো। পুলির হুক লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সে। মোটা রশিটা সপাং সপাং শব্দ করে তীরবেগে নেমে এলো জানোয়ারকে নিয়ে। প্রায় চোখের নিমেষে রানার সামনে পড়ল দানবটা, আগের চেয়েও জোরে ঝাঁকি খেলো জমিন।

আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো রানা, কিন্তু ভয়ে ওর শরীর কুঁকড়ে যেতে চাইছে। ভয়ংকর দাঁতগুলো ছাড়াও এই লোক মহা বিপদ। রানা নিজে প্রায় ছ'ফুট লম্বা, কিন্তু এই লোকের সমান হতে আরও পনেরো ইঞ্চি বাড়তে হবে ওকে। বাহু দুটো ভারোত্তলকদের পায়ের মত, ছড়ানো আঙুলগুলো একটা দাবা বোর্ডের তিন দিক ছুঁতে পারবে।

আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়ে রানাকে সামনের দিকে ঝুঁকতে দেখে মাথাটা পিছন দিকে সামান্য হেলিয়ে ঠোঁট জোড়া ধীরে ধীরে ফাঁক করল জানোয়ার। ভয়ালদর্শন, কুৎসিত, ধারাল, এবড়োখেবড়ো দাঁত দেখাবার পিছনে হিসেব করা উদ্দেশ্য হলো ভয় দেখানো।

রানা সাবধানে তাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। তাকাবার সময় বা সুযোগ নেই, ভাবছে বেরেটা নিয়ে সুসমি করছেটা কি? মেয়েটা কি অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না এই পিশাচের হাতে ও মারা না পড়ে?

ধীরে ধীরে উঁচু হলো ক্রেন-এর বাহুর মত জানোয়ারের একটা হাত, প্রকাণ্ড মুঠোর ভেতর আটকা পড়ল ব্লক অ্যান্ড ট্যাকল-এর ভারী মেটাল হুক। চোখ দুটো চকচক করতে দেখছে রানা। প্রকাণ্ড বাহু মোচড় ও ঝাঁকি খেলো, পুড়িয়ে ও পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেয়ার জন্যে কামারের নেহাই-এ স্তূপ করে রাখা প্রচুর লোহা ঝরে পড়তে শুরু করল। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল রানা, চাবুকের মত সপাং শব্দ করে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল রশিটা। ওর পিছনে একটা শব্দ হলো, ভাঙার উদ্দেশে ডিমোলিশন গ্যাঙ প্রকাণ্ড লোহার বল দিয়ে একটা দালানে আঘাত করার পর এরকম শব্দ শোনা যায়।

শব্দহীন হেসে সামনে লাফ দিল জানোয়ার। ঝপ করে নিচু হয়ে লোকটার বাড়ানো হাতের তলায় চলে এলো রানা, লক্ষ্যস্থির করল ভারী চোয়ালে। ঘুসিটা অত্যন্ত যুৎসই হলো, এত ভাল ঘুসি রানা এর আগে কাউকে মেরেছে কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা বুঝতে পারল লোকটার হাত দুটো যে-মুহূর্তে ওর শরীর থেকে নেমে গেল। তারপর ঘটল সংঘর্ষ। নিরেট মেটালের বিরুদ্ধে মাংস আর হাড়। এ অনেকটা ট্যাংকের গায়ে ঘুসি মারা। রানার ভয় হলো ওর হাতের গিঁটগুলো বোধহয় গুঁড়িয়ে গেছে। ব্যথাটা আগুন লাগার মত, হাত বেয়ে বাহুমূল পর্যন্ত উঠে এলো।

জানোয়ারের হাত দুটো লোহার বস্তার মত রানার দুই কাঁধে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে ভারার গায়ে ছিটকে পড়ল ও। খাড়া একটা লোহার রডের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথার পিছনটা। শিরদাঁড়া এমন ব্যথা করে উঠল, ওটাকে যেন ঠেলে পাঁজরের খাঁচার গায়ে চেপে ধরা হয়েছে। ফুসফুসে কোন বাতাস নেই। মরিয়া হয়ে হাত দুটো

তোলার চেষ্টা করছে, অনুভব করল বালির ওপর ঢলে পড়ছে শরীরটা।

দানবটাকে সামনে এগোতে দেখল ও।

মেঝেতে ঢলে পড়ল রানা। এখনও জ্ঞান আছে, তবে চোখ দুটো আপনা থেকে বুজে আসতে চাইছে।

ওর পাশে উবু হয়ে বসল জানোয়ার।

রানা ঝাপসা দেখছে চোখে। তবে ইস্পাতের ধারাল দাঁতগুলো ঠিকই চিনতে পারল। ওর মাথায় একটা হাত রাখল জানোয়ার। একটু চাপ দিলেই তার মুখের সামনে চলে আসবে রানার নগ্ন ঘাড়, মাথার পিছনটা। ওখানটায় কামড় বসানোর আগে নিজের প্রিয় অস্ত্র রানাকে দেখাচ্ছে সে। এ হাসি নয়, শুধুই দাঁত দেখানো।

তারপর রানার মাথায় চাপ দিল জানোয়ার।

'নোড়ো না! খবরদার, এক চুল নোড়ো না!'

স্থির হয়ে গেল জানোয়ার। রানার মাথা থেকে হাত নামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে যাচ্ছে, জানোয়ারের দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও তাকাল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে সুসমি, জানোয়ারের দিকে তাক করে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র এক চুল হেলছে না।

এক চুল নড়ছে না জানোয়ারও। সে সুসমির বেরেটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওটা যেন ক্ষতিকর কোন পোকা।

'মাইক্রোফিল্মটা। আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দাও!' শান্ত অথচ কঠিন সুরে নির্দেশ দিল সুসমি।

জানোয়ার নড়ল না। চোখ মিট মিট করল। চেহারার বোকা বোকা ভাব আরও স্পষ্ট এখন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে।

'তুমি চাও আমি তোমার লাশ সার্চ করে মাইক্রোফিল্মটা বের করি?' সুসমি জিজ্ঞেস করল। 'আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। যদি

চাই, তোমার কপালে টিপ পরিয়ে দিতে পারি এখুনি।'

এরপরও এক কি দু'সেকেন্ড ইতস্তত করল জানোয়ার। তারপর ধীরে ধীরে হাত ঢোকাল একটা পকেটে।

ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করতে চাইছে, সেই সঙ্গে বুক ভরে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিচ্ছে, রানা অনুভব করল ওর হাতের রক্তাক্ত গিঁটে মাছি চরছে।

পকেট থেকে হাত বের করে ছোট ক্যানিস্টারটা সুসমির পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল জানোয়ার। সুসমি ওটা তোলার জন্যে ঝুঁকল। সেই মুহূর্তে পা ছুঁড়ল জানোয়ার, সুসমির মুখে বালি ছিটাল। চোখে কিছু দেখছে না, তবু গুলি করল সুসমি।

গুলিটা লাগল না। আরেকটা লাথি চালাল জানোয়ার, সুসমির হাত থেকে পাখি হয়ে উড়াল দিল বেরেটা, পড়ল গিয়ে ভারার ওপর।

সেদিকে ডাইভ দিতে যাচ্ছে রানা, কিন্তু আবার ধরে ফেলল জানোয়ার, কাপড়ের একটা বস্তার মত ছুঁড়ে দিল ওকে লোহা-লক্কড়ের একটা স্তূপের দিকে।

স্তূপ থেকে গড়িয়ে বালিতে পড়ল রানা, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো, দেখল হাত দেড়েক লম্বা মোটা একটা পাইপ নিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে দৈত্যাকৃতি লোকটা। আবার তার গলা থেকে গা রি-রি করা ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এলো।

হাঁটার গতি না কমিয়েই পাইপটা রানার মাথায় চালাল জানোয়ার। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝট করে নামিয়ে নিতে পারায় খুলিটা চুরমার হওয়া থেকে রক্ষা পেল। তবে কোথাও যে লাগল না, তা নয়: কাঠের একটা মোটা কাণ্ড, আকাশ ছুঁয়েছে, কাজ করছে প্রকাণ্ড ভারার অবলম্বন হিসেবে–প্রায় ফুট খানেক স্থানচ্যুত হলো। ভারসাম্য হারিয়ে বালির ওপর পড়ে গেছে রানা, সিধে হবার চেষ্টায় কাত হলো। ওর মেরুদণ্ড দপ্‌দপ্ করছে, প্রতিটি সামান্যতম নড়াচড়া সারা শরীরে যেন ছুরি বেঁধাচ্ছে।

লোহার পাইপটা মাথার ওপর তুলে এগিয়ে আসছে জানোয়ার। হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিতে পারল রানা, অনুভব করল পিছু হটার পথ বন্ধ করে রেখেছে একটা পাঁচিল।

পালাবার কোন সুযোগ নেই। এখানে, এই মুহূর্তে মৃত্যু অনিবার্য। প্রবল স্রোতের মত সারা শরীরে আতংক ছড়িয়ে পড়ার অনুভূতি হলো রানার। নিজের দু'পাশে তাকাল, আশা যে-কোন ধরনের একটা অস্ত্র পেয়ে যাবে। না, নাগালের মধ্যে কিছুই নেই।

জানোয়ারের চোখ এখন গভীর মনোযোগী একজোড়া খুদে লেযার বীম। সে ঝুঁকে আছে শত্রুকে হত্যা করার তাগিদে ও প্রয়োজনে, এখানে কৌতুক করার কোন ব্যাপার নেই। খাড়া অথচ নড়বড়ে কাঠের অবলম্বনটা ভাল করে দেখে রানা উপলব্ধি করল বাঁচতে হলে ওটার সাহায্য নিতে হবে ওকে। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লাফ দিল ও। পা দুটো সামনে। জোড়া জুতো খাড়া কাণ্ডের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। কাত হয়ে গেল ওটা।

মড়মড় করে অদ্ভুত সব আওয়াজ হচ্ছে। শরীরটা গড়িয়ে দেয়ার পর এখনও রানা থামেনি, তাই বলতে পারবে না কিসের শব্দ ওগুলো, কি ঘটতেই বা যাচ্ছে। স্থির হবার পর তাকাতে দেখতে পেল। গুরুগম্ভীর মেঘ ডাকার মত আওয়াজ হবার কারণ ওর চারধারের গোটা কাঠামো খসে পড়তে শুরু করেছে। গড়িয়ে এত দূরে চলে আসার পরও একটা বড়সড় পাথর ওর আঙুলের কাছাকাছি পড়ে উল্টো দিকে ছিটকে গেল। যেন বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে বিশাল ভারাটা। চারদিক ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল। এক একটা স্তম্ভের পতন ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীরের নিচে জমিন। উড়ন্ত একটা তক্তা ঘষা খেলো কাঁধে। শরীরটা আবার গড়িয়ে দিল রানা। তারপর হামাগুড়ি দিল। ছুটল। দিক বদলাল। দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকল। ফের ছুটল। জানে না কোথায় যাচ্ছে। ধুলো আর বালিতে সাদা হয়ে গেছে। লোহা, বাঁশ, পাথর,

সিমেন্ট, বালির বস্তা, এরকম ভারী ভারী সব জিনিস অবিরাম বৃষ্টির মত নেমে আসছে আকাশ থেকে। একমাত্র নিয়তি ছাড়া কেউ জানে না এখনও কিভাবে অক্ষত আছে ও। ছুটতে ছুটতে ভাবছে এই বুঝি কিছু একটা পড়ল মাথায়, জানে ভারী কিছু হলে মাটির সঙ্গে চেপ্টে যাবে শরীরটা।

মৃত্যু এখনও ধাওয়া করছে ওকে। তারপর ছুটতে ছুটতে ফাঁকা উঠানে বেরিয়ে এলো। তারপরও ছুটছে, যতক্ষণ না প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সহ ভারা পতনের বিকট গর্জন ভোঁতা শোনাল কানে।

তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কোনরকমে তাল সামলে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। ওর পিছনে ভারার একটা অংশ কয়েকটা কাঠের তক্তা সহ খসে পড়ল। তারপর আর কোন পতনের শব্দ শোনা গেল না। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল বালি আর ধুলোর মেঘ।

ভারার চারভাগের তিনভাগই খসে পড়েছে। পাথর, লোহা, বাঁশ, তক্তা, সিমেন্ট ও বালির বস্তার বিশাল সব স্তূপ তৈরি হয়েছে চারদিকে, সবচেয়ে বড়টা ফেরাউনের পায়ের সামনে, তাঁর হাঁটু সমান উঁচু।

নিনা সুসমি বা দানবাকৃতি লোকটার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা। ধুলোর ভেতর দিয়ে এখন অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওরা দু'জন কোথাও নেই। ও ভাবল, যেহেতু কিছু নড়ছে না, তাদের বেঁচে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবু আবর্জনার ভেতর সার্চ করে দেখতে হবে ওকে।

হাত দিয়ে মুখ ঘষে কিছু ধুলো পরিষ্কার করল রানা। মাছির সঙ্গে সারাক্ষণ প্রায় লড়তে হচ্ছে। লোকটা মরে থাকলে ভাল হয়েছে। কিন্তু সুসমি? সে-ও নিজেকে ওর শত্রু হিসেবে মনে করে, তারপরও রানা ভোলে কি করে যে দানবটা ওর ঘাড়ের পিছনে কামড় বসাবার ঠিক আগের মুহূর্তে অস্ত্র তুলে বাধা

দিয়েছিল সে? এ তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে মেয়েটা।

সাবধানে সামনে এগোল রানা। একবার থেমে ভারার চারপাশটায় চোখ বুলাল। মেটাল ক্যানিস্টার-এর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। এখানে যদি সেটা থাকেও, আবর্জনার ভেতর কোথায় চাপা পড়ে আছে কে বলবে।

ঘুরল রানা, হঠাৎ উপলব্ধি করল এখানে সময় নষ্ট করাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। শরীর ক্লান্তি ও ব্যথায় কাতর, তারপরও যত জোরে পারা যায় ছুটল। মাইক্রোফিল্মটা যদি সুসমির হাতে পড়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ট্রাকটার দিকে ফিরে যাবে সে।

স্তম্ভ ও পিলারের মাঝখান দিয়ে দৌড়াচ্ছে রানা, ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে উঠেছে। পিঠটা মনে হলো ভাঙা। সূর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। পাঁচিলের ভাঙা ফাঁক গলে বেরিয়ে এলো। স্ফিংকস্ সাজানো চৌরাস্তা ধরে ছুটছে। ট্রাকটার দিকে এগোল এক পাশ দিয়ে, উদ্দেশ্য প্যাসেঞ্জার সাইডে পৌঁছানো, তাতে রিয়ার ভিউ মিররে ওকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম।

ক্যাব-এর পাশে ও একটু পিছনে থামল রানা। ক্যাব-এর দরজাটা খুলবে। হাতলটা ধরার জন্যে হাত তুলল, কিন্তু ইতস্তত করছে। তারপর ধরেই টান দিল।

কন্ট্রোল-এর ওপর ঝুঁকে রয়েছে সুসমি, ড্যাশবোর্ডের নিচে হাত, একজোড়া তার নাড়াচাড়া করছে। মেটাল ক্যানিস্টার ও বেরেটাটা পড়ে রয়েছে তার পাশে সিটের ওপর। পরম স্বস্তি অনুভব করছে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দুটোই তুলে নিল রানা, সযত্নে পকেটে ভরার সময় সহাস্যে বলল, 'আমার জানা ছিল না যে মেকানিক্যাল ব্যাপারেও তোমার ঝোঁক আছে।' ক্যাবে উঠে বসে ইগনিশন কী-টা বাড়িয়ে ধরল। 'এটা দিয়ে চেষ্টা করছ না কেন? অনেক সহজে পারবে।'

সত্যিকার বোমা পড়ার মত বিকট শব্দ করে ওদের সামনে

বনিটের ওপর পড়ল জানোয়ার। বারো ফুট উঁচু পাঁচিলের মাথা থেকে লাফ দিয়েছে সে। বনিট তুবড়ে গেল, জানোয়ারের মাথা বাড়ি খেলো উইন্ডস্ক্রীনে, ফলে মাকড়সার জাল হয়ে গেল সেটা। ধুলোয় সাদা মুখ থেকে লাল রক্ত গড়াচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলছে।

'ছোটো!' চাবি ছেড়ে দিয়ে বেরেটার জন্যে পকেটে হাত ভরল রানা। এঞ্জিন ঝাঁকি খেয়ে জ্যান্ত হতে গড়িয়ে বনিট থেকে নেমে পড়ল জানোয়ার, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরতে চাইল রানার দিকের দরজার হাতলটা। আধ সেকেন্ড আগে লক করে দিয়েছে রানা, জানোয়ার ধরে মোচড় দিতে ভেঙে গেল হাতলটা।

সবেগে হুইল ঘুরিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল সুসমি। লাফ দিয়ে ছুটল গাড়ি। আহত মোষের মত তেড়ে এলো জানোয়ার, ধাওয়া শুরু করল। প্রচণ্ড রাগে মাঝে-মধ্যে ট্রাকের গায়ে মুঠো করা হাত দিয়ে ঘুসি ও লাথি মারছে সে।

প্রাচীন নগরীর এই ধ্বংসাবশেষ থেকে সহজে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই। বাধ্য হয়ে রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছন দিকে গাড়ি চালাতে হলো সুসমিকে। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল জানোয়ার, ট্রাক পিছনের পাঁচিলে বাড়ি খেলো।

আবার এগিয়ে এলো জানোয়ার, গাড়িটার ওপর প্রচণ্ড রেগে গেছে। হ্যাঁচকা টানে একটা বাম্পার ছিঁড়ে নিল; চাকার ওপর বসানো লোহার বাক্সটাকে পেটাবার জন্যে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। স্কুল ও কলেজ জীবনে হকি ও ক্রিকেট মাঠে এভাবেই খেলোয়াড় আর রেফারিদের ওপর চড়াও হত সে।

সুসমি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল ঠিকই, কিন্তু লক যথেষ্ট আঁট না হওয়ায় খোলা পথের বদলে পাথরের একটা পাঁচিল দেখতে পাওয়া গেল সামনে। আবার রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছন দিকে ট্রাক চালাল সে। মুহূর্তের জন্যে প্রকাণ্ড উন্মাদটাকে রানা দেখতে পেল না।

তারপর যখন মাথা ঘোরাল, ওর উল্টো অর্থাৎ সুসমির দিকে

তাকে দেখতে পেল রানা। ভীতিকর বিরাট মুখ হাঁ করে আছে। সুসমির দিকের দরজার ফ্রেম আর উইন্ডস্ক্রীনটাকে আলাদা করেছে যে ঢালাই করা ধাতব অংশ, সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল জানোয়ার। চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করবে দাঁত দিয়ে ভেঙে ট্রাকের ক্যাবে ঢুকতে চাইছে মূর্তিমান একটা অভিশাপ।

গাড়িটা সামনে ছুটুক, এই ব্যাকুল ইচ্ছের সঙ্গে রানা অনুভব করল ওর পা মেঝেতে চেপে বসছে। শুনতে পেল বালির গভীরে বন বন করে চাকা ঘুরছে, কিন্তু গাড়ি এগোচ্ছে না। নতুন একটা আতংক বরফের মত ছ্যাঁকা দিয়ে গেল শিরদাঁড়ায়। এঞ্জিনের শক্তি বাড়াবার কাজে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে সুসমি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরায় জিভে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে।

ওদিকে উইন্ডস্ক্রীন ফ্রেম-এর মেটাল তোবড়াতে শুরু করল।

সুসমির ওপর ঝুঁকে বেরেটা তুলল রানা, একটা গুলি করল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে।

লক্ষ্য ব্যর্থ হবার কোন প্রশ্ন নেই। আওয়াজ শুনে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল গুলি লেগেছে। আগুনের ফুলকি ছুটল। সেই সঙ্গে শোনা গেল বিচিত্র একটা গুঞ্জন আর শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

ঘটনাটা কি?

বুলেটটা জানোয়ারের ইস্পাতের দাঁতে লেগে আরেক দিকে ছুটে গেছে। প্রকাণ্ড মাথাটা বেমক্কা ঝাঁকি খেলো পিছন দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চাকাগুলোও বালিতে গড়াতে শুরু করল।

নিজের তৈরি গর্ত থেকে ঝাঁকি খেতে খেতে উঠে এলো ট্রাক, স্পীড ক্রমশ বাড়ছে। বডি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে, গোঙাচ্ছে, মনে হলো ভেঙে পড়বে, তবে নতুন কোন হামলার শব্দ বা লক্ষণ ওরা পাচ্ছে না। বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উইং-মিররে চোখ রাখল রানা।

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। স্থির, তারপরও ভয়ানক হুমকির মত লাগছে তাকে, তাকিয়ে আছে দ্রুত গতি ট্রাকের দিকে। পিছনে

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নিয়ে অটল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকেও ওগুলোর একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে।

জানালার কাছাকাছি পকেটটায় বেরেটা গুঁজে রেখে রানা ভাবছে এরকম একটা বিপদ থেকে মুক্তি পাবার পর ঠিক কি বলাটা উচিত হবে।

সুসমি ঠোঁট কামড়ানো বন্ধ করেছে। তবে তার চোখে-মুখে আবার সেই আগের দৃঢ়প্রত্যয় ও গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে।

'জন্তুটার হাতে আমাকে একা ফেলে আসার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা।

যেমন ট্রাক চালাচ্ছিল তেমনি চালাচ্ছে সুসমি। রানার দিকে ফিরে তাকানোর গরজটুকুও দেখাল না। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল বেশ কয়েক মুহূর্ত পর। শ্রাগ করল সে। তারপর বলল, 'আগেই তো বলা হয়েছে, যে যার স্বার্থ দেখবে। মনে নেই?'

'তবু, এর আগে আমার স্বার্থ রক্ষায় তুমি সচেষ্ট হয়েছিলে বলে মনে পড়ছে।'

সুন্দর নাকটা কোঁচকাল সুসমি। 'ভুল আমরা সবাই করি।'

মুচকি হাসল রানা, আর কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। সামনে তাকিয়ে দেখল সরল রাস্তাটা দিগন্তের দিকে হারিয়ে গেছে। ভাগ্য বিরূপ না হলে সন্ধ্যার মধ্যেই কায়রোয় পৌঁছে যাবে ও। কিন্তু তারপর?

অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্টে রানার বোধহয় উচিত হবে ওর এজেন্সির নতুন একটা সেফ হাউসে মেটাল ক্যানিস্টারটা পৌঁছে দেয়া। হোটেলের স্যুইটে বা নিজের কাছে এটা রাখারই কোন দরকার নেই। আড়চোখে সুসমির দিকে তাকাল ও। কে জানে তার মনের ভেতর কি চলছে।

পকেটে হাত ভরে ক্যানিস্টারটা বের করল রানা। আশা করল সুসমির কোন প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু সে যেন কিছু গ্রাহ্যই করছে না, সামনের দিকে তাকিয়ে এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে, দুটো হাতই

স্টিয়ারিং হুইলে।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যানিস্টারটা খুলল রানা, তারপর টোকা দিয়ে ফিল্ম স্পূলটা বের করল। ইঞ্চি দুয়েক সেলুলয়েড দুনিয়ার ইতিহাস বদলে দিতে পারে। গোটা ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব মনে হয়। ফিল্মটা আলোর কাছে তুলে পরীক্ষা করল ও।

গিয়ার বদলাল সুসমি। হাতটা কিন্তু হুইলে ফিরিয়ে আনল না। চোখের কোণ দিয়ে রানা খেয়াল করল সুসমির একটা হাত হুইলে নেই, সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি তাকাল ও। পেলব হাতটা যেন উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা পাবার লোভে বাসা বেঁধেছে ওর উরুর বিপরীতে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। এবার সুসমিও ওর দিকে ফিরল। চিবুক তির্যক হলো, নীল দুটো গভীর চোখে দুনিয়ার সরলতা। সেই সরলতার সঙ্গে মিশে আছে বিজয়ের উল্লাস।

রানার হাত ডাইভ দিল নিজের উরু লক্ষ্য করে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জ্বালাটা মৌমাছি কামড়ানোর। সুই বিঁধেছে। রানা অনুভব করল ওর কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অসাড় হয়ে আসছে সবগুলো আঙুল।

ফিল্মটা খসে পড়ল মেঝেতে।

ওর উরুর কাছে সুচটা চকচক করছে, বেরিয়ে আছে আঙটির ঠিক মাঝখান থেকে। কি বোকা ও! সুসমি চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের মেয়ে বলেই আরও বেশি সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এটা শুধু বোকামি নয়, গুরুতর ভুল ও অন্যায়। কেন, সুসমি ওকে বলেনি, এসপিওনাজ জগতে কে আবার কার বন্ধু?

এখন তোমার কি হবে, মাসুদ রানা? অসতর্ক হবার খেসারত দিচ্ছ। মারা যাচ্ছ কি?

'মনে আছে তো, ডিয়ার মাসুদ রানা?' জ্ঞান হারাবার আগে নরম ও মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'যে যার স্বার্থ দেখব আমরা?'

দশ

জমজমাট খলিলি বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটছে মাসুদ রানা, অনুভব করছে ক্লান্তি আর অবসাদ প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে ওকে। চীনা ডাইনীটা যে বিষই ব্যবহার করে থাকুক, সেটা যেন এখনও পায়ে কার্পেট স্লিপার পরা একজন অ্যানিসথেটিস্ট-এর মত ওর ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। শরীরে এমন এক ইঞ্চি জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ব্যথা অনুভব করছে না ও। তবে সত্যিকার ভোগাচ্ছে ভেতরের জ্বালাটা। অতি শক্তিশালী ইলেকট্রিক কারেন্টও সেটার নাগাল পাবে না।

সেটা হলো ব্যর্থতার জ্বালা।

দু'পায়ের মাঝখানে লেজ গুটিয়ে পিছু হটতে অভ্যস্ত নয় রানা। সেফ হাউসে খালি হাতে ফিরতে হবে ভাবতেই নিজের ওপর রাগে ঝাপসা দেখছে চোখে।

এটাকে শুধু একটা ব্যর্থতা হিসেবে দেখলে চলবে না। এই ব্যর্থতার বিশ্লেষণ থেকে নানা তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে। বয়স বাড়ছে ওর? তার সঙ্গে বুদ্ধির ধার কমছে? জিনিসটা হাতে না পাওয়া এক কথা, আর পেয়ে খোয়ানো অন্য কথা–অনেক বেশি লজ্জার, বিশেষ করে একটা মেয়ে যখন তোমাকে বোকা বানাল।

'এদিকে, সার! এদিকে! যে সুন্দর সোনার গহনাটা আপনার লেডি খুব পছন্দ করবে, সেটা শুধু আমাদের কাছে আছে। এখানে ন্যায্য দামে পাবেন, সার।'

'এ-সব আর্টিফ্যাক্ট, সার! হাজার হাজার বছরের পুরানো। আর এগুলো হলো, হাতলে রুপোর কাজ করা হাতিয়ার–প্রাচীন রাজারা ব্যবহার করতেন।'

রানার মনে হলো জনস্রোতের বিরুদ্ধে এভাবে বেশিক্ষণ হাঁটতে হলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দোকানদাররা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে খদ্দের পাকড়াও করছে, এটা বোধহয় শুধু মিশরেই সম্ভব। হকাররা আরও এক কাঠি বাড়া। অশ্লীল ভিউ কার্ড মেলে ধরছে চোখের সামনে, মাথা নেড়ে নিষেধ করা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটছে। তারপর ওর চোখে পড়ল যা খুঁজছে। 'চাকমা কার্পেটস্'।

দীর্ঘ ও সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। দ্রুত এগিয়ে এলো মেয়েটি। 'গুড ডে, সার। আমাদের কাছে কায়রোর সবচেয়ে ভাল কার্পেট পাবেন আপনি।'

'আমি শুধু পাহাড়ী অঞ্চলের সুতি কার্পেট সম্পর্কে আগ্রহী, জুম চাষের দৃশ্য বোনা থাকতে হবে তাতে।'

'তাহলে তো একদম ঠিক জায়গায় এসে গেছেন, সার। দয়া করে আপনি যদি ভেতরে আসেন...'

'না, আগে বলেন আপনাদের এখানে ঠিক কি-কি পাওয়া যায়,' বলল রানা; কথা হচ্ছিল ইংরেজিতেই, হঠাৎ ভাষাটা বদলে গেল।

মেয়েটাও এবার বাংলাতেই উত্তর দিল, 'আদিবাসী চাকমা মেয়েদের তাঁতে তৈরি পিনন্-খাদি পাবেন, পাবেন সাদা ও কালো মাফলার। আর ওদের সিল্কের পিনন্-খাদি তো ফরেনারদের খুবই পছন্দ...'

এ-সবই সাঙ্কেতিক বাক্য, নিশ্চিত হওয়া গেল বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে বলে দেয়া এটাই রানা এজেন্সির গোপন শাখা ও নতুন সেফ হাউস।

দোকানটা বেশ বড়, পিছনে প্রায় অন্ধকার করিডরগুলো

টানেলের মত, বারবার বাঁক নেয়ায় গোলকধাঁধার মত লাগছে। শীত শীত করছে রানার। মনে মাত্রা ছাড়ানো রাগ জমে উঠলে এরকম শীত শীত করে ওর, বিশেষ করে কেউ ঠকিয়ে বোকা বানাবার পর। নিনা সুসমি, আর একটাবার যদি পাই তোমাকে!

কোথায় সেফ হাউস, গোলকধাঁধার শেষ মাথায় পৌঁছে লোকে লোকারণ্য আরেকটা সরু রাস্তা দেখতে পাচ্ছে রানা। তবে কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে তাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে খুব ভাল ব্যবস্থা এটা। গাইড মেয়েটা ছোট একটা কামরায় ঢুকল, দুটো দরজার যে-কোন একটা দিয়ে ঢোকা যায় এটায়। দেয়ালে দেয়ালে চাকমা মেয়েদের তৈরি নানা বাহারি রঙের ও বিচিত্র নকশা কাটা কার্পেট ঝুলছে। মেয়েটার চোখে একটু সন্দেহ ও দ্বিধা, বলল, 'আশা করি যা খুঁজছেন এখানে তার সবই পেয়ে যাবেন আপনি।'

প্রায় ঝটকা মেরে একপাশের একটা কার্পেট সরাল মেয়েটা, ইঙ্গিতে সদ্য তৈরি হওয়া ফাঁকটার ভেতর ঢুকতে বলল রানাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সরু একটা করিডরে পা রাখল রানা। ওর পিছনে কার্পেটটা আবার জায়গা মত ফিরে আসার এক সেকেন্ড পর আলো জ্বলে উঠল। বাতাসে একটা হালকা গন্ধ আছে, কোন খালি বাড়ি দু'তিন মাস বন্ধ করে রাখলে যেরকম গন্ধ পাওয়া যায়। কেমন ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আর গুমোট।

করিডর ধরে কিছুদূর হাঁটার পর সামনে একটা সিঁড়ি দেখতে পেল রানা, ধাপগুলো পাথরের তৈরি। নামতে শুরু করেছে, মানুষের গলা শুনতে পেল। অস্পষ্ট নারী কণ্ঠ, সম্ভবত টেলিফোন বা ইন্টারকমে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

সিঁড়ি বেয়ে ছোট একটা ঘরে নেমে এলো রানা। ডেস্কের পিছনে এমন একজন সেক্রেটারি বসে আছে যাকে দেখে রীতিমত চমকে ওঠারই কথা ওর। শেষবার, এই মাত্র কদিন আগে দেখেছে তাকে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। ওর ডাক নামটা আনকমন, সে জন্যেই মনে আছে–শখ। কারও প্রাইভেট

সেক্রেটারি, তবে ঠিক কার মনে নেই–সম্ভবত ওর মত কোন এজেন্টেরই হবে। ইন্টারকমের সুইচ অফ করল সে। ভান করল রানার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়, চেয়ারের পিঠ থেকে একটা কার্ডিগান তুলে নিয়ে পরছে। সামনে কমপিউটর মনিটর রয়েছে। 'ঠাণ্ডা, তাই না, মাসুদ ভাই?' শীতে কেঁপে ওঠার একটা ভঙ্গি করে কমপিউটরের কী বোর্ডে চোখ নামাল। মুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, কি যেন টাইপ করছে। 'আপনি যদি ভেতরে ঢোকেন তো ঢুকতে পারবেন, কোন অসুবিধে নেই।' ইঙ্গিতে নিজের পিছন দিকের দরজাটা দেখাল সে।

নিজেকে সামলে রাখল রানা। ডেস্ক ঘেঁষে সামনে এগোল। এখানে আসলে ঘটছেটা কি?

দরজাটা সাবধানে খুলল রানা। সাদা ডিসটেম্পার করা লম্বা একটা কামরায় পা রাখল। এখানে ঠাণ্ডা কম। কামরার শেষ মাথায় চওড়া, পালিশ করা চকচকে একটা ডেস্ক দেখা যাচ্ছে, ওপরে চারটে বাস্কেট রাখা। ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে, রানার দিকে পিস্তল তাক করে, নিনা সুসমি। ব্যারেলটা সরাসরি ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে ধরা।

রানা ভাবল, ও কি ভুল দেখছে? নাকি ওর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে?

রানা চোখ মিটমিট করছে, ভাবছে এখুনি ওকে গুলি খেয়ে মরতে হবে কিনা, এই সময় মঞ্চে আরেক অভিনেতার আগমন ঘটল। ইনি মেইনল্যান্ড চাইনিজ আর্মি-র মেজর জেনারেল-এর ইউনিফর্ম পরে আছেন, বুকে রিবনগুলো চার সারিতে সাজানো। এই ভদ্রলোককে ফটো দেখে চেনে রানা। চাইনিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ জুং জাও ঝাউ। রানাকে দেখলেন তিনি, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন, যে দরজা দিয়ে এইমাত্র ভেতরে ঢুকেছেন।

এরপর ভূত দেখার মতই চমকে উঠতে হলো রানাকে, কারণ

চোখে দেখে কি করে অবিশ্বাস করে পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে কামরায় ঢুকছেন স্বয়ং ওর বস্, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। সামরিক উর্দি নয়, কমপ্লিট সুট পরে আছেন তিনি। বাতাস না থাকলেও টাইটা মনে হলো উড়ছে, রানাকে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়াই সেটার কারণ। পাইপটা একবার তাক করলেন ওর দিকে। ওর উপস্থিতি সম্পর্কে উনি সচেতন, এটুকুই শুধু বোঝাতে চাইলেন।

ডেস্কের দিকে এগোচ্ছেন রাহাত খান, ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল সুসমি।

'আহ্, এমআরনাইন। তুমি পৌঁছেছ।'

সুসমির হাতের পিস্তলটা ওয়ালথার, সেটা সে উল্টো করে ধরে এগিয়ে এলো রানার দিকে। তার হাসিতে মুক্তো ঝরছে। 'দেখা যাচ্ছে অন্যান্য আরও অনেক জিনিসের মতই তোমার পিস্তলটাও আমার দখলে চলে এসেছে।'

হাত বাড়িয়ে নিজের অস্ত্রটা নিল রানা। এখুনি একবার ওটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা জাগলেও, ঝোঁকটা দমন করল। বসের দিকে তাকাল ও। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, সার।'

ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন রাহাত খান। 'আমাদের প্ল্যানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, রানা। মেজর জেনারেল জুং জাউ ঝাউ আর তাঁর এডিসি মেজর নিনা সুসমি প্রেসিডেন্ট মোবারকের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কায়রোয় এসেছেন...'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাহাত খান হাত তুলে বাধা দিলেন।

'না, একদিক থেকে ওটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়, আরেক দিক থেকে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারবে সবটা শোনার পর।' নিরবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওদের মূল বিষয়টা সত্যি সাংঘাতিক গুরুতর ও প্রচণ্ড জরুরী।'

বসকে এ-ধরনের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে শুনে রানা বিস্মিত। 'তুমি হয়তো ব্যাপারটা সম্পর্কে এখনও কিছু জানো না–চীনও তাদের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন হারিয়েছে।'

রানার পালস রেট বেড়ে গেল। এটা সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। সুসমির দিকে তাকাল ও, সে-ও তাকাল–ভাবলেশহীন চেহারা, দৃষ্টি কঠিন। শুধু চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে যেন বলতে চাইছে–'তুমি কি এতটাই কাঁচা যে আশা করবে আমার সব গোপন কথা তোমাকে বলে দেব?'

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, দু'দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা যদি এই অ্যাসাইনমেন্টে একসঙ্গে কাজ করি তাহলে সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই সেটা ভাল হবে। আমেরিকা, চীন ও বাংলাদেশ এই কাজের কাজী হিসেবে একজনকেই সন্দেহ করছে। তবে এখনও নিশ্চিতভাবে কেউ আমরা জানি না সত্যি সে দায়ী কিনা। এ-ও জানি না কি তার উদ্দেশ্য বা প্ল্যান।'

'জ্বী, সার।' সেই লোক দু'জনের কথা ভাবছে রানা, যারা ওর জননেন্দ্রিয়ে ইলেকট্রোড আটকেছিল। হিসাবে বলে, তারা আজ বেঁচে থাকলে ওর মিত্র হত, ফিল্ডে ওরা একসঙ্গে কাজ করত। আইডিয়াটা পছন্দ হবার কোন কারণ নেই, তাই রানা প্রসঙ্গটা এভাবে তুলল, 'এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে মনে হতে পারে চীন এখন আর বাংলাদেশের বন্ধু নয়, চাইনিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স মাঠে নেমেছে বিসিআইকে ধ্বংস করার জন্যে...'

মেজর জেনারেল জাউ ঝাউ হাউ-মাউ করে উঠলেন। 'কি ঘটেছে সব আমরা জানি। আসলে সবই ভুল বোঝাবুঝির দুঃখজনক পরিণতি। সেজন্যে আপনার বসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি আমি। আমাদের সরকারও দুঃখ প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে।'

'হ্যাঁ, রানা,' রাহাত খান নরম সুরে বললেন। 'ব্যাপারটা আমাদের ভুলে যাওয়াই উচিত।'

রানা জবাব দিতে দেরি করছে, আর সেই সুযোগটাই তাড়াতাড়ি কাজে লাগাল সুসমি। 'রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং অফিশিয়ালি আমরা হয়তো সব ভুলে যাব, কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সবার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। অন্তত রানার মৌনতা যেন সেই কথাটাই বলতে চাইছে।'

'ঠিক উল্টোটা সত্যি,' বলল রানা। 'ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এই পেশায় এতদিন টিকতাম না। চুপ করেছিলাম এই জন্যে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ—সত্যি যদি ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা ভুলে যাওয়া উচিত।'

জেনারেল জাউ ঝাউ বিরাট শরীর নিয়ে সুসমির দিকে কাত হয়ে চীনা ভাষায় নিচু গলায় কিছু বললেন। কথা শেষ হতে সিধে হয়ে বসলেন আবার, রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন। হাসিটার একমাত্র নির্ভেজাল দিক হলো, ভদ্রলোক সোনার তৈরি নকল দাঁত ব্যবহার করেন। আন্তরিকতা বা উষ্ণতার কোন লক্ষণ রানার চোখে অন্তত ধরা পড়ল না। তবে এ-ও মনে রাখা দরকার যে সামরিক বাহিনীর একজন কর্মকর্তা তিনি, প্রায় সারাটা জীবন ধরেই চর্চা করেছেন মনের নরম দিকগুলো যাতে প্রকাশ না পায়। তাঁর মুখ নড়াচড়া করল, কিন্তু চোখ দুটো ঠিক যেন একজোড়া টুয়েলভ-বোর ব্যারেলের মত অটল।

সুসমি তার বসের মুখপাত্র হতে চাইল। 'কমরেড জেনারেল জানাচ্ছেন যে পাগল বিজ্ঞানী কবীর চৌধুরী এর আগেও চীনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। সে একজন বাঙালী হলেও, আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার তাকে একজন ক্রিমিনাল ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে মনে করে। সেজন্যেই আমরা এই মিশনে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

'একটু সংক্ষেপ করলে হয় না?' রানা বিরক্ত, তবে কথার সুরে মধু মাখানো।

'একসঙ্গে কাজ করা উপলক্ষে, আমাদের দিক থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ, উদ্ধার করা মাইক্রোফিল্মটার একটা কপি তোমাদেরকে উনি দিচ্ছেন।'

'কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তারচেয়ে একটু বেশিই নোয়াল রানা মাথাটা। তারপর খাড়া করল শিরদাঁড়া। 'এ বিষয়ে বলার কথা আমারও একটা আছে।'

মুখ থেকে পাইপ নামালেন রাহাত খান। 'কি?'

'প্রথমবার পরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে মাইক্রোফিল্মটা কোন কাজের জিনিস নয়।'

একটা শীতল নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর, শুধু যা একটু উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাহাত খানের পাইপ থেকে বেরুনো লাল আভা। 'বলে যাও, রানা।'

'জ্বী, সার। পরীক্ষা করার সময় মাইক্রোফিল্মের গায়ে ছোট ছোট আঁচড় কাটার মত দাগ দেখেছি আমি। ওগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ডাটাগুলো ব্লুপ্রিন্ট থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।'

'এর তাৎপর্য?' রাহাত খানের মুখ থেকে তীরের মত ছুটে এলো প্রশ্নটা। 'গুরুত্বপূর্ণ ডাটা না থাকলে সে ব্লুপ্রিন্টের মূল্য কি? ক্রেতা কিনবে কেন?'

'আমি বলব, বিক্রেতা যেই হোক, এই মাইক্রোফিল্মটা দেখিয়ে সে আসলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল আসল জিনিসটা তার কাছে আছে। অন্য ভাষায়, এটা আমাদের কারুরই কোন কাজে লাগবে না–,' জেনারেল জাউ ঝাউকে হাসিটা ফিরিয়ে দিল রানা, '–অবশ্য কাউকে গিফট দেয়া ছাড়া।'

মোটা ঠোঁট জোড়া এক হতে জেনারেল জাউ ঝাউয়ের সোনার দাঁতগুলো ঢাকা পড়ে গেল। চোখের ভেতর কৃত্রিম আগুনটাও যেন বোতাম টিপে নিভিয়ে দেয়া হলো। বিড়বিড় করে

কিছু বললেন তিনি, মনে হলো বলছেন–হায় আল্লাহ্!

'ইন্টারেস্টিং।' প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়া জেনারেল ঝাউয়ের দিক থেকে ঘাড় ফেরালেন রাহাত খান, সন্দেহে উঁচু হয়ে আছে একটা ভুরু। 'একটু পরই জানার সুযোগ হবে তোমার ধারণা ঠিক কিনা, রানা। মাইক্রোফিল্মটাকে আমি ম্যাগনোস্কোপে দেখাতে বলেছি।' ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন তিনি। 'ঠিক আছে, মান্টি। আমরা তৈরি।'

'ইয়েস, সার।'

ইন্টারকম থেকে বেরিয়ে আসা মিষ্টি নারীকণ্ঠ চিনতে পারল রানা, বাংলাদেশী এই আদিবাসী মেয়েটিই এখানে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ওকে।

'আমাদের নতুন একজন এজেন্ট, টেকনিক্যাল এক্সপার্টও বটে,' যেন রানার চিন্তা-ভাবনা পড়তে পেরেই ওর কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চাইলেন রাহাত খান। 'ওর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে বুঝতে পারবে অত্যন্ত যোগ্য মেয়ে।'

তাঁকে বাংলায় কথা বলতে শুনে জেনারেল ঝাউ ও সুসমি নিরবে দৃষ্টি বিনিময় করল।

উজ্জ্বল আলো অদৃশ্য কোন ইঙ্গিতে ম্লান হতে হতে কামরা প্রায় অন্ধকার হয়ে এলো। তারপর সিলিং থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলো একটা স্ক্রীন। রাহাত খানের ডেস্কের পিছনে দেয়াল, সেই দেয়ালের গায়ে আটকানো একটা বোর্ডে মিটমিট করে খুদে বালব জ্বলছে কয়েকটা, সেগুলোর আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রজেকশন রূমটা কোথায়।

রানা স্ক্রীনের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে, অনুভব করল হাতের তালু দুটো ভেজা ভেজা হয়ে উঠছে। ওর সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হলে সুসমির হাসির খোরাকে পরিণত হতে হবে ওকে।

স্ক্রীন এমন সব সিম্বল বা সাঙ্কেতিক চিহ্নে ভরে উঠল যে

ওগুলোকে সহজেই প্রাচীন কোন পার্চমেন্ট বলে ভুল করতে পারে রানা। তবে স্বস্তির সঙ্গে খেয়াল করল এমন কয়েকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে, যেন তাড়াহুড়ো করে ঘষে ওখান থেকে কিছু মুছে ফেলা হয়েছে।

রাহাত খান ইন্টারকমে কথা বলছেন। 'তো, মান্টি? কি বলার আছে তোমার?'

মেয়েটাকে কেমন দেখেছে, প্রথম দেখায় কেমন লেগেছে স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু কি রহস্যময়ী–চাউনিতে, নড়াচড়ায়, হাসিতে বা হাবভাবে?

'জ্বী, সার,' মেয়েটার জবাব ভেসে আসছে, তার ইংরেজি দারুণ চোস্ত। 'দেখে যত দূর বুঝতে পারছি, খাঁটি জিনিস। প্রতিটি তথ্যই···মানে, জেনুইনই মনে হচ্ছে। মুশকিল হলো, সার, ভাইটাল কিছু ইনফরমেশন এতে নেই। যা আছে তা আগে থেকেই সবার জানা। তবে আরও জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে, এটুকু বলতেই হবে।'

ঝাঁক ঝাঁক দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও অঙ্কগুলোর দিকে ভাল করে তাকাল রানা। 'ব্লুপ্রিন্টটা কোথায় ড্রাফট করা হয়েছে, এ সম্পর্কে কোন সাজেশন, প্লীজ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এ প্রসঙ্গে আমি আসছিলাম,' বলল মান্টি, 'মাসুদ ভাই। আমাদের ধারণা কাজটা ইটালিতে করা হয়ে থাকতে পারে। কাগজের সাইজ ভিনীশান অকটেইভো-র সঙ্গে মেলে, অর্থাৎ ভেনিসে প্রচলিত আট ভাঁজ করা কাগজ। আর হরফগুলোর আদল ইট্যালিয়ানিট।'

'ব্যাখ্যাটা আরও সহজ-সরল হলে ভাল হত না?' জিজ্ঞেস করল সুসমি।

'সম্ভব নয়, সুসমি,' সরাসরি তাকেই, এবং নাম ধরে জবাব দিল মান্টি। 'মাইক্রোফিল্মটা যেই তুলে থাকুক, কাজটা সে যত্ন নিয়ে করেনি। আলো ছিল খুব কম। যে জিনিস ওখানে নেই

সেটাকে তুমি কিভাবে ব্লো আপ করবে?'

'কাজটা খারাপভাবে করা হয়ে থাকলে তার জন্যে সম্ভবত তাড়াহুড়ো দায়ী,' বললেন রাহাত খান। 'এরকম তাড়াহুড়ো চোর ছাড়া আর কে করবে।'

বসের কথায় মনোযোগ নেই রানার। স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও। তলার দিকে, ডান কোণে, ওটা কি একটা দাগ দেখছে? নাকি অস্পষ্ট, খুবই অস্পষ্ট, কয়েকটা হরফের আভাস? স্ক্রীনের দিকে এগিয়ে এসে হাত তুলল ও। 'এই সেকশনটা এনলার্জ করতে পারো, প্লীজ?'

'আপনার জন্যে চেষ্টা করে দেখতে পারি, মাসুদ ভাই,' ইন্টারকম থেকে জবাব ভেসে এলো। 'তবে এর বেশি কিছু দেখতে পাবেন কিনা বলতে পারছি না।'

স্ক্রীন খালি হয়ে গেল, একটু পরই বিশাল আকৃতির এক সারি ক্লোজ আপ ফুটল সেখানে। ঘাড় ফিরিয়ে সুসমির দিকে তাকাল রানা। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ক্রীনটা দেখছে। হাতের তালুতে চিবুক, মাথা একদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে। যেন কলেজে আসা মনোযোগী ছাত্রী প্রথম লেকচার শুনছে। ভঙ্গিটায় স্বাভাবিক ও অনায়াস এমন একটা কিছু আছে যা একই সঙ্গে মনে সমীহ জাগায়, আবার সন্দেহ হয় খুব উঁচু দরের অভিনেত্রী কিনা। বিচিত্র একটা মেয়ে। চীনা আরও অনেক মেয়ে স্পাই-এর সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে ওকে, সুসমি তাদের মত উচ্ছল নয়, বন্ধুভাবাপন্ন তো নয়ই। এ মেয়ের ওর সম্পর্কে বোধহয় কোন কৌতূহলও নেই। ঠিক কি কারণে বলা মুশকিল, ওর ওপর তার যেন আক্রোশ আছে, যদিও সেটা চেপে রাখতে চেষ্টা করছে।

ওদের মানুষকে মেরে ফেলেছি আমি, কাজেই আমার ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক—ভাবছে রানা; কিন্তু সুসমির বোঝা উচিত যে তারা নিজেদের দোষে মারা গেছে, ও যা কিছু করেছে সবই আত্মরক্ষার চেষ্টায়।

জেনারেল ঝাউ লক্ষ করছেন সুসমির দিকে মাঝে মধ্যেই তাকাচ্ছে রানা। মনে মনে একটু শঙ্কিত বোধ করছেন তিনি। সুসমি এমন একটা মেয়ে, কাছাকাছি এলে যে-কোন পুরুষ তাকে ভাল না বেসে পারবে না। এ নিয়ে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসে ঝামেলা দেখা দিয়েছিল। তাওজি হুতাও আর সুসমি পরস্পরকে ভালবাসে জেনেও এমন কোন পুরুষ এজেন্ট ছিল না যে সুসমিকে প্রেম নিবেদন করেনি। ওদের দু'জনকে এই বিশেষ মিশনের প্রয়োজনে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ডেকে নেয়ার পরও সেই একই সমস্যা দেখা দেয়, যে দেখে সে-ই সুসমিকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু হুতাওকে সুসমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, কাজেই কেউ তাকে টলাতে পারেনি। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, সমস্যা দেখা দিয়েছে মাসুদ রানার হাতে তাওজি হুতাও মারা যাবার পর। শুধু চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস থেকে নয়, বেইজিং কর্তৃপক্ষের ওপর মহল থেকেও বলে দেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশ চীনের বন্ধু রাষ্ট্র, বিসিআই চীফ রাহাত খান ও এজেন্ট মাসুদ রানা চীনা জনগণের বহু উপকার করেছেন, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবেও চীনের পরীক্ষিত বন্ধু, কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না—বিশেষ করে যখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে নিজেদের ভুলে ও বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মারা পড়েছে তিন চীনা এজেন্ট। জেনারেল ঝাউ এ-সবই ব্যাখ্যা করেছেন সুসমিকে। সুসমি ভাব দেখিয়েছে সবই বুঝেছে সে এবং নিয়তির বিধান বা প্রহসন মেনেও নিয়েছে। কিন্তু জেনারেল ঝাউয়ের মন থেকে সন্দেহ যায়নি। সত্যি কি প্রেমিক তাওজি হুতাও-এর খুনী মাসুদ রানাকে ক্ষমা করতে পারবে সুসমি?

তাঁকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সুসমিকে প্রত্যাহার করে নেয়া হোক, বিশেষ করে যৌথ মিশনে রানা যেহেতু থাকছে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। রাজি হননি আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে।

সাবমেরিন ট্র্যাকিং সিস্টেম একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর আবিষ্কার। সেই বিজ্ঞানী হোক বাংলাদেশেরও শত্রু, নাটকের শেষ দৃশ্যে কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। বিজ্ঞানী কোণঠাসা হয়ে পড়ল, প্রস্তাব দিল তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিলে ব্লুপ্রিন্টটা বাংলাদেশ তথা রানার হাতে তুলে দিতে রাজি আছে সে–তখন কি হবে?

বিসিআই এজেন্ট রানা মূল ব্লুপ্রিন্টটা যদি একা উদ্ধার করতে পারে, সে কি ওটা চীনকে দেবে? ফিল্ডে আসলে ঠিক কি ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। চীনা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন কুবলাই খান-এ একুশটা আইসিবিএম আছে, রেইঞ্জ বারো হাজার মাইল, নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ। চীনের এই সাবমেরিন থেকে মিসাইল ছুঁড়ে চীনকে ধ্বংস করে দেয়া খুবই সম্ভব। ঘটনা কোনদিকে মোড় নেবে কে জানে–রানা যদি পাগল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আপস করে, বাংলাদেশকে রক্ষার বিনিময়ে?

না, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও চীনের অস্তিত্ব রক্ষার এই মিশনে নিনা সুসমিকেই রাখছেন তিনি। সুসমি রানার ওপর যতটা কড়া নজর রাখবে, আর কারও পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রয়োজন হলে সুসমিই সেটা সবচেয়ে ভালভাবে পারবে। তারপর, অনভিপ্রেত কিছু ঘটে গেলে, দুঃখ প্রকাশ আর ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগ তো থাকছেই। কিল খেয়ে কিল হজম তো করতে হয়েছে চীনকে, মাফও চাইতে হয়েছে বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে; এরপর না হয় কিল মেরেই মাফ চাওয়া যাবে।

তবু জেনারেলের মন থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যাচ্ছে না। মাসুদ রানার দৃষ্টি দেখে যত দূর তিনি বুঝতে পারছেন, সবার মত সে-ও সুসমির রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। দুশ্চিন্তাটা তাঁর এখানেই। রানা সম্পর্কে তিনি শুনেছেন, সে যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে সেই মেয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না–মেয়েটার মনে হয় তাকে

জাদু করা হয়েছে। সুসমির বেলায় সেরকম কিছু ঘটবে না তো?

'হোল্ড ইট!' স্ক্রীনে চোখ, সারা শরীরে উত্তেজনা, প্রায় চিৎকার করে উঠল রানা। ওপর থেকে নিচে নামা একটা তির্যক রেখা ব্লুপ্রিন্ট-এর কিনারা চিহ্নিত করেছে, ওই রেখার ডান দিকে ছায়া ছায়া কয়েকটা হরফ দেখা যাচ্ছে—তবে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর মত স্পষ্ট বা ধারাল নয়, বেশ ঝাপসা। এর সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা এই হতে পাবে—অন্তত রানার মনে হলো—ব্লুপ্রিন্টের ফটো তোলার সময় ওটার নিচে কিছু একটা ছিল, সেই কিছু একটারই আভাস ফুটে উঠেছে মাইক্রোফিল্মের ডান দিকের কোণে।

হরফগুলো পড়ার জন্যে চোখ সরু করল রানা। O-R-A-T-O-R-Y। হরফগুলোর সঙ্গে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্নও আছে।

'অরাটরি ,' রাহাত খান লেখাটা পড়লেন। 'এ থেকে কি বুঝছ তুমি, মান্টি?'

'বুঝতে পারছি না, সার,' মার্জিত, সুললিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ইন্টারকম থেকে। 'দেখে মনে হচ্ছে কোন লেটার-হেড প্যাড-এর ডান দিকের প্রান্ত। কাগজের কিনারা তো চেনাই যাচ্ছে। ফটো তোলার সময় নিশ্চয়ই এই কাগজটার ওপর রাখা হয়েছিল ব্লুপ্রিন্টটা।' নি.জর ধারণা সত্যি হতে যাচ্ছে দেখে রানা খুশি। 'অরাটরি মানে হলো প্রাইভেট বা নিজস্ব ছোট গির্জা। ছোটখাট ক্যাথলিক পাবলিক স্কুলকেও এক সময় অরাটরি বলা হত।'

'কোন স্কুলে এত অ্যাডভান্সড সায়ান্স পড়ানো হতে পারে যে তারা সাবমেরিন ট্র্যাকিং সিস্টেমের মত যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার করে ফেলল?' রাহাত খানকে একটু বিরক্ত বলে মনে হলেও, পরমুহূর্তে দেখা গেল আসলে তিনি রসিকতা করছেন। 'সবাই জানে যে ঈসা নবীর অনুসারীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু তাই বলে—,' কথা শেষ না করে শ্রাগ করলেন, তারপর সুসমির দিকে তাকালেন।

সুসমি নিচের ঠোঁট কামড়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওই সাঙ্কেতিক চিহ্নটা আমি দেখেছি,' বলল সে। নীল চোখ দুটো চকচক করছে।

'চিহ্নটা একটু পাগড়ির মত দেখতে, সার,' ইন্টারকম থেকে ভেসে এলো গলাটা। 'যে ধরনের পাগড়ি সাধারণত শিখরা পরে...'

'এখানে আমরা গুরু নানকের অনুসারী কাকে পাই যে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব!' বললেন রাহাত খান।

আবার চোখ সরু করে ঝাপসা সাঙ্কেতিক চিহ্নটার দিকে তাকাল রানা। মেয়েটা, মানে মান্টি, ঠিকই বলেছে। চিহ্নটা, পরিচিত যদি না-ও হয়, নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও দেখেছে ও। আকৃতিতে খাড়া করা দুটো ডিম, একটার ওপর আরেকটা, প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা ছাড়িয়ে গেছে, দ্বিতীয়টায় একটা খাঁজ কাটা, খাড়া হয়ে আছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ছেঁটে দেয়া মাথার ওপর। সাঙ্কেতিক প্রতীক বা চিহ্নের সারা গায়ে সারি সারি আঁকাবাঁকা রেখা আছে। জিনিসটা কিসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ওকে?

'কিংবা মাছ, সার,' বলল মান্টি।

ডেস্কের ওপর ঠাস করে চাপড় মারল সুসমি। 'নিরো! ডানকিলাস নিরোর শিপিংলাইন সী ফেয়ারার-এর সিম্বল ওটা। এবং আমরা জানি কবীর চৌধুরীই আসলে নিরো।'

ও, ইয়েস! প্রথমে ধরতে না পারায় মনে মনে নিজের মুণ্ডুপাত করছে রানা। ডানকিলাস নিরো ওরফে কবীর চৌধুরী। সী ফেয়ারার শিপিং লাইনের মালিক কাসকারাকাস পোপেনডাসকে শুধু খুন করেনি সে, খুন করার আগে তার সমুদয় সয়-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ডানকিলাস নিরোর নামে লিখিয়েও নিয়েছে। কাগজে-পত্রে ডানকিলাস নিরো একজন দক্ষিণ আফ্রিকান গ্রীক। লোকে জানে, আসলে কৌশলে রটিয়ে দেয়া হয়েছে, নিরোর পরিবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও সাবেক ব্রিটিশ কলোনি রোডেশিয়ায়

সোনা ও হীরের খনির মালিক ছিল। পারিবারিক ব্যবসা একঘেয়ে লাগায় এথেন্সে চলে আসে সে, বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান কাসকারাকাস পোপেনডাসের কাছ থেকে তাঁর শিপিং লাইন কিনে নেয়। তার বহরে কয়েকশো সামুদ্রিক জাহাজ রয়েছে। সবচেয়ে বড় খবর, চার-চারটে সুপার ট্যাংকারের মালিক সে। এক একটা সুপার ট্যাংকার সাড়ে চার হাজার টন জ্বালানি তেল বহন করতে পারে। জাহাজ বহরের মালিক হিসেবে ডানকিলাস নিরো এরইমধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধূর্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সম্প্রতি আটলান্টিক, প্যাসিফিক ও চীনা উপসাগরে অনেকগুলো তেলবাহী জাহাজ ও ট্যাংকার দুর্ঘটনায় পড়ে ডুবে গেছে, নিরেট কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এই রহস্যময় দুর্ঘটনাগুলোর পিছনে ডানকিলাস নিরোর হাত আছে বলে সন্দেহ করা হয়। তার কোম্পানির নতুন সিম্বল হলো—বেঁটে ও হোঁৎকা একটা মাছ, লেজের ওপর খাড়া হয়ে আছে; তবে নকশাটা একটু জটিল হওয়ায় সহজে মাছ বলে ওটাকে চেনা যায় না।

'ওয়েল ডান!' ক্ষীণ বিদ্রূপের সুরে সুসমির প্রশংসা করল রানা।

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান, পাইপ থেকে নীলচে ধোঁয়া এঁকেবেঁকে সিলিঙের দিকে উঠে যাচ্ছে। 'কিন্তু "অরাটরি"-র কি হবে? নিরো ওরফে চৌধুরী ইদানীং ঈসা নবীর অনুসারী, এরকম কোন তথ্য কি আমাদের কাছে আছে?'

জবাবটা সুসমি দেবে, এটা কেউ আশা করেনি। 'আদর্শ একজন ক্যাপিটালিস্টের মত, আমাদের জানামতে, কবীর চৌধুরী শুধু নিজের স্বার্থের পিছনে ছোটে।'

সুসমির কথায় কান না দিয়ে একটি মাত্র বিষয়ের ওপর মনোনিবেশের চেষ্টা করছে রানা। অরাটরি, অরাটরি। এর মানেটা কি! কোথাও, নিশ্চয়ই একটা পত্রিকায়, রিপোর্ট বেরিয়েছিল ডানকিলাস নিরো ভূমধ্যসাগরে একটা মেরিন রিসার্চ ল্যাবরেটরি

তৈরি করেছে। ইউরেকা! 'ল্যাবরেটরি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। 'অরাটরি নয়, ল্যাবরেটরি। প্রথম তিনটে হরফ ব্লুপ্রিন্টটা আড়াল করে রেখেছে। কবীর চৌধুরীর একটা মেরিন রিসার্চ ল্যাব আছে কোথাও। আমার ধারণা, কর্সিকায়।'

'সার্ডিনিয়ায়,' বলল সুসমি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর কাঁপা কাঁপা আধো হাসি ফুটল তার কমলার কোয়ার মত রাঙা ঠোঁটে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'ওয়েল ডান।'

'ই-য়েস,' বললেন রাহাত খান, জেনারেল ঝাউয়ের দিকে তাকাবার আগে রানা ও সুসমিকে একবার করে দেখে নিলেন। 'ওয়েল ডান, ইনডিড।' বড় একটা পাথুরে অ্যাসট্রেতে পাইপের ছাই ঝাড়ছেন।

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন জেনারেল ঝাউ, ধীরে ধীরে। তাঁকে কিছুটা অন্যমনস্ক ও চিন্তিত দেখাচ্ছে।

আবার সুসমি ও রানার দিকে ফিরলেন রাহাত খান। 'সার্ডিনিয়ায় হোক বা কর্সিকায়, আমি চাই নিরোর মেরিন ল্যাবরেটরির উদ্দেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে যাও তোমরা।'

নীলনয়না সুসমির চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বসের দিকে ফিরল রানা। 'আমরা...ঠিক কিভাবে, সার?'

হাতের পাইপটা জেনারেল ঝাউয়ের দিকে তাক করলেন রাহাত খান। 'উনি যদি আপত্তি না করেন, সবদিক বিবেচনা করে আমি চাই তোমাদের কাভার হওয়া উচিত হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ।'

'যদি সিকিউরিটির স্বার্থে এই ক্যামাফ্লাজ দরকার হয়,' বললেন জেনারেল ঝাউ, 'আমি তো এতে আপত্তির কিছু দেখি না।' মনে মনে তিনি খুশি। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকলে রানার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখতে সুবিধে হবে সুসমির।

'অবশ্য মিস নিনা সুসমির কিছু বলার থাকলে তা-ও

আমাদেরকে শুনতে হবে,' বললেন রাহাত খান।

'সম্পর্কটা তো স্রেফ কাভার, সত্যিকার কিছু নয়,' বলল সুসমি। 'কাজেই আমার কোন আপত্তি নেই।'

এগারো

সুসমির অন্ধ আঙুলগুলো মসৃণ ও উত্তপ্ত পাথরের ওপর একটা পথ তৈরি করে এগোচ্ছে। মুঠোর ভেতর চলে এলো নমনীয় প্লাস্টিক। ওটার বাঁকা বাঁট হাতের তালুতে জায়গা করে নিল, তারপর বুড়ো আঙুল ও তর্জনী চেপে বসল টুপি আকৃতির ঢাকনার খাঁজ কাটা গায়ে। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার উল্টো দিকে মোচড় দিতে খুলতে শুরু করল, তারপর একসময় পাথরের ওপর খসে পড়ল ঢাকনা বা ক্যাপটা–জমাট নিস্তব্ধতার ভেতর ওই সামান্য শব্দ খুব জোরে বাজল কানে। চোখ এখনও বন্ধ, সুসমি তার বাম হাত সামনে বাড়াল, তারপর প্লাস্টিক টিউবের মুখ ঠেকাল তালুর মাঝখানে। তিন আঙুলের চাপে মৃদু হিসহিস শব্দ করে এক চা চামচ উষ্ণ তরল ক্রীম বেরুল সেটা থেকে। ঢাকনার পাশে টিউবটা রেখে দুই হাত এক করল সে। অনুভব করল আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে ক্রীম; এক করা হাত পরস্পরের সঙ্গে ঘষার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে সান ট্যান লোশন সবখানে সমান মাত্রায় ছড়িয়ে দিল। এরপর সরে এসে ছোট্ট, নরম গদির ওপর বসে নগ্ন কাঁধ আর স্তনে ম্যাসাজ শুরু করল। নিজে ছাড়া কেউ কোন দিন দেখার সুযোগ পায়নি, সুসমি জানে তার শরীরের অন্যান্য অংশের

মতই এগুলোর গড়নও ভারী সুন্দর, আয়নায় দেখার সময় নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে সে।

দূরে তাকাতে রেখাটা দেখতে পেল সুসমি, যেখানে কৃষ্ণসাগরের মধু আর ভূমধ্যসাগরের বাদামী রঙ মিলিত হয়েছে; এই মিলন দেখে নতুন করে আবার অপরাধবোধটা জাগল তার মনে। সত্যি কি মাত্র এই অল্প ক'দিন আগে অন্য এক সূর্যের নিচে বসে অন্য আরেক পুরুষের কথা ভেবেছে সে?

তারপর ভাবল, এখন যার কথা ভাবছি, স্বার্থ উদ্ধারের পর তাকে আমি খুন করব। তাহলে, এটা জানা সত্ত্বেও, কেন আমার মনে অপরাধবোধ খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধবে?

কারণ লোকটা আমাকে আকৃষ্ট করে।

না! এ অন্যায়! হুতাওকে আমি ভালবাসতাম। সে-ই আমার প্রথম প্রেম।

হুতাও, আমি তোমাকে ভুলব না। তুমি নিশ্চিত থাকো, প্রতিশোধ আমি নেবই। তোমাকে যে খুন করেছে, আমি নিজের হাতে তাকে খুন করব। অফিশিয়াল নির্দেশ?

ঠিক আছে, নির্দেশ লঙ্ঘনের দায়ে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হলে ঝুলব।

ঝুল-বারান্দা থেকে বড়সড় বেডরুমে চলে এলো সুসমি, স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে দিল এয়ার কন্ডিশনিং-এর ঠাণ্ডা ভাবটা যাতে বজায় থাকে। সন্দেহ নেই যে এই হিলটপ থ্রী স্টার স্যুইটের দৈনিক ভাড়া তার মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি। কোন আলোচনা করেনি, নিজের পকেট থেকে স্যুইটের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছে রানা। সুসমি অবশ্যই হিসাব রাখছে কোথায় কি খরচ হচ্ছে। কারও দয়া বা উদারতার সুযোগ নিতে রাজি নয় সে, বিশেষ করে রানার মত একজন খুনী শত্রুর।

বেডরুমের আয়নাটা বিশাল, সেদিকে চোখ পড়তে এবং সেই মুহূর্তে রানার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আঁতকে ওঠার মত

আওয়াজ বেরিয়ে এলো সুসমির গলা থেকে। এয়ারকন্ডিশনিং-এর ঠাণ্ডাটুকু শরীরে এত ভাল লাগছিল যে ভুলেই গেছে তার পরনে কিছু নেই। লজ্জা পেল সে, যেন যতটা না নিজেকে তারচেয়ে বেশি অন্য কাউকে দেখাতে চাইছে। ডাবল বেড থেকে ওয়ান পীস বেইথিং কস্টিউম তুলে দ্রুত পরে নিল, ভয় পাচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে রানা ফিরে আসতে পারে। আয়নায় তাকিয়ে আবার নিজেকে দেখল সে। ধীরে ধীরে বিরূপ ভাব জাগছে নিজের সম্পর্কে। এই কস্টিউম তার শরীরের তুলনায় বেশ ছোট। তাই নগ্ন অবস্থার চেয়ে এটা পরার পর আরও বেশি সেক্সি দেখাচ্ছে তাকে। এখন যদি রানা তাকে দেখে, ভাববে আমি তাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করছি।

ওয়ার্ড্রোব খুলে নতুন এক সেট ড্রেস বের করে বাথরূমের দিকে এগোল সুসমি, পাশ কাটাল রানা যে ছোট বেডটায় শোয়। হঠাৎ করে ভাবল, রানা কি খেয়াল করে যে রোজ সকালে মেইডরা কেউ আসার আগেই বিছানাটা ঠিকঠাক করে রাখে সে? নিজের কাছে স্বীকার করতে হলো এক ধরনের নারীসুলভ গর্ব এই কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। সে চায় না কেউ ভাবুক, স্বামী তাকে এতটাই অপছন্দ করে যে নিজের বিছানায় শুতে পর্যন্ত দেয় না। তারমানে অবশ্য এই নয় যে হাজার বছর এভাবে একসঙ্গে থাকলেও একবার তার পাশে শোবে সে। দু'জন একসঙ্গে আছে শুধুমাত্র দেশের স্বার্থে। সে সুন্দর, সে স্মার্ট···হ্যাঁ, তো কি হলো? না, মানে, অতি ভদ্রলোকও, তাই না–পরপর কয়েকটা রাত এক ঘরে কাটল, কই, তোমাকে তো একবারও বিরক্ত করেনি, করেছে? ভয়ে, ভয়ে! আমার আচরণেই বুঝে নিয়েছে, তার পালা পড়েছে বিষধর নাগিনীর সঙ্গে। শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা, ছোবল তাকে খেতেই হবে।

কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ এমনই যে মুহূর্তের জন্যেও তাকে তুমি ভুলে থাকতে পারছ না।

না, পারছি না। সেজন্যেই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে আমি খুন করতে চাই।

মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জি, একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক, আরেকজন চীনা বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক, ছদ্মবেশের গুণে রানা ও সুসমির চেহারার সঙ্গে মিল খুব সামান্যই, সার্ডিনিয়ার উত্তর-পুব উপকূলের সান্তা তেরেসা দি গালুরা বন্দর থেকে লঞ্চযোগে রওনা হয়ে কয়েকটা দ্বীপ ঘুরে আপাতত দিন কয়েক বিশ্রামের জন্যে উঠেছে ইজলা কাপরেরা দ্বীপে। কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার মাঝখানে ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো ছোট দ্বীপের একটা এটা, পর্যটকদের জন্যে অন্যতম স্বর্গ বলে খ্যাতি আছে।

নিরো ওরফে চৌধুরীর মেরিন রিসার্চ ল্যাবরেটরি যত দূর বোঝা গেছে ঝাপসা ও পাথুরে কর্সিকান উপকূলের কোথাও হবে। মাত্র মাইল কয়েক দূরে ওই উপকূল সাগর থেকে যেন অকস্মাৎ খাড়া হয়েছে। কবীর চৌধুরী ওই উপকূল-রেখার বেশ বিস্তৃত একটা অংশের মালিক। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে ট্যুরিস্ট বা অন্য কোন ভিজিটর ওদিকে যাবার অনুমতি পায় না। ধনকুবের ভদ্রলোক তাঁর গোপন হাবেলী থেকে কদাচ বের হন, আসা-যাওয়া করেন হেলিকপ্টার নিয়ে।

শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এসে ঢিলেঢালা একটা কটন শিফ্‌ট্‌ পরল সুসমি, ওটার ঝুল তার সুগঠিত উরুর মাত্র অর্ধেকটা ঢাকতে পারল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে, ভাবল হোটেলের প্রাইভেট সৈকত থেকে একবার ঘুরে আসবে কিনা। কিন্তু একা যেতে হবে ভাবতেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। আর ঠিক তখনই অচেনা একটা হর্ন শুনতে পেল। মোটরগাড়ির হর্ন, তবে আওয়াজটার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, প্রায় এক ছুটে ঝুল-বারান্দায় আবার বেরিয়ে আসতে হলো তাকে।

প্রায় বল্লম আকৃতির টকটকে লাল ছোট একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। নিজের অজান্তে সুসমির মন ভাল হয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁটে বাঁকা হাসি টানল।

'আমাদের ঘুরে বেড়ানোর একটা ব্যবস্থা করা গেছে, ডার্লিং,' নিচ থেকে বলল রানা। 'ইটালিয়ান কার—লোটাস এসপ্রিট, উইথ মডিফিকেশন। ট্রায়াল ড্রাইভে তোমাকে রাজি করাতে পারি, ম্যাডাম? চমৎকার স্পেসিফিকেশনঃ ফাইভ-স্পীড ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স, এইট-অ্যান্ড-আ-হাফ-ইঞ্চ ডায়াফ্রাম-স্প্রাঙ হাইড্রলিক্যালি অপ্পারেটেড ক্লাচ—'

'আমি নামছি,' বলল সুসমি; এ ঠিক জবাব নয়, বাধা।

নিচে নামতে মাত্র দু'মিনিট লাগল তার। সচেতন, গাড়িটা এরই মধ্যে গেস্ট ও হোটেল স্টাফের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'এত দামী গাড়ি আমাদের না হলেও চলত,' বলল সে। 'এলো কোত্থেকে?'

'মার্কিন ট্যাক্সদাতাদের অবদান। আমাদের কাজের সুবিধের জন্যে আমেরিকার বিশেষ উপহার। স্বার্থ যেখানে অভিন্ন...'

'নিশ্চয়ই অনেক পেট্রল খাবে?' বাধা দিল সুসুম।

'এ-সব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল রানা, 'সব খরচ ওদের।' চট করে চারদিকটা দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল ওদের কথা কেউ শুনছে না। 'শোনো, তোমাকে একটা ভাল খবর দিই। ডানকিলাস নিরো তার এস্ট্যাব্লিশমেন্টে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

'হোয়াট! হাউ?'

শ্রাগ করল রানা। 'নিশ্চয়ই রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্টের লেখা চিঠিটাই জাদু দেখিয়েছে। রিসেপশন ডেস্কে একটা নোট পেলাম। আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে কিছু একটা পাঠাচ্ছে ওরা।'

'জানতে পারি এই প্রেসিডেন্ট ভদ্রলোক কি লিখেছিলেন?'

'এই যে—আমি একজন বিশিষ্ট মেরিন বায়োলজিস্ট, ছুটিতে

এই এলাকায় বেড়াতে আসছি, এবং দেখা করে সম্মান জানাবার সুযোগ পেলে বর্তে যাব।'

মৃগনয়না সুসমি বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো। 'কিন্তু মেরিন বায়োলজি সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'এখানে অত জায়গা কোথায় যে বিস্তারিত সব জানব,' মাথায় একটা টোকা মেরে বলল রানা। 'বিশেষজ্ঞরা আলোচনার সময় খুঁটিনাটি পর্যায়ে খুব কম নামেন। যেটুকু মুখস্থ করেছি তা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।' শুকনো একটু হেসে কব্জির রোলেক্সে চোখ বুলাল। 'তোমার বোধহয় ড্রেসটা বদলে আরও বড় ধরনের কিছু পরা উচিত। ওদিকে বাতাস খুব বেশি হবারই সম্ভাবনা।'

'আমার তো মনে হচ্ছে টর্নেডোর মধ্যে পড়তে যাচ্ছি,' বলল সুসমি, থমথমে চেহারা।

তার সোনাবরণ কোমল হাতটা ধরল রানা। 'যদি দেখো ভুল করছি বা ধরা পড়ে যাচ্ছি, তাকে তোমার বিয়ের আঙটিটা দেখিয়ো।'

'কি লাভ দেখিয়ে? আমি বিধবা হয়ে যাব, তাই সে তোমাকে মুক্তি দেবে?'

'দিতে পারে।'

'তোমরা বাঙালীরা এত মহৎপ্রাণ?' খোঁচা মারল সুসমি, মনে করিয়ে দিল যে সে ভোলেনি কবীর চৌধুরীও রানার মত একজন বাঙালী।

রানার জবাবটাও যথোপযুক্ত হলো বলা চলে। 'কুচক্রী সব দেশেই আছে, সুসমি—অবশ্য দুনিয়াজোড়া কুখ্যাতি সবাই অর্জন করতে পারে না। চীন বড় দেশ, তার চার কুচক্রীর কথা কে না জানে। বাংলাদেশ ছোট, তাই কুখ্যাত কুচক্রীও আমাদের মাত্র ওই একজনই।'

এক ঘণ্টা পর। শক্তিশালী একটা স্পীডবোটের ডেকে দাঁড়িয়ে

রয়েছে রানা, জেটিটাকে দ্রুতবেগে পিছিয়ে যেতে দেখছে। মাথায় লাল, নীল ও সবুজ সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়েছে সুসমি, ফলে সুসজ্জিত চীনামাটির পুতুলের মতই লাগছে তাকে; দাঁড়িয়ে আছে রেইলিং ধরে রানার পাশে, দৃষ্টি যেন হারিয়ে গেছে খোলা সাগরের বহু দূরে কোথাও। এবারই প্রথম নয়, রানা ভাবছে এত সুন্দর সুন্দর ড্রেস কোত্থেকে পায় সুসমি, কেউ তাকে বাছাই করে দেয়, নাকি নিজেই খুঁজে বের করে। এই মুহূর্তে সুতি যে জ্যাকেটটা পরে আছে, নিশ্চয়ই ওর শরীরের মাপ নিয়ে তৈরি করা, সুগঠিত নিতম্ব ইচ্ছা করেই ঢাকার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নিখুঁত মাপে কাটা ট্রাউজারের পায়া গোড়ালির নাগাল পায়নি, প্রান্তগুলো ভাঁজ করে একটু ওপর দিকে তোলা। প্ল্যাটফর্ম স্যান্ডেল জোড়া সরু, তলায় ব্যবহার করা হয়েছে কর্ক।

তুমি হেরে যাচ্ছ কেন? হঠাৎ, বলা যায় বেমক্কা, প্রশ্নটা জাগল রানার মনে। সুন্দরী একটা মেয়ে একই ঘরে তোমার পাশের বিছানায় রাত কাটায়, তুমি তার দিকে হাত বাড়াও না! মেয়েটা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমায় না। শুধু ছটফট করে, শুধু ছটফট করে। তার এই সংকেত, এই ভাষা তুমি বোঝো না?

নিজের আচরণ নিজেকেই ব্যাখ্যা করছে রানা। এটা হার বা জিতের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন শত্রুতার বা বন্ধুত্বের। বন্ধু রাষ্ট্রের একজন এজেন্টের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ওর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নিনা সুসমি ওকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেনি। ওর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে মেয়েটা, ব্যাপারটা এরকম সহজ ও হালকাও নয়। ওর প্রতি কি কারণে কে জানে সুসমির মনে প্রচণ্ড আক্রোশ আর ঘৃণা জমা হয়ে আছে। ওর হাতে তিনজন চীনা এজেন্ট মারা গেছে, এটাই হয়তো কারণ। কিন্তু রানার মন তা মেনে নিতে চায় না। ওর ধারণা, এই ঘৃণা ও আক্রোশের পিছনে আরও বড় কোন কারণ আছে। সেই কারণটা যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে সুসমিকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা না করে

ওর কোন উপায় নেই। আর বিছানায় সুসমি যৌবন জ্বালায় নয়, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রানার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না এই দুঃখে ছটফট করে। এই মিশন সফল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এ-ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই তাকে মেনে চলতে হচ্ছে।

রানার মনোযোগ এখন স্পীডবোটের ক্রুদের ওপর। এমন ভোঁতা চেহারা আর শক্ত শরীর খুব কমই দেখেছে ও। তিনটে নাকই এমন থ্যাবড়া, যেন ওগুলো দিয়ে তারা দরজা খুলতে অভ্যস্ত। এরা কি কুখ্যাত কর্সিকান গুণ্ডা বাহিনীর সদস্য? নাকি বহু বছর ধরে গণপিটুনি খেতে অভ্যস্ত নিশিকুটুম্ব? সুসমিকে নিয়ে ও বোটে চড়ার পর তিনজনের একজনও কোন কথা বলছে না। সবাই ক্যানভাস ট্রাউজার আর টি-শার্ট পরে আছে, টি-শার্টের বুক পকেটের গায়ে সী ফেয়ারার শিপিং লাইনের প্রতীক চিহ্ন লেজের ওপর খাড়া মাছ সেলাই করা।

বোট বে থেকে বেরিয়ে আসার পর বাতাসের তেজ বাড়ল, ঢেউগুলো এদিকে বেশি চঞ্চল। হেলমসম্যান স্পীডবোটের গতি বাড়িয়ে দিল, ঢেউগুলোকে কাবু করে এগিয়ে যাবার এটাই প্রচলিত পদ্ধতি। এদিকে ডুবো পাহাড় আছে বিস্তর, তবে রানা আশা করল হেলমসম্যান এদিকের জলপথে নিশ্চয়ই আসা-যাওয়া করতে অভ্যস্ত, কাজেই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। আচ্ছা, ওদের এই বোট ছাড়া এদিকের জলপথে আর কোন জলযানই চোখে পড়ছে না কেন? ওরা ছাড়া প্রাণী বলতে এখন দু'পাশের খাড়া পাহাড় প্রাচীরের চূড়া ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া দু'চারটে সামুদ্রিক পাখি। অবশ্য পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা এবড়োখেবড়ো ও কুৎসিত দর্শন পাথরগুলোর ওপর একবার কয়েকটা কুমীরকে রোদ পোহাতে দেখা গেল। স্বভাবতই রানার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। এত দূরে, এরকম একটা দুর্গম জায়গা কেন পছন্দ করল কবীর চৌধুরী? তবে উত্তরটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। গোপনীয়তার

স্বার্থে। মেরিন রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু করছেন বিজ্ঞানী মহাশয়।

অনেক আগেই ওদের পিছনে কাপ্রেরা দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেছে। হেডল্যান্ড ঘুরে ছুটছে স্পীডবোট, পিছনে সাদা ফেনার রেখা ফেলে যাচ্ছে। চারদিকে এখনও কোথাও জনবসতি বা দালান-কোঠার ছায়ামাত্র চোখে পড়ছে না। শুধু পাথুরে হেডল্যান্ড বা অন্তরীপ। কোন কোন পাহাড় প্রাচীরের ফাটলের ভেতর থেকে গুল্ম বা ঝোপ উঁকি দিচ্ছে। অবাক কাণ্ড, এখানে মেরিন রিসার্চ ল্যাবরেটরি কোথায় থাকতে পারে? এদিকে সেরকম জায়গাই তো নেই।

কিন্তু তারপরই, হঠাৎ করে, দেখতে পেল ওরা। স্পীডবোট দ্রুত স্টারবোর্ডের, অর্থাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল, একজোড়া পাথুরে পাঁচিলের ফাঁক খুলে দিল অকৃত্রিম একটা হারবার-এ ঢোকার পথ। এই হারবার একটা কাঠামোকে ঘিরে রেখেছে, সেটা পানি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু।

প্রথম দর্শনে মনে হলো ওটা একটা ড্রিলিং রিগ, মাথায় কাঁচ মোড়া গম্বুজ সহ। সবগুলো কোণে বিশাল আকৃতির স্ট্রেস্‌ড্-স্টীল কলাম; গম্বুজের সামনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছে অসংখ্য ক্যাটওয়াক, টিউব আকৃতির এলিভেটর, প্যাঁচানো সিঁড়ি ইত্যাদি। গম্বুজের মাথায় রেডিও এরিয়াল আর রাডারশীল্ড। কাঁচের ভেতর আরও বহু কিছুর সঙ্গে একটা বেল ওয়াইইউএইচ-আইবি কমপাউন্ড রিসার্চ হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে বাতাস টানল রানা। একটা কিছু বটে। তাই বলে মেরিন রিসার্চ ল্যাবরেটরি? দেখে বরং কোন সামরিক ফ্যাসিলিটি বলে মনে হচ্ছে। সুসমির দিকে তাকাল ও। তার গম্ভীর চেহারা আভাস দিল রানার ধারণার সঙ্গে একমত সে।

'অদ্ভুত। সুন্দর। সত্যি দেখার মত। তুমি কি বলো, ডার্লিং?'

সুসমি লক্ষ করল ক্রুদের একজন গভীর মনোযোগ দিয়ে

ওদের কথা শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। গাম্ভীর্য খসে পড়ল, হাসি মুখে বলল, 'সত্যি সুন্দর, হানি। তবে আমি কিন্তু আশা করিনি যে এটা একেবারে সাগরে হবে।'

'নিরুপদ্রবে কাজ করার জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হতে পারে না।' পাথুরে তীররেখা ধরে তল্লাশী চালাচ্ছে রানার দৃষ্টি। উইঞ্চ সহ একটা র‍্যাম্প, তেলের কিছু ড্রাম আর তিনটে প্রিফ্যাব্রিকেইটেড হাট বা কুঁড়ে চোখে পড়ল। ওদিকে সম্ভবত ক্রুরা বসবাস করে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার ল্যাবরেটরির দিকে তাকাল ও। টাওয়ার ও ব্রিজ থেকে দশ কি বারোজন লোক তাকিয়ে আছে। দু'তিনজনের হাতে অটোমেটিক কারবাইন।

একটা পনটুন জেটিতে ভিড়ল ওদের বোট। একজন ক্রু লাইন হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নামল সেটায়। রানার দৃষ্টি নেমে গেছে সবুজাভ ও প্রায় স্বচ্ছ পানির গভীরতায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত; সাগর যেখানে ধাতব স্তম্ভ, পিলার ও অবলম্বনের চারপাশে আলোড়িত হচ্ছে, ছোট মাছের ঝাঁক যেখানে নিশ্চল ভেসে আছে, এ-সবের নিচে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে রানা সেটাকে একটা ব্যালাস্ট ট্যাংকের আউটলাইন ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। এরকম একটা স্থায়ী কাঠামোয় কি কাজে আসবে ওটা?

'সিনর!' সুরটা প্রায় আদেশের মত, জেটির দিকে বাড়ানো হাতের ভঙ্গিমাতেও জরুরী তাগাদার ভাব স্পষ্ট। বাচনভঙ্গিতে একটা টান আছে, রানা নিশ্চিত সেটা ইটালিয়ান নয়।

'দেখে পা ফেলো, ডার্লিং। জায়গাটা খুব পিচ্ছিল।' নিজের হাতটা সুসমিকে ধরতে দিল রানা, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল মাথার ওপর বোল্ট-এ মরচের সরু দাগ ফুটে রয়েছে। ছোট্ট এই ঘেরা খাঁড়িতেও রোদ-বৃষ্টির প্রভাব কাজ করে তাহলে। অথচ ভরদুপুর ঘনিয়ে এলেও আকাশ ছোঁয়া পাহাড় প্রাচীর সূর্যকে এখনও আড়াল করে রেখেছে।

এক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ বিশাল ফ্যাসিলিটির অভ্যন্তরে পৌঁছে

দিল ওদেরকে। ক্রুদের একজন হাত তুলে দেয়ালের একটা বোতামে চাপ দিল। দরজা খোলার পর রানা বুঝতে পারল এটা একটা ছোট এলিভেটর। ইঙ্গিতে সেটাতে সুসমিকে উঠতে বলছে ও, এই সময় ক্রুদের একজনকে মাথা নাড়তে দেখল।

'সিনর নিরো আপনার সঙ্গে একা দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন,' বলল লোকটা। 'সিনোরিনা আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

রানা ভাব দেখাল কোন ধাক্কাই সে খায়নি। 'আচ্ছা। বুঝেছি। ওকে তোমরা চারদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাতে চাও। দারুণ আইডিয়া। যাও, ডার্লিং, সময়টা উপভোগ করো। তবে মাছ দেখে সময় নষ্ট কোরো না, ও-সব তোমার অনেক দেখা আছে।'

এলিভেটরে চড়ার সময় রানা কি সুসমির চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল? বোধহয়। স্বাভাবিকও। ও নিজেও তো আড়ষ্ট বোধ করছে। পালস রেট বাড়তির দিকে। গলার পিছন দিকটায় শুকনো এমন একটা ভাব, ঢোক গিলতে ইচ্ছে করছে। এলিভেটর নিঃশব্দে খসে পড়ল, থামল একটা ঝাঁকি দিয়ে। হিস হিস শব্দ করে খুলে গেল দরজা। বাইরে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। উজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরীয় আলো থেকে এ যেন একটা অন্ধকার অডিটরিয়ামে এসে পড়া। পিছনে ক্লিক করে স্লাইডিং ডোর বন্ধ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল রানা। আশপাশে কোথাও নিরো বা ছদ্মবেশী কবীর চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে না। নিস্তব্ধতা এখানে পায়ের নিচের গভীর কার্পেটের মতই চেপে বসে আছে। তবে নিস্তব্ধতার ভেতরও নড়াচড়া আছে।

উজ্জ্বল রঙিন নড়াচড়া। ষাট ফুট লম্বা কামরার দু'দিকেই আর্মারড্-গ্লাস দিয়ে অ্যাকুয়েরিয়াম তৈরি করা হয়েছে। সুকৌশলে ডিজাইন করা উৎস থেকে বিচিত্র আলোর টানেল বহুবর্ণ ঝাঁক ঝাঁক মাছকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। জ্যান্ত, সচল ওয়ালপেপার। ধীর পায়ে কাছাকাছি দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, মুখোমুখি হলো চেরি-পিঙ্ক কালারের একটা স্ন্যাপার-এর, কাঁচে

নাক ঠেকিয়ে অলস ভঙ্গিতে মুখটা খুলছে আর বন্ধ করছে, যেন আদর করে চুমো ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর উদ্দেশে। এক ঝাঁক অ্যাঞ্জেল ফিশ আলোর একটা ঝলকের মত সামনে দিয়ে ছুটে গেল। ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। কি আশ্চর্য একটা আইডিয়া। এই আকারের একজোড়া অ্যাকুয়েরিয়াম তৈরি করে মাছ দিয়ে সাজাতে না জানি কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

'কোন দুঃখে আমরা মহাশূন্য জয় করতে যাই, যেখানে আমাদের নিজেদের দুনিয়ার দশভাগের সাতভাগই অদেখা রয়েছে?'

প্রথমে রানা ভাবল আওয়াজটা কোন লাউডস্পীকার সিস্টেম থেকে বেরুচ্ছে। বড়সড় মিউজিয়ামের ভেতর গাইডের রেকর্ড করা ক্যাসেট বাজলে যেমন গমগমে অথচ যান্ত্রিক একটা শব্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, এ-ও সেরকম। তারপর ঘুরতেই দেখতে পেল সচল ঝাঁক ঝাঁক মাছের সামনে দীর্ঘদেহী একজন মানুষের আকৃতি ফুটে আছে। এমন হঠাৎ ও নিঃশব্দ আগমন রীতিমত অস্বস্তি জাগিয়ে তুলল মনে। রানা অনুভব করল ওর ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

'মিস্টার নিরো? কেমন আছেন? আমি প্রতুল চ্যাটার্জি। এভাবে অভ্যর্থনা জানানোয় আমি সত্যি মুগ্ধ। আশা করি আপনার রুটিনে বড় কোন ব্যাঘাত ঘটাইনি? আসলে এই এলাকায় আসব অথচ আপনার মত স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করব না, এটা কি হয়!' বাড়ানো হাত ধরে মড়ার আঙুলের মত ঠাণ্ডা লাগল রানার। এ লোককে রানা চেনে না। হাত বাড়ানো থেকে শুরু করে নড়াচড়ায় একটা আড়ষ্ট ভাব আছে, এটুকুই শুধু কবীর চৌধুরীর সঙ্গে মেলে। মুখটা অস্বাভাবিক গোলগাল, শিশুর মত সরলতা চোখে-মুখে। হয়তো আলো-আঁধারির কারসাজি, তবে মুখের প্রতিটি অংশ এত অস্পষ্ট, যেন ডিমের খোসার ওপর ওয়াটার কালার দিয়ে সব আঁকা হয়েছে। এ কি সত্যি সেই নিষ্ঠুর

পাষাণ কবীর চৌধুরী, যার অতি উর্বর অথচ বিকৃত মস্তিষ্ক মানবজাতির কল্যাণের নামে বারবার শুধু অভিশাপ ডেকে আনতে চায়?

'সামুদ্রিক অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।' ছদ্ম পরিচয় পোক্ত করার জন্যে অ্যাকাডেমিক প্রসঙ্গের আশ্রয় নিচ্ছে রানা। 'তবু, আপনার অপারেশনের বাকিটুকুও যদি এই মাত্রায় বিশাল হয়, ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থাও আশা করি প্রস্তুত রেখেছেন। বলুন দেখি। কি দেখে এখানে আপনি ল্যাবরেটরি বানাতে উৎসাহী হলেন?'

ছদ্মবেশী কবীর চৌধুরীর চোখ দুটো থেকে যেন একজোড়া লেযার বীম বেরুচ্ছে, রানার চোখের মণি ভেদ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরম হলুদ পদার্থের পরতে পরতে। 'আপনি সম্ভবত লক্ষ করেছেন, যে-ন্যাচারাল হারবারে আমরা রয়েছি সেটা তৈরি হয়েছে তিন হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে বেরিয়ে আসা লাভায় তৈরি একটা কড়াই বা গামলার ভেতর। ভলক্যানিক বৃত্ত-পরিধির অংশে ভিসুভিয়াস ও এটনা আগ্নেয়গিরি রয়েছে, আমরা আছি তার উত্তর দিকটায়। আমি শেষ পর্যন্ত এমন কিছু হারবার গেইট বানাবার আশা রাখি যাতে লাভায় তৈরি গোটা এলাকাটা ম্যারিটাইম-এর প্রয়োজনে উন্নত করা সম্ভব হবে।'

'বিস্ময়করই বলতে হবে,' রানার মন্তব্য। 'কাছাকাছি কোস্টা স্মেরালডা দ্বীপ রয়েছে, ওখানে সব রকম সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যেত, সে-সব ছেড়ে আপনি...'

'আমি নিজের সুযোগ-সুবিধে নিজেই তৈরি করে নিই, মিস্টার চ্যাটার্জি।' কবীর চৌধুরীর চোখে নিষ্প্রভ আলোর আভা। 'আমি যখন তৈরি করি, ওগুলো হয় ইউনিক। সেজন্যেই বাণিজ্যিক দিক থেকে অবিশ্বাস্য সাফল্য উপভোগ করি আমি।' হঠাৎ করে অ্যাকুয়েরিয়ামের দিকে হেঁটে এলো সে, টোকা দিল কাঁচে। 'বলুন। এই প্রজাতির নাম কি?'

রানা অনুভব করল শক্ত বরফ হয়ে গেছে পেট। অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন, তার সঙ্গে গলার স্বরে আক্রমণাত্মক ধার, হকচকিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ যেন চাকরির ইন্টারভিউ দেয়ার সময়, যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তাঁর উঠে দাঁড়ানোর ফলে মেঝেতে চেয়ারের শব্দ শুনতে পাওয়া। কাঁচের দিকে এগোচ্ছে রানা, অনুভব করল মুখের ভেতর কেউ যেন ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে। কবীর চৌধুরী গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছে ওকে। কি ছাই বলবে ও? বলবে চশমাটা ভুলে হোটেলে রেখে এসেছে, আর ওটা ছাড়া সে অন্ধ? ইস্, কি হাস্যকর আর খোঁড়া একটা অজুহাতের মত শোনাবে! ট্যাংকের দিকে তাকাল। ও আল্লাহ্! একি সত্যি? আবার তাকাল রানা। কি সাংঘাতিক দৈব! এই মাছ ওর বস্ রাহাত খানের ড্রইংরুমের সল্ট-ওয়াটার অ্যাকুয়েরিয়ামে একজোড়া দেখেছে ও। উচ্চারণ করতে দাঁত প্রায় ভেঙে যায়, ল্যাটিন নামও ওর মনে আছে।

'মিস্টার অপ্রতুল চাটুজ্যে?' নামটা বিকৃত করার মধ্যেও তাৎপর্য নিহিত, কবীর চৌধুরী শ্লেষমাখা দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে।

রানার মনে এবার অন্য রকম একটা আতংক ডালপালা গজাতে শুরু করল। কবীর চৌধুরী ওকে চিনে ফেলেছে নাকি?

'প্যাকিপ্যানচাক্স প্লেফেয়ারি, বলছেন?' রানা শান্ত ও স্বাভাবিক, এতটুকু উৎসাহ বা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। 'দা থিন প্যানচাক্স।' কাঁচের গায়ে আঙুলের গিঁট দিয়ে টোকা দিল। 'সুখী ও সুন্দর, কি বলেন?' ঘুরে একটা গ্লাস কেইস-এর দিকে এগোল ও, ভেতরটা আলোকিত। 'এটা কি?'

'এইটা মনে হয় আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে, মিস্টার অপ্রতুল...'

'নামটা প্রতুল, মিস্টার নিরো,' শুধরে দিল রানা; হাসছে, যেন জানে হাজারটা কাজে ব্যস্ত সফল একজন বয়স্ক মানুষ এ-ধরনের মৃদু স্মৃতিভ্রংশের শিকার হতেই পারেন।

'দুঃখিত, খুবই দুঃখিত, মিস্টার প্রতুল,' সুরটা আন্তরিকই মনে হলো। আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'যা বলছিলাম। আমি একটা প্ল্যান তৈরি করছি। এ আমার এমন প্রজেক্ট, বলতে পারেন হৃৎপিণ্ডের পাশেই স্থান দিয়েছি।' তার গোল সরল চেহারায় আশ্চর্য একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল। কণ্ঠস্বরে হুমকির প্রচ্ছন্ন সুর। সারা মুখে ভেজা ভেজা চকচকে একটা ভাব ফুটছে। অর্থাৎ ঘামছে সে।

কেইসটার ভেতর তাকানোয় নিজের ওপর খুশি রানা। ভেতরে পরিষ্কার দেখতে ও চিনতে পারা যাচ্ছে সমুদ্রের তলা, সেই তলায় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত কাঁচ-মোড়া গম্বুজ আকৃতির ছাদ সহ বিল্ডিংও রয়েছে। এ যেন একটা গোল্ডফিশ গামলায় জীবনযাপন, ভাবল রানা। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে গোটা কাঠামোর ঠিক মাঝখানে তৈরি ল্যাবরেটরি। পানির নিচে নাগরিক জীবন? একটু হয়তো কষ্টকল্পনা, তবে অসম্ভব নয়। রানা ঠিক বুঝতে পারছে না ঠিক কি ধরনের মন্তব্য যথার্থ হবে। 'লোকজনকে এখানে আপনি কত দিনের জন্যে রাখতে চান?'

কবীর চৌধুরীর ভাসা ভাসা চোখ যেন জমাট বরফের দুটো টুকরো হয়ে গেল। 'অনির্দিষ্টকাল, মিস্টার প্রতুল।'

কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ ছিল, তবে রানা জবাব দেয়ার আগেই অদৃশ্য একটা টেলিফোন বেজে উঠল।

'এক্সকিউজ মি, মিস্টার চ্যাটার্জি।' এলিভেটরের দিকে হেঁটে এলো কবীর চৌধুরী, ওটার পাশের দেয়ালে হাত তুলে বোতামে চাপ দিতে গোপন একটা কাবার্ড খুলে গেল।

টেলিফোনের রিঙ থামতে দূর প্রান্তের অ্যাকুয়েরিয়ামের দিকে তাকাল রানা। কাঁচ ঘেঁষে জটিল একটা আকৃতি, বেশ বড়, প্রায় স্যাৎ করে চোখের পলকে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে গেল। এত বড় অক্টোপাস্? একেকটা শুঁড় বা বাহু বারো ফুটের কম নয়। রানা সামনে বাড়ল, ভয়াল ও কুৎসিত দর্শন হিংস্র

অষ্টভুজ জন্তুটা ফিরে আসছে কাঁচের দিকে। বাহুগুলো ছড়িয়ে দিল, যেন রানাকে পেঁচিয়ে ধরবে, পারছে না কাঁচটা পাঁচিল হয়ে বাধা দেয়ায়। এতবড় অক্টোপাস্ আগে কখনও দেখেনি রানা। ওর জানাও ছিল না যে এরকম আকার হয়।

ওর দিকে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে অক্টোপাস্টা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, ঝাপসা হতে হতে এক সময় বহু দূরে মিলিয়ে গেল। রানার মনে প্রশ্ন জাগল, অ্যাকুয়েরিয়ামটা আসলে কত বড়? এর শেষ কোথায়? কিছু পাথর দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর মাঝখানে ফাঁকগুলো যেন টানেলে ঢোকার মুখ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় একটা টানেল থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এলো। বড় আকারের একটা স্পাইডার-ক্র্যাব, একটা সাঁড়াশি দিয়ে কি যেন ধরে আছে। ভাল করে দেখার জন্যে সামনের দিকে একটু ঝুঁকল রানা। স্পাইডার-ক্র্যাব মানুষের একটা হাত টেনে আনছে, কব্জি থেকে কাটা। কাঁচা মাংস দেখে গা রিরি করে উঠল। লম্বা নখ সহ একটা বাদে বাকি চারটে মেয়েলি আঙুল অক্ষত। অনেক কষ্টে বমির ভাব ঠেকাচ্ছে রানা।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার চ্যাটার্জি।' রানার পিছনে একটা ভূতের মত হাজির হলো কবীর চৌধুরী। সে কি হাতটা দেখেছে? ঘুরল রানা, প্রতিপক্ষের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে যতটা পারা যায় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। 'এমন একটা ব্যাপার, এই মুহূর্তে আমার জরুরী মনোযোগ দাবি করে। আশা করি সাক্ষাৎকারটা এখানেই শেষ করায় ব্যাপারটাকে আপনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর কিছু না হোক, গায়ে এক ফোঁটা পানি না লাগিয়েও সমুদ্রের তলা থেকে বেড়িয়ে গেলেন।'

'না-না, আমার প্রাপ্তি আরও অনেক বেশি।' রানা অনুভব করল ওর পা দুটো ওকে এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ওগুলোর যেন নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি এবং কাণ্ডজ্ঞান আছে। 'আপনার মত একজন মহারথীর সাক্ষাৎ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

তাছাড়া, আপনার একটা বিচিত্র প্ল্যান সম্পর্কেও ধারণা পেলাম।'

কবীর চৌধুরী একটা বোতামে চাপ দিতে এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। 'গুডবাই, মিস্টার প্রতুল চ্যাটার্জি। আপনার কর্ম-তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করার কোন সুযোগ আমি পাইনি, তবে কামনা করি নিজ পেশায় আপনি সফল হন।'

দৃঢ় একটা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখানে আজ যা দেখলাম, আমার তৎপরতা দ্বিগুণ জোরাল করার তাগাদা অনুভব করছি। ধন্যবাদ। গুডবাই, মিস্টার নিরো।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরও সেটার দিকে চিন্তিতভাবে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী।

প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড একদৃষ্টে চেয়ে থাকার পর ওখান থেকে সরে এসে অ্যাকুয়েরিয়ামের সামনে দাঁড়াল সে, শেষবার ঠিক যেখানে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে বদলে ফেলা কবীর চৌধুরীর নতুন চেহারায় সহজে কোন ভাব ফোটে না। তবে এই মুহূর্তে ভুরুর নিচে কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্ত ও অনুগত ভঙ্গিতে ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরার লেন্স ঘুরে ঘুরে তার প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে, অপেক্ষা করছে নিশ্চিত ডাক শোনার জন্যে। এখনও ট্যাংকের মেঝেতে চোখ, কবীর চৌধুরী মুখ খুলল। 'জানোয়ারকে পাঠিয়ে দাও। আরও কাজ সারতে হবে।'

বারো

'আরাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।•

'শারীরিক, হ্যাঁ। মানসিক, কম।' সুসমির দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ। 'এটা ঠিক ফাস্ট স্পোর্টস-কারে চড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় নয়। ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা একটা মিশন নিয়ে এখানে এসেছি।'

গাড়ির গিয়ার-স্টিক ফার্স্ট-এ ঠেলে দিল রানা। 'সিট বেল্ট ভাল করে বেঁধে নাও। আমরা কাজেই যাচ্ছি, তবে সুযোগ যখন আছে সময়টা উপভোগ করো।'

'কাজে যাচ্ছি? কোথায়?'

'কবীর চৌধুরীর ল্যাবটা আরও কাছ থেকে দেখতে চাই আমি,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে হোটেল থেকে একটা বোট নিলেই পারতাম আমরা।'

'তাতে বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হত,' ধৈর্য না হারিয়ে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করছে রানা। 'আমার বিশ্বাস, হোটেলে অন্তত দু'জন লোক আছে কবীর চৌধুরীর। ম্যানেজমেন্টে তার বন্ধু থাকাও বিচিত্র নয়। আমরা বোট নিয়ে রওনা হলে ঠিক রেডিওতে খবর পেয়ে যেত সে। তোমার ব্যাগেজ সার্চ করা হয়েছে কিনা জানো?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সুসমি। 'আমি ধরে নিয়েছি কাজটা তোমার।'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'নট গিল্টি। আমারও সব জিনিস সার্চ করা হয়েছে—এক্সপার্টদের কাজ। তারা এমনকি আমার জুতোর গোড়ালিও চেক করেছে। পেরেক তুলে আবার বসালেও, দাগগুলো মুছতে পারেনি।'

গাড়িটা ছাড়তে গিয়েও রানা ছাড়ল না; দেখল নারকেল রঙের এক বাচ্চা ছেলে ছুটে আসছে, সামনের দু'চাকার মাঝখান থেকে একটা বীচ বল কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে সৈকতে। গাড়িটা ধীর গতিতে ছাড়ল ও।

হেড-রেস্টে মাথা ঠেকিয়ে পা দুটো লম্বা করে দিল সুসমি। 'আমরা তাহলে আরেক দিক থেকে জায়গাটায় ঢুকতে যাচ্ছি?'

সপ্রশংস দৃষ্টি দর্শনীয় জোড়া পা থেকে তুলে রাস্তার দিকে তাকাল রানা। 'যাচ্ছি, হ্যাঁ। তবে ঢুকতে পারব কিনা সেটা এখুনি বলতে পারছি না।' গেট দিয়ে লোটাসকে সাবধানে বের করে আনল রানা। গতি বাড়াচ্ছে ধীরে ধীরে, গর্জে ওঠার বদলে এঞ্জিন যেন আহ্লাদে হেসে উঠছে। রানার মুখে খুশির ছাপ দেখে নিজের অজান্তে মনে মনে হাসল সুসমি। তার দৃষ্টিতে নতুন খেলনা পাওয়া বাচ্চার মত লাগছে রানাকে।

'তোমার কি মনে হয় ওরা ল্যাবরেটরি থেকে ট্র্যাকিং সিস্টেমটা অপারেট করতে পারে?'

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'মনে হয় সম্ভব। কিন্তু যেটা আমার মাথায় ঢুকছে না, সাবমেরিনকে ওরা ডুবিয়ে দিচ্ছে কিভাবে—সত্যি যদি তাই ঘটে থাকে।' স্পীড আরও বাড়িয়ে ঘণ্টায় আশিতে তুলল ও। ভাল রাস্তা, কোন সমস্যা হচ্ছে না। সামনে বাঁক দেখে স্পীড কমিয়ে আনল।

'তুমি কি সবসময় এভাবে ড্রাইভ করো?' রাগতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল সুসমি। সিটের ওপর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে সে।

ঝট্ করে তার দিকে একবার তাকাল রানা। 'না। মাঝেমধ্যে

একটু স্পীড তুলি।' সামনে ঝুলে রয়েছে সরল বিস্তৃত রাস্তা, কাঁপতে কাঁপতে একশোর ঘরে পৌঁছে গেল স্পীডোমিটারের কাঁটা। 'তোমার গাইডেড ট্যুর কেমন উপভোগ করলে?'

'সময়টা কাটতেই চাইছিল না। কেউ বুঝতে পারে না আমি কি বলছি। কিংবা হয়তো না বোঝার ভান করছিল। তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওদের কিছু লোক তিব্বতী। তারা চীনা ভাষা ম্যান্ডারিন বোঝে।'

'তাহলে কিছুই তোমার দেখার সুযোগ হয়নি? না ল্যাব, না অস্বাভাবিক বা বেমানান কোন ইকুইপমেন্ট?'

'ওরা আমাকে একটা সিটিং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসায়। ট্যুর করানোর কথা বলে এভাবে বসিয়ে রাখা রীতিমত অপমানকর। সিটিং-রুমটা পুরানো ধাঁচের–তবে ট্যাংকার-এর একটা মডেল রাখা আছে ওখানে। নিরোর সী ফেয়ারার শিপিং লাইনের সর্বশেষ সংযোজন। ওটার নাম সিলভার বোদাল। ওজন ছয়শো হাজার টনেরও বেশি।'

শিস দিল রানা। 'নিশ্চয়ই সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড়।'

মাথা নাড়ল সুসমি, তারপর চিবুক উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'কার্ল মার্ক্স আর মাও জে দং-এর পর।'

দীর্ঘশ্বাস চেপে একটা ট্রাককে পাশ কাটাল রানা, ড্রাইভার অবাক হয়ে ভাবছে লোটাসকে সে তার রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পায়নি কেন। 'আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। এই সিলভার বোদাল সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। বস্‌কে বলছি।'

রানার দিকে ঝুঁকে ওর হাঁটুতে হালকা টোকা মারল সুসমি। 'তার কোন দরকার নেই, রানা,' বলল সে, উচ্চারণ করল "রায়না"। 'আমি এরই মধ্যে আমাদের ইনফরমেশন সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট জোড়া শক্ত করে মুড়ল রানা। নিনা সুসমিকে ছোট করে দেখা বোকামি। সে আসলে চূড়ান্ত প্রমাণ যে,

রূপ ও বুদ্ধির সম্মিলন ঘটতে পারে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকাল ও। ব্যাপারটা মজার নয়? মোটরসাইকেল ও সাইড কার অকস্মাৎ ওদের পিছনে হাজির হয়েছে। একদিকে সাগর, নিচু পাথুরে পাঁচিলের একশো ফুট নিচে; আরেকদিকে খাড়া পাহাড় প্রাচীর। মোটরসাইকেলটা নিশ্চয়ই কোন সাইডরোডে ছিল–যেন অপেক্ষায়। রানা ওর পা নামাল, লোটাস লাফ দিয়ে আরও জোরে ছুটল।

পেট চেপে ধরে নিজেকে সোজা রাখার চেষ্টা করছে সুসমি, সেই সঙ্গে রানার চঞ্চল দৃষ্টি অনুসরণ করছে। 'তোমার ধারণা আমাদের পিছু নেয়া হয়েছে?'

'সম্ভবত। তবে ওই জিনিস নিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। অবশ্য সাইড কারে কেউ থাকলে একটু ভয়ই পেতাম।' পা নামিয়ে ফোর্থ গিয়ার দিল ও। স্পীড বাড়তে বাড়তে আবার নব্বুইয়ের ঘর ছাড়াতে চাইছে। গ্রাঁ প্রি এঞ্জিন যে শব্দ করছে, রানার কানে তা প্রিয় সঙ্গীত। সামনে দীর্ঘ রাস্তার সরল বিস্তৃতি, অনেক নিচে ঝিলমিল ঝিলমিল করা সাগরের আভাস।

'লোকটা পিছিয়ে পড়ছে, রায়না।'

রানার দৃষ্টি মিররে লাগল। প্রথম দর্শনে মনে হলো সুসমির কথাই যেন ঠিক। হাসি চাপল রানা। যা ব্যাটা ভাগ! এতবড় স্পর্ধা, ওই জিনিস নিয়ে লোটাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসিস! তারপর রানা আবার তাকাল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জোড়াটা ভেঙে যাচ্ছে। অকস্মাৎ যেন মোটরসাইকেল আর সাইড কার পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল, তারপর বাঁ দিকে ছিটকে গেল মোটরসাইকেল। রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সাইড কার এখনও ছুটে আসছে।

'রায়না! ওটা আসছে!'

আসছে টর্পেডোর মত। প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে সাইড কার। অ্যাকসেলারেটার পেডাল নামিয়ে দিল রানা

যতক্ষণ না ওর পা মোটা কার্পেট চ্যাপ্টা করে দিল। মহা উৎসাহে গর্জন ছাড়ছে এঞ্জিন, রেভ কাউন্টার ছয় হাজার মার্ক-এ উঠে গেছে। স্পীড এখন ঘণ্টায় একশো বিশ...একশো পঁচিশ–ফিফথ্ গিয়ার–একশো ত্রিশ...একশো পঁয়ত্রিশ। কাঁটা এখনও উঠছে। কিন্তু...

'ধরে ফেলল! আমাদেরকে ধরে ফেলল!'

কি জিনিস ওটা? কোন ধরনের গাইডেড মিসাইল, ওদেরকে ধ্বংস করার প্রোগ্রাম করা? খসাবার কোন উপায় নেই?

রানার দৃষ্টি সামনের রাস্তায় তল্লাশী চালাল। লোটাস দ্রুত একটা ফার্নিচার ভ্যানের পিছনে পৌঁছাতে যাচ্ছে। পিছনে লেখা ইটালিয়ান ভাষা পড়তে পারল ও। 'ম্যাডোনা ম্যাটরাস কোং–গদি ও জাজিম তৈরির কোম্পানি।' দেখা যাক ঘুমানোর আরামদায়ক সরঞ্জাম মিষ্টি স্বপ্ন দেখাতে পারে কিনা।

রানা ভ্যানটার দিকে ছুটল যেন ওটাকে ধাক্কা মারতে চায়, অনুভব করল ওর পাশে উত্তেজনায় শক্ত কাঠ হয়ে যাচ্ছে সুসমির শরীর। টেইল বোর্ডের তলায় ঢুকে গিয়ে লোটাসের সরু নাক কাঁপছে, রানা চোখ তুলল মিররে। হলুদ ও কমলায় সজ্জিত মৃত্যু ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। রানা হুইল ঘোরাতে শুরু করে সুসমির তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। একটা আর্টিকিউলিটেড লরি–জোড়া লাগানো ট্র্যাক্টর ও ট্রেইলার–রাস্তা দখল করে রেখেছে। হেডলাইট জ্বেলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিল ড্রাইভার, কিন্তু অ্যাকসেলারেটারে রানার পায়ের চাপ এতটুকু ঢিলে হলো না। ধাতব পাঁচিল যখন ওদের ওপর চড়াও হতে যাচ্ছে, একটা ঢেউ-এর মত উঁচু ও নিচু হলো লোটাস, তারপর লাফ দিয়ে সামনে ছুটল। ভৌতিক এমন একটানা শব্দ হলো যেন অন্ধকার রাত চিরে ছুটে যাচ্ছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। ওদের জগৎ যেন বিস্ফোরিত হলো। বহুবর্ণ, বিচিত্র, ঝাপসা দৃশ্য আর ছেঁড়া-ফাড়ার শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

হ্যাঁচকা টানে ডান দিকে হুইল ঘোরাল রানা। হঠাৎ, যেন মন্ত্রবলে, সামনের রাস্তা খালি হয়ে গেছে। আল্লাহ, হাজার শোকর! যেন একটা খোলা ভালব থেকে টেনশন রিলিজ হলো। মিররে তাকাল রানা। ওদের পিছনে তুষারপাত শুরু হয়েছে।

গোটা রাস্তায় সাদা ঝড় বইছে। তুষার কণা নয়, পালক। সাইড কারটা ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, আল্লাহই বলতে পারবেন পালক ভরা কতগুলো তোশক আর বালিশ ফাটিয়ে দিয়েছে। ঠিক পিছনেই ছিল মোটরসাইক্লিস্ট, পালকের সাদা মেঘের আড়াল প্রায় অন্ধ করে রেখেছিল তাকে, মেশিনটার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই মুহূর্তে বাইক রাবার ব্যান্ড-এর মত মোচড় খাচ্ছে, নিচু পাঁচিল টপকে নেমে যাচ্ছে নিচে। সমুদ্র একশো ফুট নিচে, পানিতে পড়ার সময় বাহন ও আরোহী বিচ্ছিন্ন হলো না। রানার নিষ্ঠুর চোখ ক্রমশ বড় হতে থাকা বৃত্তাকার ঢেউটার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথাটা একবার নাড়ল ও। 'এত পালক, অথচ শালা উড়তে পারল না।'

সাদা পালকের মেঘ সাগরের দিকে সরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো ভ্যানের জ্বলন্ত সুপারস্ট্রাকচার। আগুনের শিখা ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ক্যাবটা এখনও অক্ষত, সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে ফরিয়াদ জানাচ্ছে ড্রাইভার।

রানা তাকিয়ে আছে, দেখতে পেল তোবড়ানো একটা ফিয়াট সেলুন কার ধ্বংসস্তূপের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে। ও অপেক্ষা করছে; দেখতে পাবে আরোহী গাড়ি থামিয়ে কিভাবে কি ঘটল ইঙ্গিতে জানতে চাইবে, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি জানাবে ভ্যান ড্রাইভারকে। কিন্তু এ-সব কিছুই ঘটল না। বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিল ফিয়াট। ওদের দিকে আসছে। গতি প্রবল।

রানাও প্রস্তুতি নিল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পঞ্চাশের ঘর ছুঁলো

স্পীডোমিটারের কাঁটা। সেই সঙ্গে ফিয়াটের গতিও সমান তালে বাড়ছে। আবার শুরু হলো ধাওয়া। মিররে তাকাতে রানার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ফিয়াট পিছিয়ে পড়ছে না। মরচে ধরা বনিটের নিচে শক্তিশালী নতুন কোন এঞ্জিন না থেকেই পারে না।

ফিয়াটের জানালা দিয়ে বাইরে বেরুল এক লোকের কাঁধ ও মাথা, সেই সঙ্গে কি যেন একটা চকচক করে উঠল। কড়াৎ! কড়াৎ! যেন বজ্রপাতের শব্দ হলো। অটোমেটিক ফায়ার, দুটো সিঙ্গেল শট। এদিক ওদিক হুইল ঘুরিয়ে রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে লোটাসকে চালাচ্ছে রানা, সামনে থেকে ছুটে আসছে একটা বাঁক। এক পলকেরও কম সময়ের জন্যে ছুটে আসা একটা কার ওদের সামনে ঝুলে থাকল, ড্রাইভারের আতংকিত মুখের একটা ক্লোজ-আপ দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে ওরা একটা টানেলে। এত দ্রুত, ঝাপটা মেরে হেডলাইট জ্বালারও সময় পায়নি রানা। ওদের সামনে অর্ধ-বৃত্তাকার একটা আলো প্রকাণ্ড হয়ে উঠল, আর বুলেটগুলোর ভাঙা পাথর গাড়ির সাইডে এসে লাগছে। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল সুসমির হাতে বেরেটা। জানালার দিকে ঘুরে যাচ্ছে সে।

'দরকার নেই।'

'কিন্তু...'

'জানি তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না।' ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে একটা বাঁকে ঢুকছে রানা। 'কিছু রিসার্চ আমাকেও করতে হয়েছে।' ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকাল একবার। 'দেখে বলো, কতটা পিছনে ওরা?'

'ত্রিশ মিটার।'

'তাহলে বলা চলে শুভ বিদায় জানানোর সময় হয়েছে।' একটা সুইচে চাপ দিল রানা। কিছুই ঘটল না। দাঁতে দাঁত চেপে আবার চাপ দিল।

সুসমি কিছু বলল না। জানালার দিকে কাত হয়ে দুটো গুলি

করল পিছন দিকে। এঞ্জিন ও বাতাসের গর্জনে গুলির শব্দ শোনা গেল কি গেল না। ফিয়াট আরও কয়েক মুহূর্ত নিজের কোর্স ও স্পীড ধরে রাখল, তারপর অদ্ভুত আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে পাক খেতে শুরু করল রাস্তার ওপর। চাকাগুলো গাড়ির নিচে যেন ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। তারপর পিছনে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফিয়াট। পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো প্রথম আছাড়ে। নরকের দিকে তাক করা একটা অগ্নিগোলকের মত লাফ দিয়ে তিনশো ফুট নিচে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা। নিচের সংঘর্ষ থেকে আরও একটা বিস্ফোরণের শব্দ সৃষ্টি হলো, জায়গাটাকে চিহ্নিত করে মাথাচাড়া দিল কালো ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ। লোটাস এরইমধ্যে অকুস্থল ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে।

সুসমির চোখ দুটোকে এড়িয়ে থাকল রানা। 'নতুন করে শুরু করি এসো,' ম্লান সুরে বলল ও। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে সাগরের দিকে নেমে গেছে, অ্যাকসিলারেটার থেকে ধীরে ধীরে পা তুলে নিচ্ছে। নীল সমুদ্র যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদেরকে। এই পানির কিনারায় পুড়ে ছাই হচ্ছে মানুষের মাংস, কল্পনার চোখে দেখতে পেল ও। আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে ওর নিজের সৌভাগ্য?

'কেউ নিশ্চয়ই পুলিসে খবর দিয়েছে।' তীর বরাবর তাকিয়ে রয়েছে সুসমি, ওদিক থেকে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

রানার কপালে চিন্তার সরু রেখা। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না, তবে দেখতে ওটা ঠিক যেন বেল ওয়াইইউএইচ-আইবি। কবীর চৌধুরীর ল্যাবরেটরিতে, কাঁচের গম্বুজের ভেতর যে মডেলটাকে দেখে এসেছে। লোটাসের স্পীড আবার বাড়াতে শুরু করল ও।

'এত জোরে আসছে!'

রানার চোখ উদ্বেগে সরু। 'ওটায় সম্ভবত অগজিলিয়ারি

টার্বোজেট ফিট করা আছে। ঘণ্টায় তিনশো মাইল ছাড়িয়ে যাবার কথা।' লোটাসের তুলনায় দ্বিগুণ গতি।

রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে ছুটে আসছে হেলিকপ্টারটা। আগামী কয়েকটা সেকেন্ড ভয়ানক। পুলিসের হেলিকপ্টার হলে পোড়া ভ্যানের কাছে নামবে। চুলের একটা কাঁটা ঘুরল রানা। দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল কপ্টার। ডানে মোড়, বাঁয়ে মোড়, পা নামাও। পিছনে তাকাল ও। কিছু নেই। স্বস্তি পাওয়ায় ঠাণ্ডা আরাম অনুভব করল শরীরে। অকারণে অস্থির হয়ে ওঠা বন্ধ করতে হবে ওকে।

পরমুহূর্তে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল ওটা, পাহাড়ের কোণ ঘুরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা উড়ন্ত ড্রাগনের মত। প্রপস-এর আকস্মিক গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর নার্ভগুলোও যেন চিৎকার জুড়ে দিল, সেই সঙ্গে কামান দাগার ভয়ংকর শব্দ টান দিল অস্তিত্ব নিয়ে। এক ঝাঁক শেল ওর সামনের রাস্তা উড়িয়ে দিল। রাস্তার ধারের নিচু পাঁচিলে খানিক পরপর ধুলোর বিস্ফোরণ দেখে মনে হলো আরেক ঝাঁক শেল সেলাইয়ের ফোঁড় দিচ্ছে। গাড়ি চালানোর ভঙ্গি দেখে সুসমির মনে হলো রানা পাগল হয়ে গেছে।

রানাকে সী লেভেলে নামতে হবে। কড়-কড়-কড়াৎ! কড়-কড়-কড়াৎ! বাজ পড়ার মত বিস্ফোরিত হচ্ছে কামানের গোলা। বাঁক নিয়ে আবার ফিরে আসছে কপ্টারটা। ওদের পিছনের রাস্তা বরাবর এসে স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে, বাকি সব কিছু আপনা থেকেই ঘটবে। শেলগুলোর তৈরি রেখাটাকে শিকারের দিকে একটা হাঙরের ছুটে আসা ফিন-এর মত লাগছে সুসমির। তারপর অকস্মাৎ অন্ধকার ওদেরকে গিলে নিল, পিছিয়ে পড়ছে আলোর একটা বৃত্ত। আরও একটা টানেলে ঢুকেছে লোটাস।

রানার দিকে তাকাল সুসমি। 'এখান থেকে আমরা না বেরুলে কি হয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

স্থির দৃষ্টি সামনে, রানা জবাব দিল, 'ফাঁদে আটকা পড়ব। টানেলের দুই প্রান্তে লোক নামাবে ওরা, গুলি করতে করতে ভেতরে ঢুকবে।'

টানেল থেকে বেরিয়ে ঢালু রাস্তা ধরে সাগরের দিকে নামছে লোটাস, এদিকে দু'পাশে পাঁচিল বেশ উঁচু। সুসমি দেখতে পেল তার বিশ ফুট নিচে ঝিলমিল করছে রোদ লাগা পানি। মাথার ওপর আকাশ খালি। কপ্টারটা কি ধাওয়া বাদ দিয়ে ফিরে গেছে? নাকি এইমাত্র যে পাহাড়টাকে ওরা পাশ কাটিয়ে এলো সেটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, হঠাৎ আবার মাথার ওপর চলে আসবে?

ঠিক তাই ঘটল। আবারও পিছনে উদয় হলো সেটা, আঠার মত লেগে থাকল। রাস্তা সিধে হয়ে গেল সামনে, রানওয়ের মত সমতল, সাগরের পাশ ঘেঁষা। এই পরিস্থিতি থেকে পালাবার কোন উপায় নেই, সুসমি অন্তত দেখতে পাচ্ছে না। ওদেরকে থামতে হবে, যত সামান্য আড়ালই পাওয়া যাক সেটাকে কাজে লাগিয়ে লড়াই করে বাঁচতে বা মরতে হবে। দুটোর একটা।

কিন্তু রানা থামছে না। ওর পা আরও চাপ দিল নিচে। নির্দয় পাষাণ চোয়াল শক্ত ও উঁচু হলো আরও। সুসমির পাগল হবার দশা। ভাবছে, কি করতে চায় ও? ছুটে কপ্টারের সঙ্গে পারবে না। রাস্তা যতদূর দৃষ্টি যায় সরল একটা রেখা। পিছনে তাকাল সে। কপ্টারটা রাস্তা থেকে মাত্র পাঁচ ফুট ওপরে, আর এমন একটা ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে যেন লোটাসের ছাদে ল্যান্ড করতে চায় পাইলট। তাকে তো দেখতে পাচ্ছেই, তার পাশে বসা প্রকাণ্ড একটা দৈত্যকেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

ওই দানব কবীর চৌধুরীর সেই পোষা জল্লাদ। লোকটা, জানোয়ার, বিজয়ের হাসি হাসছে; হাত দুটো কামানের গায়ে এমন আদরের ভঙ্গিতে জড়িয়ে রেখেছে, যেন হারিয়ে খুঁজে পাওয়া একটা প্রিয় খেলনা তার। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে কামান দাগবে সে। হেভী শেল কিভাবে লোটাসের ধাতব শরীর ছিন্নভিন্ন করে

দেয়, তার সঙ্গে রক্ত-মাংসের একজোড়া শরীর কিভাবে ভর্তা হয়, এ-সব খুব কাছ থেকে দেখতে চাইছে সে। তিনশো মিটার রাস্তা জুড়ে সেই আবর্জনা কিভাবে ছড়ায়, তাও দেখার খুব ইচ্ছা তার।

'থামছি!'

সুসমিকে সাবধান করে দিয়ে ব্রেক-পেডাল মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল রানা, ইনসিউলেইটিং টেপ-এর মত পোড়া একজোড়া রিবন রেখে আসছে পিছনে। শুরু হলো লোটাসের পাক খাওয়া। গাড়ির ওপর দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল কপ্টার, আকাশের দিকে নাক তুলে বৃত্তের ঊর্ধ্বমুখী বাহু তৈরি করছে। লূপ আকৃতির বাঁক ঘোরা শেষ করে ওটা আবার ফিরে আসছে, তবে ইতিমধ্যে লোটাসের লাটিমের মত ঘোরা থামাতে পেরেছে রানা, চাকা ছুটছে সোজা সাগর লক্ষ্য করে।

রাস্তা নেই, লোটাস লং জাম্প হাই জাম্প কিছুই বাদ দিচ্ছে না; পাথর ও বালির খানিকটা বিস্তৃতি পেরিয়ে এসে কঠিন ও নিরেটদর্শন একটা বাধার দিকে এগোচ্ছে। সংঘর্ষ অনিবার্য, বুঝতে পারলেও সুসমির কিছু করার নেই। সে তার চারদিকে সাগর ছাড়া আর কিছু দেখছে না। আর শব্দ শুনে অনুভব করতে পারছে কামানের গোলাগুলো ধাওয়া করছে ওদেরকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সব কিছু হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। তারপরই লোটাস উড়ে এসে পড়ল সরু একটা জেটিতে, শেষ মাথায় ভাসছে একজোড়া ইয়ট। টায়ারের নিচে কাঠের তক্তার আর্তনাদ শুনতে পেল সুসমি। তারপরই দেখল ওদেরকে নিয়ে শূন্যে লাফ দিল গাড়ি। সোনালি সূর্য ম্লান হয়ে গেল, তারপর হারিয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। লোটাসের নাক নিচু হলো। যেন আকুল হয়ে উঠে এলো সাগর ওদের দখল নেয়ার জন্যে। চোখ বুজল সুসমি, সংঘর্ষের ধাক্কা সামলানোর জন্যে শক্ত করল নিজেকে।

কপ্টার থেকে লোটাসকে সাগরে ঝাঁপ দিতে দেখে রেগে গেল জানোয়ার। মরার সময়ও লোকটা প্রতারণা করল তার সঙ্গে।

পাইলটকে নির্দেশ দিল—ঠিক যেখানে ডুবেছে গাড়ি, ওই স্পটের ওপর দিয়ে উড়ে যাও। স্পটটার ওপর, পানিতে, কামানের গোলা ছুঁড়ল জানোয়ার। কিন্তু তৃপ্তিদায়ক লালচে কোন রঙ পানিতে ফুটল না। শুধু গাঢ় রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলা আর লতাপাতা পাক খাচ্ছে, ঠিক যেখানে তলিয়ে গেছে গাড়িটা। বেল আরেকবার স্পটটার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, তারপর কাত হয়ে দিক বদলে ফিরে চলল কবীর চৌধুরীর ল্যাব অভিমুখে।

তেরো

অ্যাকুয়েরিয়ামে ফেলা টুকরো খাবারের মত ডুবল লোটাস। গাঢ় সবুজ মৃত্যুকে চারপাশ থেকে এগিয়ে আসতে দেখল সুসমি, চেষ্টা করল আতঙ্কিত না হতে। ভাগ্যই বলতে হবে যে গাড়িটা দেখতে বল্লম আকৃতির, তবে তারপরও পানিতে ওরা বাড়ি খাওয়ার সময় সেফটি স্ট্র্যাপ তার স্তনের ত্বক প্রায় ছিলে ফেলেছে। একটা ঝরা পাতার মত এদিক ওদিক দুলতে দুলতে নেমে এসে আগাছার স্তূপে স্থির হলো লোটাস। লতাগুলো শুঁড়ের মত, ঢেউ-এর আকৃতি তুলে জানালার কাঁচে বাড়ি মেরে যেন ভয় দেখাতে চাইছে, ভেতরে ঢুকে ওদেরকে পেঁচিয়ে ধরবে। চিৎকার করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল সুসমি।

'তুমি ঠিক আছ?' রানার প্রশ্নে সুরটা এত স্বাভাবিক, যেন গর্তে পড়ে গাড়িটা ঝাঁকি খাওয়ায় ভাবছে সুসমির আবার কোথাও লাগল কিনা।

'এখনও বেঁচে।' সামনের দিকে ঝুঁকে মাথার বিশ ফুট ওপরে ঝাপসা কাঁচের মত পানির সারফেসে তাকাল সুসমি। কামানের খরচ করা বা নিঃস্ব কিছু শেল পাক খেতে খেতে নেমে এসে গাড়ির বনিটে পড়ল। ডান দিকে তাকাতে দেখল দরজার নিচেটা একটা পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে। অন্তত ভেতরে পানি ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। ডুবে যাওয়া গাড়ি থেকে পালাবার নিয়মগুলো যেন কি কি? জানালা ততটুকুই খোলো, গাড়িতে পানি যাতে ধীরে ধীরে ঢোকে। চাপ যখন সমান সমান হবে, ভেতরে ও বাইরে, দরজা খুলতে তখন আর কোন রেজিস্টান্স বা প্রতিচাপ থাকবে না। তবে তার দিকে তো থাকবেই। ওই পাথরটা।

ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'আমার ধারণা সে চলে গেছে। ধরে নিয়েছে আমরা বেঁচে নেই,' গলার স্বরে প্রায় ফুর্তি।

'তারমানে কি আমরা বাঁচব?'

'কি বলে!' ড্যাশবোর্ডে খোঁচা মারল রানা, মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে মনে হলো একটা ডিজেল এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে। আরেকটা বোতামে খোঁচা দিতে বনিট থেকে একজোড়া হেডলাইট বেরিয়ে এসে ঝাপসা ভাবটুকু দূর করে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে গিয়ার লিভার নামাচ্ছে রানা, যতক্ষণ না সেটা রাবার কাউলিং-এর ভেতর প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুসমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। 'পাগল নাকি! সাগরের তলায় গাড়ি চালাতে চাও?'

গিয়ার লিভারের নব সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। ওড়ার প্রস্তুতি নেয়ার সময় হোভারক্রাফট যেভাবে কাঁপতে শুরু করে, ঠিক সেভাবে থরথর করে কাঁপছে লোটাস; তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে আগাছার ঘন স্তূপ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। 'চাই,' এতক্ষণে সুসমির প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও। 'সাগরের তলাতেও গাড়ি চালাতে চাই–তবে চাকার সাহায্যে নয়। ওয়েলকাম টু পানকৌড়ি। এটা হলো মার্কিনী সায়ান্টাফিক ডিপার্টমেন্টের একটা

এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ের সাবমারসিবল্ সেভেনওয়ানওয়ান। আমি নাম দিয়েছি পানকৌড়ি, ইংরেজিতে যাকে বলে কর্মর‍্যান্ট।'

পটলচেরা চোখ রাগে সরু করে রানার দিকে তাকাল সুসমি। 'এই ইচ্ছেটা, সাগরে ঝাঁপ দেয়া, প্রথম থেকেই ছিল তোমার মনে, অথচ আমাকে কিছুই জানাওনি।'

'বন্ধুরা যেভাবে একের পর এক আসতে লাগল, জানাবার আর সময় পেলাম কোথায়। সে যাই হোক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। হেলিকপ্টার ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করার পর কবীর চৌধুরী এখন আর ভিজিটর আশা করবে না।' গিয়ার লিভারের নব মোচড়াতে পোর্ট সাইডে ঘুরল পানকৌড়ি।

'পানির তলায় এভাবে কতক্ষণ আমরা থাকতে পারব?' বাংলাদেশের মত ছোট্ট এবং দরিদ্র একটা দেশের একজন স্পাইয়ের অনেক কিছু দেখেই তাজ্জব বনে যাচ্ছে সুসমি, যেমন–ওর পাশে বসা এই তরুণ, তার লাইফস্টাইল, জীবনদর্শন, শিক্ষা ও ট্রেনিঙের মান, খরচের উদার হস্ত, বিদেশের মাটিতে শাখা অফিস ও সেফ হাউস, এবং সবশেষে এই সাবমারসিবল্ পানকৌড়ি চালনা। তবে চোখের দৃষ্টি আর গলার আওয়াজে মুগ্ধতা বা বিস্ময় ইচ্ছে করেই আসতে দিচ্ছে না সুসমি। এই লোকটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তার বারণ। এই লোককে ভাল লাগা তার নিষেধ। এ-সব বিধি-নিষেধ নিজেই নিজের ওপর আরোপ করেছে সে। একটাই কারণ, রানার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত একটা দেনা-পাওনার হিসাব আছে। সে একজনকে ভালবাসত। তার অতৃপ্ত আত্মার কান্না সে শুনতে পায়। কান্নাটা থামাবার জন্যে একটা হত্যাকাণ্ড না ঘটিয়ে সুসমির কোন উপায় নেই।

'কতক্ষণ পানির তলায় থাকতে পারব? যতক্ষণ ফুয়েল থাকবে,' জবাব দিল রানা। 'আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই আছে। বাতাসও কোন সমস্যা নয়, যেহেতু ছোট একটা রিজেনারেটিভ প্ল্যান্ট আছে।' হাসিতে শব্দ নেই। 'বাকি সমস্ত

ইনফরমেশন ক্ল্যাসিফাইড।'

এবার সুসমির হাসিটা সত্যি দেখার মত হলো। 'তোমার কি ধারণা, আমাদের মহাচীন এ-ধরনের টেকনোলজিতে কারও চেয়ে পিছিয়ে আছে? আমেরিকা এ-সব আবিষ্কার করেছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কিন্তু এ-কথা কি জানো যে আমরা এ-সব বহু বছর আগেই স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে তৈরি করিয়েছি?'

'জানি বলেই তো ভয় পাচ্ছি,' বলল রানা, উইন্ডস্ক্রীনে মুখটা চেপে ধরল। 'আমি বরং চোখ দুটো খোলা রাখি। ব্যাপারটা খুবই বিব্রতকর হবে তোমাদের একটার সঙ্গে এখন যদি ধাক্কা খায় পানকৌড়ি।'

ভেংচি কাটল সুসমি, তারপর সিটে হেলান দিল। নিজেকে বলল—খারাপ কথা, রানার সঙ্গ ও সান্নিধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি আমি। তবে আশ্চর্য, কাছাকাছি হবার পর এখন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে এই লোক অকারণে মানুষ খুন করার মত জঘন্য চরিত্রের অধিকারী। খানিক আগে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে কয়েকবার ফিরে আসা, তাতে রানার অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারা যায় কি? এক সঙ্গে এরকম বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দু'জন মানুষ যখন সময় পার করে, ভাবাবেগের ছিপি কখনোই কেউ এঁটে রাখতে পারে না। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখল চেহারাটা সত্যি কঠিন; তবে অনুভব ও উপলব্ধিতে এ-ও ধরা পড়ে যে ওর মনটা অসম্ভব নরম, মানবিক কোন গুণেরই যেন ঘাটতি নেই ওর মধ্যে।

তবে হুতাওকে খুন করেছে। আমি আর কিছু শুনতে বা বুঝতে চাই না।

হঠাৎ লক্ষ করল, রানার ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসির রেখা। 'আমার দেখার ভুল? নাকি সত্যি তুমি হাসছ?'

'আসলে সত্যি হাসি পাচ্ছে,' বলল রানা। 'অথচ বিষয়টা

মোটেও হাসির নয়। বরং উল্টোটাই সত্যি। আমার ভয় পাওয়া উচিত।'

'কেন?'

'তোমার মনে কি চলছে আমি জানি না,' বলল রানা। 'তবে বুঝতে পারি তুমি অনুভব করো তোমার পাশে একজন শত্রু বসে আছে। আমার ওপর তোমার রাগ আর বিতৃষ্ণার কারণটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

'কারণ না জানিয়ে ট্রিগার টানার মেয়ে আমি নই,' জবাব দিল সুসমি। 'তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'তারমানে তুমি স্বীকার করছ...'

'আমি স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করছি না,' বাধা দিয়ে বলল সুসমি। 'শুধু এটুকু বলে রাখি, আমি তোমাকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করি না, তুমিও আমাকে সব ব্যাপারে বিশ্বাস করো না।'

রানা ভাবছে, এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম! মেয়েটা অসুস্থ নাকি? পাগল? 'ঠিক আছে। সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমার তরফ থেকে জানিয়ে রাখছি, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

সুসমি মনে মনে নিজেকে শাসাল—খবরদার, কোন অবস্থাতেই এই লোকের ধোঁকাবাজিতে পড়া চলবে না!

ড্যাশবোর্ডে এক সেট কম্পাস রয়েছে, সেটা দেখে রূপান্তরিত সাবমারসিবল্ লোটাসকে চালাচ্ছে রানা। প্রায় মিনিট দশেক পর ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা, থামল সারফেসের ঠিক নিচে। ড্যাশবোর্ডের আরেকটা বোতামে চাপ দিতে বনিট আর উইন্ডস্ক্রীন যেখানে সংযুক্ত হয়েছে সেখান থেকে একটা পেরিস্কোপ টিউব বেরিয়ে এলো খোলস অর্থাৎ হাউজিং ছেড়ে। সরু ধাতব যন্ত্রটাকে পানির সারফেস ভেদ করতে দেখল রানা। ড্রাইভিং হুইলের চওড়া সেন্ট্রাল ব্যান্ডে সেট করা একটা প্যানেল ঠেলে সরিয়ে দিল ও, বেরিয়ে পড়ল ছোট আকারের একটা টিভি স্ক্রীন। ড্যাশবোর্ডের

একটা নব ঘোরাল, সীস্কোপটা স্ক্রীনে তিনশো ষাট ডিগ্রী ধরে ঘুরতে শুরু করল।

'চমৎকার!' রানার উল্লসিত হয়ে ওঠার কারণ, কবীর চৌধুরীর পাহাড়-প্রাচীর দেখতে পেয়েছে ও, কালো রঙ করা একটা দাঁতের মত সরু আর ধারাল। 'পানকৌড়িকে নিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকব, তারপর ঘুরে কড়াই বা গামলাটার দিকে এগোব।'

দেখা গেল স্রোত এখন প্রবল, পানিও খুব আলোড়িত ও ঘোলা। দৃষ্টিসীমা কমে আসছে, হেডলাইটের আলো যেন ঘন কুয়াশায় বাধা পেয়ে সামনে এগোতে পারছে না। পাথরের একটা স্তম্ভ বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাছাকাছি খাড়া হয়ে আছে, ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে পানকৌড়ি, একটুর জন্যে ঘষা খাচ্ছে না। নুড়ি পাথরগুলো গাড়ির তলার ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছে এদিক ওদিক। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই নিচের স্তরে আলাদা একটা চোরা ও বিপজ্জনক স্রোত বইছে। স্পীডবোট থেকে দেখা কর্কশ ও এবড়োখেবড়ো পাথুরে আঙুলটার কথা মনে পড়ল রানার, ফিরে আসছে সাগরের দিকে। পিছিয়ে এসে, নিরাপদ দূরত্ব থেকে, পেরিস্কোপের সাহায্যে আরেকবার দেখে নেয়া দরকার। এটা করতে গিয়ে দুই ফ্যাদম গভীরতায় পাথর স্তূপের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক দেখতে পেল। তারপর লক্ষ করল যেই মুহূর্তে ফাঁকটা গলে বেরুল, সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিচে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরের তলা। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, কিংবা ভয়াবহ একটা ভূমিকম্প, কয়েক হাজার বছর আগে সত্যি সত্যি বিশাল একটা গভীর গর্ত তৈরি করেছিল–ফলে ছুটে এসে সেই গর্তটা ভরে দেয় সাগর।

তবে রানা ও সুসমি যেটা টের পেল না সেটা হলো দুটো ইলেকট্রনিক চোখ চ্যানেলের উল্টো প্রান্ত থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হলো, সেই মুহূর্তে একটা মেসেজ পৌঁছে গেল কবীর চৌধুরীর

ল্যাবরেটরির অপারেশন রুমে।

কড়াই বা গামলার গভীরতা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। যেখানে তীরের কাছাকাছি বা তীরেই সহজ ফাউন্ডেশন পাওয়া সম্ভব ছিল সেখানে এই গর্তের ভেতর ল্যাবটা তৈরি করার কি কারণ থাকতে পারে? সম্ভবত পাশাপাশি দুটো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে গামলাটা তৈরি হয়েছে, এবং দুটোর মাঝখানে একটা আন্ডারওয়াটার রিজ আছে। সাবমারসিবলের পাওয়ার কমিয়ে চার ফ্যাদম পর্যন্ত নেমে এলো রানা। দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কিসের ওপর ল্যাবরেটরিটা তৈরি করা হয়েছে। 'ভেতরে ঢুকছি। চোখ খোলা রাখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সুসমি। লক্ষ করে রানার মনে হলো, বিজ্ঞানের মনোযোগী এক ছাত্রী।

ন্যাচারাল হারবারের পানি শান্ত, তবে দৃষ্টিসীমা এখনও ভাল নয়। এ সম্ভবত গামলার ভেতরকার সালফারাস কমপাউন্ড-এর সঙ্গে সাগরের প্রতিক্রিয়া ঘটার ফলাফল। ঝাপসা ও ঘোলা পানির ভেতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় আশ্চর্য একটা শঙ্কা জাগল রানার মনে। যেন ওর দৃষ্টিসীমার কিনারা থেকে ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে কবীর চৌধুরী। অনুভূতিটা এমন জোরালো হয়ে উঠল যে উল্টো করা গম্বুজটা দেখামাত্র নিজের সিটে কুঁকড়ে গেল রানা। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো কবীর চৌধুরীর মাথার প্রকাণ্ড ও অবিকল প্রতিরূপ পানিতে পিছনদিকে ঝুলে আছে।

'রায়না!' চোখ নামিয়ে রানা দেখল সুসমির একটা হাত ওর কব্জি চেপে ধরেছে। 'এ তো স্থায়ী কোন স্ট্রাকচার নয়। জিনিসটা ভাসছে!'

সুসমি ঠিক ধরেছে। রানা যেন তাকিয়ে আছে একটা জাহাজের খোলের দিকে। ওটার কোন ভিত নেই। নেই কোন নোঙর বা দড়িদড়া। কাঠামোটার অসম্ভব ভারী মধ্যভাগ একটা চাটু বা তাওয়ার তলার মত। কিন্তু কেন? এর কারণ কি এই:

ল্যাবরেটরিটা যাতে টেনে অন্যান্য লোকেশনে নিয়ে যাওয়া যায়? এটাই সম্ভবত একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা–এবং আইডিয়া হিসেবে মন্দও বলা চলে না। কবীর চৌধুরী তার খেলনা নিয়ে দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তে খেলতে পারবে। কোন জলসীমাই এটার নাগালের বাইরে নয়।

চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া ধরতে পারল রানা। সর্বনাশ! একটা ডেপথ্ চার্জ! পানকৌড়িকে নিয়ে ঘোলা গভীরতায় ডাইভ দিল ঠিকই, কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাথাটা ওর গাড়ির গায়ে ঠুকে গেল। কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া উষ্ণ রক্তের ধারা অনুভব করল, ব্যথাটা ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ছে কানের পর্দায়। শক ওয়েভ ঝাপটা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিল পানকৌড়িকে, তোবড়ানো ফ্রেমের ফাটল বেয়ে গাড়ির ভেতর পানি ঢুকছে। গায়ে রূপালি আঁশ, কামানের গোলার মত উইন্ডস্ক্রীনের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল মরা একটা মাছ উড়ন্ত পোকার মত।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা পানকৌড়িকে আরও গভীরতায় ঠেলে দিল। কন্ট্রোল থেকে অন্তত কিছুটা সাড়া পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। কম্পাসের দিকে তাকিয়ে দেখল ওটা লক্ষ্যহীনভাবে পাক খাচ্ছে। বোধ, বুদ্ধি আর অনুভূতির সাহায্যে পথ করে নিতে হবে ওকে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও। এর বেশি গভীরে কোন অবস্থাতেই নামা চলবে না। নামলেই পানির প্রেশার ওদেরকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে ফেলবে। এখনও তলার কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। ডিরেকশন্যাল কন্ট্রোল ঘোরাল রানা, অনুভব করছে ভেজা শার্টটা সেঁটে আছে গায়ে। স্টিয়ারিং-এ আঘাত লাগলে স্রেফ মরতে হত ওদেরকে।

বুম! আরেকটা ডেপথ্ চার্জ। মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে একটা মোরে ঈল স্যাৎ করে পাশ কাটাল, ওটার পিছু নিয়েছে ঝাঁক ঝাঁক মৃত্যুপথযাত্রী মাছ। যথাসম্ভব শান্ত থাকছে রানা,

স্টিয়ারিং নব ঘোরাচ্ছে পাকা সিঁদেল চোর যেরকম সতর্কতার সঙ্গে একটা সেফ-এর কমবিনেশন মেলাবার চেষ্টা করে। ওর পাশে বসা সুসমি নিজের স্কার্টের এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে একটা ফাটলে চেপে ধরেছে পানি ঢোকা বন্ধ করার জন্যে। অবশেষে! রানা অনুভব করল, ও যেদিকে চাইছে সেদিকে ঘুরতে শুরু করল পানকৌড়ি, সেই সঙ্গে স্পীডও বাড়ছে ধীরে ধীরে। গামলার গায়ে ধাক্কা খাওয়া আর আত্মহত্যা করা সমার্থক। একটা করে সেকেন্ড পার হচ্ছে, ডেপথ্ চার্জ-এর পরবর্তী দৃশ্য দেখতে বা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাবে বলে অপেক্ষা করছে রানা, জানে ওটাই ওদের জন্যে নিয়ে আসবে মৃত্যু-পরোয়ানা। কিন্তু কিছুই ঘটছে না। দৃষ্টিসীমা এখনও পাঁচ কি ছয় গজের বেশি নয়।

'রায়না!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে রানা শুধু এইটুকু দেখার সময় পেল যে একজন ফ্রগম্যান খুদে একটা সাবমেরিনের নাকে বসানো সরু টর্পেডো পানকৌড়ির দিকে ঘোরাচ্ছে। একটা খাড়া ঢালে পানকৌড়িকে তুলে আনছে ও, এই সময় টর্পেডো ফায়ার করা হলো। নিক্ষিপ্ত তীরের মত ওদের দিকে ছুটে এলো সেটা। রানার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই কোন ধরনের ম্যাগনেটিক ডিভাইস ফিট করা আছে, অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুতে ঠিকই আঘাত করবে। পরমুহূর্তে পানকৌড়ির তলার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল টর্পেডো। এক সেকেন্ড পর গামলার গায়ে বিস্ফোরিত হলো সেটা। আরও একবার শক ওয়েভের ধাক্কায় এক পাশে ছিটকে পড়ল পানকৌড়ি। তবে বিস্ফোরণের আলোয় পলকের জন্যে রানা দেখতে পেল ওদের সামনে কি আছে। পঞ্চাশ ফুট দূরে হারবারে বেরুবার ফাঁক।

'রানা! পিছনে ওরা আরও কয়েকজন!'

সুসমি ঠিকই দেখেছে। তিনজন ফ্রগম্যান রকেট লঞ্চার ঠেলতে ঠেলতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে ফায়ার করবে ওরা। ড্যাশবোর্ডের একটা বোতামে খোঁচা মারল

রানা। কালো কালির নিশ্ছিদ্র একটা মেঘ সুসমির দৃষ্টিপথ থেকে অনুসরণকারীদের মুছে ফেলল। 'কিন্তু বিপদ কাটেনি!' বলল রানা, কারণ সামনের ঘোলা পানিতে আরও তিনজন ফ্রগম্যানকে দেখতে পাচ্ছে। কি যেন বহন করছে তারা, ক্রসবার-এর মত দেখতে। চেইন ফেন্স বা মোটা তার দিয়ে তৈরি বেড়ার সামনে ওগুলো। যে ফাঁক দিয়ে তারা ঢুকেছে, সেটা এখন ওই বেড়া দিয়ে আটকানো।

সুসমি অসহায়বোধ করছে, একই সঙ্গে রানার কণ্ঠস্বর ও চেহারায় গভীর আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে ঈর্ষান্বিতও বটে। তিন ফ্রগম্যানই তাদের অস্ত্র তাক করছে, এই সময় ড্যাশবোর্ডের নিচের একটা লিভার ধরে টান দিল কবীর চৌধুরীর দুঃস্বপ্ন। দীর্ঘশ্বাস পড়ার মত একটা শব্দ হলো। উইন্ডস্ক্রীনটাকে ঢাকার জন্যে নিচে থেকে উঠে এলো ভিনীশ্যান ব্লাইন্ডের মত ধাতব স্ক্রীন। এক ঝাঁক বুদ্বুদ জানান দিল একজন ফ্রগম্যান ফায়ার করেছে, তার বজ্র আঘাত করল মেটাল স্ক্রীনে। তীক্ষ্ণ একটা গর্জন শোনা গেল, উইন্ডস্ক্রীনের কিনারা দিয়ে খানিকটা পানি ঢুকল ভেতরে।

ভয় যেন বরফের আঙুল হয়ে রানার তলপেট খামচে ধরেছে। উইন্ডস্ক্রীনের পাশে যদি শেল লাগে, ওরা বাঁচবে না। মেটাল স্ক্রীন এত সহজে অকেজো প্রমাণিত হবে এটা ওর কল্পনাতেও ছিল না। দ্বিতীয় লোকটা ফায়ার করল, তবে লাগাতে পারল না। আরেকটা লিভার টানল রানা, ফ্রন্ট ইন্ডিকেটর লাইটের পাশে ছোট দুটো হ্যাচ খুলে গেল। ওগুলোর পিছনে ২.৩-ইঞ্চি রকেট লঞ্চারের দুটো ব্যারেল লুকিয়ে আছে। তৃতীয় লোকটার লেভেলে ব্যারেল নামিয়ে ট্রিগার মেকানিজম টেনে দিল রানা। তাৎক্ষণিক একটা পিছু-ধাক্কা অনুভব করল ওরা, রানার মনে হলো পানকৌড়িকে আঘাত লেগেছে। গাড়ি ঝাঁকি খেলো, সেই সঙ্গে উইন্ডস্ক্রীনের ফাটল দিয়ে আরও কিছুটা পানি ঢুকল ভেতরে

তারপর ওরা দেখল লোকটা তলিয়ে যাচ্ছে, তার পিছু নিয়েছে রক্ত আর নাড়ীভুঁড়ি। আতংকে হাঁপাতে শুরু করল সুসমি। রানা আরেকটা রকেট ছুঁড়ে ইস্পাতের বেড়াটায় গর্ত তৈরি করল। কিন্তু ওটা কি যথেষ্ট চওড়া হলো? সেটা পরীক্ষা করতে হলে ওই গর্তের ভেতর গাড়ি নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে হবে। স্টিয়ারিং যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কাজেই অত্যন্ত সাবধানে এগোল ও। এগোচ্ছে, এই সময় সরাসরি সামনের পথে উঠে এলো আরেকজন ফ্রগম্যান। এখন আর অস্ত্র ব্যবহার করার সময় নেই, সময় নেই দিক বদলে ফাঁকি দেয়ারও। সরাসরি রানাকে টার্গেট করে অস্ত্র তুলল লোকটা, রানাও এতটুকু সময় না দিয়ে পানকৌড়ির নাক সোজা তার ওপর তুলে দিল। বনিটে সেঁটে নিয়ে তাকে তার পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে পানকৌড়ি কাপড়ে তৈরি একটা পুতুলের মত। মুখ এত কাছে, লোকটার চোখের নগ্ন আতংক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। তারপর ইস্পাতের ছেঁড়া তারের সঙ্গে ঘষা খেলো সে। তীক্ষ্ণ, ধারাল, ছেঁড়াতার ওর পিঠ থেকে ছিঁড়ে নিল ওয়েট সুট, সঙ্গে সঙ্গে পানি আবার লাল হয়ে উঠল রক্তে। পানকৌড়ির চারদিকে তারের বাধা আঁটসাঁট হয়ে উঠল। রানা দেখল তারগুলো একেকটা আঙুলের সমান মোটা।

মুখের ভেতরটা শুকনো, সাহস করে যতটা পারা যায় ধীরে ধীরে থ্রটল খুলছে রানা, শুনতে পাচ্ছে পানকৌড়ির ছাদে আঁচড় কাটার সময় স্নায়ু বিদারক তারের কর্কশ চিৎকার। পাশে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আছে সুসমি, ওর মতই আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করছে পিছনের কালিগোলা পানি থেকে কখন ছুটে এসে ওদেরকে আঘাত করবে একটা মিসাইল। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে এগোচ্ছে পানকৌড়ি, মনে হলো ইস্পাতের গোটা বেড়াটা সঙ্গে করে নিয়ে আসছে, তারপর–বুম! আরেকটা ডেপথ্ চার্জ। আরও এক সারি শক ওয়েভের ধাক্কা। ব্যথা কমানোর জন্যে চোখ বুজে দু'কানে হাত চাপা দিল রানা। তারপর অনুভব করল পানকৌড়ির

নাক নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে। এখন আর ওরা ইস্পাতের তারের জালে আটকা নয়! বিস্ফোরণের ঝাঁকি ওদেরকে ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে। পিছন দিকে তাকাতে বেড়াটাকে কেঁপে কেঁপে নিজের অবস্থানে ফিরে যেতে দেখল ও, ছেঁড়া তারগুলো ক্ষুধার্ত শুঁড়ের মত নাগাল পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়া শিকারের। সমুদ্রের তলদেশে নেমে এসে পানকৌড়িকে কাছাকাছি একটা পাথরের আড়ালে নিয়ে আসছে রানা।

চোদ্দ

হোটেল হিলটপ থ্রী স্টার-এ প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল নব-দম্পতি মিস্টার ও মিসেস প্রতুল চ্যাটার্জির বিস্ময়কর সৌভাগ্য। বলা হলো, ধরে নেয়া চলে লটারিতে এক বিলিয়ন ডলার জিতেছেন ওঁরা। গাড়ি নিয়ে সাগরে পড়া, তারপর বেঁচে উঠে আসা, এ এমন কি গল্পেও সম্ভব নয়: অথচ বাস্তবে ঠিক তাই ঘটেছে।

সুদর্শন, একই সঙ্গে নিষ্ঠুর চেহারার গম্ভীর তরুণটি সম্ভবত নিজের আচরণে খানিকটা অপরাধবোধে ভুগছেন, আর বোধহয় সেজন্যেই তিনি তাঁর সুন্দরী অপরূপা স্ত্রীর জন্যে একশো একটা লাল গোলাপের বিশাল তোড়া অর্ডার দিয়েছিলেন, এইমাত্র পৌঁছে দিয়ে গেল শোফারচালিত একটা কার। এ স্রেফ মনে করিয়ে দেয়া যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সত্যি ভালবাসেন। ঘটনাটা যারা চাক্ষুষ করল

তারা এর মধ্যে ভারী মিষ্টি রোমান্টিকতার সুবাস খুঁজে পেল। ভাগ্যিস তারা আসল ব্যাপারটা জানে না।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোটেলে ঢোকার পর, লোটাসের করুণ হাল সম্পর্কে মাথায় যা এসেছে লোকজনকে তাই বলে সুসমিকে নিয়ে নিজেদের স্যুইটে ঢুকে পড়েছে রানা। দরজা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর তাকাল সুসমির দিকে। শরীরের এখানে-সেখানে খুচরো কাটাকুটির দাগ, কাপড়চোপড় কোথাও কোথাও ছেঁড়া, চুল এলোমেলো, কিন্তু তারপরও পরমাসুন্দরী।

সুসমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা ভুলে গেছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। 'ওহ্, রায়না! বেঁচে আছি! আমরা এখনও বেঁচে আছি! যতক্ষণ ওই গাড়িতে বসেছিলাম, প্রতিমুহূর্তে ভেবেছি এ-যাত্রা প্রাণে বাঁচলে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব...'

থেমে গেল সুসমি। থমকে গেল রানা।

নিজেকে রানার বুক থেকে প্রত্যাহার করে নিল সুসমি। পিছু হটছে সে। খপ্ করে তার হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। 'মানে? কি সেই অপরাধ, যা তুমি ক্ষমা করতে চাও?'

শুধু কি প্রথমশ্রেণীর ট্রেনিং পেয়েছে, এ মেয়ের অভিজ্ঞতাও তো কম নয়। নিজেকে সামলে নিতে পাঁচ কি সাত সেকেন্ডের বেশি লাগল না তার। 'তোমার অপরাধ,' থেমে থেমে বলল সে, 'প্ল্যানটা আমার কাছে গোপন রেখেছ।'

'কি প্ল্যান?' রানা বুঝতে পারছে আসল প্রসঙ্গ চেপে রাখতে চাইছে সুসমি।

'ওঅরহেড সহ সাবমেরিনগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হলে অন্তত একটা নিয়ে পালাবে তুমি। কাজটা এমনভাবে করা হবে চীন বা আমেরিকা যাতে বুঝতে না পারে যে নিজের মাতৃভূমিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা উপহার দিলে তুমি।'

'এ তোমার বানানো গল্প,' বলল রানা। 'তুমি আমাকে অন্য

কোন ব্যাপারে অপরাধী বলে মনে করো। কি সেটা, সুসমি? আমাকে জানতে দাও কি আমার অপরাধ।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুসমি। সে কিছুই বলতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে বলে, তোমাকে আমার ভালবাসা উচিত নয়, কারণ তুমি আমার প্রথম প্রেমকে হত্যা করেছ। আবার ভাবছে, হুতাওকে ভুলে যাওয়া অন্যায়, কিন্তু ভুলতে পারলে শান্তি পেতাম। তবে আসল শান্তি পাব হুতাও হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পারলে। না!

সুসমির চিন্তা-ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে দু'জনেই ওরা রেহাই পেল দরজায় মৃদু নক হতে। ঝট করে ঘুরে সেদিকে এগোল সুসমি।

'না!'

থমকে ঘাড় ফেরাল সুসমি। রানাকে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে, তবে ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা। 'এই মাত্র ফিরলাম আমরা, এখুনি বিপদ আশা করছ?'

'সাবধানের মার নেই,' বলল রানা। 'তাছাড়া কবীর চৌধুরীকে তুমি চেনো না। সময়মত নয়, সময়ের আগে থাকতে পছন্দ করে সে।' সুসমিকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে চলে এসে প্রায় কোন শব্দ না করে কবাট খুলল, পিস্তলটা পিছনে লুকিয়ে রেখেছে।

লাল গোলাপের বিশাল এক তোড়া দেখল রানা। গোলাপগুলোর আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে তরুণ বেল বয়। ওকে রানা চেনে।

'সিনোরা চ্যাটার্জির জন্যে লাল গোলাপ।'

'ধন্যবাদ।' পাঁচ ডলারের একটা নোট হাতছাড়া করে ফুলের তোড়াটা নিল রানা।

দরজা বন্ধ করে রানার মুখোমুখি হলো সুসমি। শুকনো গলায় বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার এই উপহার আমি নিতে পারি না।'

'তুমি ভুল বুঝছ, অন্তত এই অপরাধটার জন্যে আমি দায়ী নই,' ম্লান হেসে বলল রানা। 'এটা সম্ভবত হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাঠিয়েছে–এখনও আমরা বেঁচে থাকায় বিল দিতে পারব, এই আনন্দে।'

'ও। এই ফুল তাহলে তুমি দিচ্ছ না?' ম্লান দেখাল সুসমিকে। 'ওটা ধরে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ, বোকা বোকা লাগছে তোমাকে।' হাত বাড়িয়ে তোড়াটা নিল সে। ফুলগুলো সাজানো হয়েছে বেতের তৈরি একটা টবে, টবটা নিচু টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'কিছু যদি মনে না করো, রায়না, আমার একটু প্রাইভেসী দরকার।'

'আমি রায়না নই। রানা। তবে এই নামটাও উচ্চারণ কোরো না। কারণ এখানে আমি প্রতুল চ্যাটার্জি নামে উঠেছি, কাগজ-পত্রেও তাই লেখা আছে।' সুসমির দিকে পিছন ফিরল ও। 'শাওয়ার সারতে আমার পনেরো মিনিট লাগবে।'

রানা কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে নিজের ব্যাগ থেকে চারকোনা ও সরু একটা পাউডার-কমপ্যাক্ট বের করল সুসমি। সেটা খোলার পর আরেক ক্যাচ-এ চাপ দিয়ে ছোট্ট মিরর বা আয়নাটা উন্মুক্ত করল। গোলাপ তোড়ার দিকে ফিরে হাত বাড়াল, সেলোফেনে মোড়া সাদা এনভেলাপটা বের করে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল মুখটা। এনভেলাপে একটা কার্ড রয়েছে, সেটার দিকে একবার মাত্র চোখ বুলাল, তারপর এনভেলাপের পিছনের গায়ে সাঁটা খাঁজ কাটা লাইনিং পেপারটা সাবধানে খুলে নিল। এটা কমপ্যাক্ট মিররের পিছনের ফাঁকা জায়গাটার মাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সুসমি কাগজটা বসিয়ে আয়নাটা জায়গামত রাখল। এরপর মেসেজটা পড়তে শুরু করল সে।

মিনিট পনেরো পর বাথরূম থেকে বেরিয়ে এসে রানা জানতে চাইল, 'আশা করি সব ঠিক আছে? এতবড় তোড়া পাঠিয়ে নিশ্চয়ই কিছু বোঝাতে চাওয়া হয়েছে–কি, বলবে আমাকে?'

'রানা…প্রতুল, ট্যাংকার সিলভার বোদাল সম্পর্কে ইনফরমেশন চেয়েছিলাম। বেইজিং থেকে সেটাই পৌঁছেছে এখানে। ভারী ইন্টারেস্টিং তথ্য, বুঝলে।' উৎফুল্ল দেখাল তাকে, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস।

'লাল গোলাপ,' বলল রানা। 'আমার বোঝা উচিত ছিল।'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সুসমি। 'ইনফরমেশনটা আমি আগে পেয়ে যাওয়ায় তোমার যেন মন খারাপ হয়ে গেল?'

জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'মেসেজে কি বলা হয়েছে?'

রানার দিকে পিছন ফিরল সুসমি। কৌতুক করে একটা সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করল রানার–তোমার পিছন দিকটাও সুন্দর। তবে সম্পর্কটা এমনিতেই জটিল ও আড়ষ্ট, কাজেই এমন কিছু করা বা বলা উচিত হবে না যাতে সঙ্কট আরও বাড়ে। 'সিলভার বোদাল আঠারো মাস আগে সেইন্ট নাজায়ারে পানিতে নামানো হয়, তবে ডেলিভারি দেয়া হয় আরও চার মাস পর। সেই থেকে কমার্শিয়াল ভয়েজে যাবার কোন রেকর্ড নেই ওটার।'

রানার দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ল। 'এত লম্বা সময় নিশ্চয়ই ট্রায়ালে কাটাচ্ছে না। হয়তো কোন মেকানিক্যাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। তীর বা কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে।'

মাথা নাড়ল সুসমি। 'অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে মেরামত করতে হবে কোনও হারবারে। এই সাইজের একটা ট্যাংকার রিসিভ করতে পারবে, সারা দুনিয়ায় এরকম হারবার আছে মাত্র চোদ্দটা। সেগুলোর কোনটাতেই সিলভার বোদালকে দেখা যায়নি।'

তথ্যটা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল রানার। সিলভার বোদাল আকৃতির একটা ট্যাংকার বানাতে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের বাৎসরিক বাজেটের কয়েকগুণ বেশি টাকা লাগার কথা। এত বড় একটা জিনিস বানাবার পর সেটাকে ব্যবহার না করা স্রেফ পাগলামির নামান্তর। যদি না…এমন কি

হতে পারে যে সিলভার বোদাল তৈরির খরচটা তেল পরিবহনের পরিবর্তে অন্য কোন কাজে লাগিয়ে তোলা হবে? সুসমির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি জানো, তোমাদের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন কুবলাই খান যখন নিখোঁজ হয়, সিলভার বোদাল কোথায় ছিল?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সুসমি বলল, 'এটা আমাদের নৌ-বাহিনীর গোপন তথ্য, রানা। কুবলাই খান ঠিক কোত্থেকে নিখোঁজ হয়েছে, এটা আমি তোমাকে জানাতে পারি না। তুমি জোর করলে আমি মিথ্যে তথ্য দেব।'

'সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে উত্তরটা দিতে পারো না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'অন্তত এটুকু বলো যে দুটো জলযান সে-সময় একই এলাকায় ছিল কিনা।'

'হ্যাঁ, তা ছিল। কুবলাই খানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর আমরা আশপাশের অনেক জাহাজ ও সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ করি—ওগুলো কোন বেতার বার্তা পেয়েছে বা আবর্জনা দেখেছে কিনা জানার জন্যে। ওগুলোর মধ্যে সিলভার বোদালও ছিল। নামটা কিন্তু সুন্দর, তাই না? কিন্তু অর্থটা জানা নেই। এটা কি বাংলা শব্দ?'

'বোদাল শ্রুতিকটু একটা শব্দ। ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষা সংস্কৃত, সেই ভাষার একটা শব্দ। এর মানে হলো বোয়াল মাছ।' চোখ সরু করে অন্য কথা ভাবছে রানা, সুসমির মন্তব্য যথার্থ। গোটা ব্যাপারটা ভারী ইন্টারেস্টিং। সন্দেহজনকও বটে। প্রকাণ্ড, ধীরগতির একটা ট্যাংকার হতে পারে প্রয়োজন অনুসারে ঠিক উপযোগী একটা কাভার। কেউ সন্দেহ বা ধারণা করবে না যে খুঁজে নিয়ে একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে ওটা। অথচ কারও মনে কোন প্রশ্ন না তুলে বা উত্তেজনা সৃষ্টি না করে মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর সাগরে থাকতে পারবে। আকারে বিশাল হওয়ায় বিপুল টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট আর আর্মামেন্টও লুকিয়ে রাখা সম্ভব। আবার সুসমির

দিকে তাকাল রানা। 'কবীর চৌধুরীর ল্যাবে ট্যাংকারের মডেলটা যখন দেখলে তুমি, তোমার চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েছে?'

উত্তর দেয়ার আগে কি যেন স্মরণ করতে চাইছে সুসমি। তারপর বলল, 'এর কোন গুরুত্ব আছে কিনা আমি জানি না, তবে বো একটু অদ্ভুতই।'

'অদ্ভুত কোন্ অর্থে?'

'বেশিরভাগ ট্যাংকারের বো হয় ভোঁতা, কিন্তু সিলভার বোদালের নাক খাড়া। এর হয়তো তেমন কোন গুরুত্ব নেই। ডিজাইন তো হরহামেশা বদলাচ্ছে। ডিজাইনাররা হয়তো ভেবেছে এত বড় ট্যাংকারের বো এরকম হওয়াই উচিত।'

'হয়তো।' ঝুল-বারান্দা হয়ে বহু দূরে চলে গেছে রানার দৃষ্টি। অস্পষ্ট একটা আলো মিটমিট করছে, সম্ভবত কোন স্টীমারের। 'তবে আমার মনে হচ্ছে কাছ থেকে একবার দেখা দরকার। তুমি কি বলো? এবার আশা করি অভিযানের আয়োজনটা আরও ভাল হবে। আমি প্রথমে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার বসের সঙ্গে কথা বলব, তারপর দেখব নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে পাই কিনা।'

'নুমা?' শিরদাঁড়া খাড়া, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুসমির। 'ওটা না মার্কিনিদের একটা এসপিওনাজ সংস্থা?'

'হ্যাঁ, হয়তো,' বলল রানা। 'এরকম আঁতকে ওঠার বা ঘাবড়ে যাবার কি আছে? চীন আর আমেরিকা তো এখন প্রায় বন্ধুই।'

'বাজে কথা বোলো না!' কঠিন সুরে বলল সুসমি। 'আমেরিকা একমাত্র সুপারপাওয়ার হয়ে সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে– ভেবেছ এই পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দেব আমরা? দেখতে থাকো, চীন আবার হঠাৎ কোন্দিন আমেরিকার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।'

'তখন সবার মাথার ওপর সম্ভবত দুটো ছড়ি ঘুরবে,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গ থাক। নুমার সাহায্য নিতে যাচ্ছি আমি। এ-

ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি নেই তো–অফিশিয়ালি?'

'সেটা আমি তোমাকে পরে জানাব,' বলল সুসমি।

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'টেলিফোন দুটো সেরে তোমাকে নিয়ে ডিনার খেতে নামব।'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল সুসমি। ভাবল, সবাইকে জানাতে হচ্ছে এই লোকটা আমার স্বামী। এর সঙ্গে ডিনার খেতে বসে আমাকে হাসতে হবে, গল্প করতে হবে, কৌতুক শুনে হাসতে হবে। অথচ এই লোককে আবার আমার খুনও করতে হবে।

হায়, দেশকে ভালবেসে কিছু করতে চাইলে কি রকম সঙ্কট. আর বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তা যদি সবাই জানত!

পনেরো

'ওই দেখা যায়, সার,' নুমার হেলিকপ্টার পাইলট জয়স্টিক ধরা হাত স্থির রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে পোর্ট-এর দিকটা দেখাল, রদেভোঁয় পৌঁছাতে পারার আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে হাসছে। আবহাওয়া যেভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, ইউ.এস.এস. লিংকন আর বেশিক্ষণ সাগরের সারফেসে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। সময়মত পৌঁছুতে পারায় পাইলটের খুশি হবারই কথা। সিটের ওপর ঘুরে বসে নিচে তাকাল রানা, চুরুট আকৃতির ও ধূসর রঙের সাবমেরিনটাকে খুঁটিয়ে দেখল। তাহলে মার্কিনীদের ঠিক এরকমই অন্য একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চুরি গেছে। টোয়েনটি-ফুট সেইল-এর দু'দিকে বেরিয়ে রয়েছে ডাইভিং

প্লেইন। খেপা, ফুলে ফুলে ওঠা সাগর খোলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আঘাত করছে প্লেনগুলোর তলায়। তিনশো ফুট লম্বা এরকম একটা সাবমেরিন বা মৃত্যুদূত বাংলাদেশের মত একটা ভূখণ্ডকে কবীর চৌধুরীর কড়াই বা গামলার বড় মাপের সংস্করণে পরিণত করতে পারে অনায়াসে। 'এখনও যে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' রানার এই মন্তব্যে প্রথমে বিস্মিত, তারপর শ্রদ্ধায় বিগলিত হলো পাইলট, যদিও মুখে কিছু বলল না। গোটা ব্যাপারটা জানে সে, রানার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হবার সেটাই কারণ। পেন্টাগন ও মার্কিন নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার নিখোঁজ নিউক্লিয়ার সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিনকে খুঁজে দেয়ার জন্যে নুমার মাধ্যমে বিসিআই তথা মাসুদ রানাকে অনুরোধ করেছে। এর মানে হলো, বাংলাদেশ সাহায্য করছে যুক্তরাষ্ট্রকে, সচরাচর যেমনটি ঘটে এখানে ঠিক তার উল্টোটা ঘটছে। কাজেই কৃতজ্ঞ হবার কথা বলে রানা আসলে বিরল ভদ্রতার পরিচয় দিল। 'ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে, সার। আপনারা বরং তৈরি হয়ে নিন।'

কমব্যাট ওভারঅল আর হেলমেট পরা সুসমির দিকে তাকাল রানা প্রায় সব ঢাকা, তারপরও পাকা বেদানা রঙের মেয়েটিকে সুন্দর বলতে হবে। চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা কাজে লাগল না, সিট ছেড়ে পিছনের কেবিন অর্থাৎ উইঞ্চিং ইকুইপমেন্টের দিকে চলে গেল সে। রানা চিন্তিত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ওর কাছ থেকে আরও বেশি দূরে সরিয়ে নিচ্ছে সুসমি।

'ত্রিশ ফুট পর্যন্ত নামছি, সার।'

পাইলটকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্রুদের দিকে তাকাল রানা, ওর হারনেস চেক করছে তারা, উইঞ্চিং লাইনে স্ট্রেপ আটকাচ্ছে। 'সার,' তাদের একজন বলল, 'আপনারা যদি মেঝেতে বসে পরস্পরের লম্বা করা বাহু ধরেন, আমরা তাহলে দু'জনকে একসঙ্গে নামাতে পারব।'

হাসি চেপে রানা ভাবল, বেচারি সুসমি। যে লোক চোখের কাঁটা, তার সামনে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসা একটা মেয়ের জন্যে যে কি বিড়ম্বনা, একমাত্র সেই জানে। অপেক্ষায় থাকল রানা, সুসমি প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে আয়োজনটা নিরবে মেনে নিল সুসমি, বরং দ্রুতই নির্দেশিত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। চার-পাঁচটা কৌতুক লাফ দিয়ে ঠোঁটে এসে ভিড় জমাল, তবে সবগুলোকে দমিয়ে রাখল রানা। নিনা সুসমিকে আরও খেপিয়ে তোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এমনিতেই চীনা মেয়েরা প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়, যখন-তখন তা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়েও আসে। রানা আশা করল সুসমির হাতে অস্ত্র থাকার সময় সেই বিস্ফোরণ যেন না ঘটে।

হ্যাচ কাভার পিছন দিকে লাফ দিল, উন্মত্ত সাগরের হুংকার রোটর ব্লেডের একটানা গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে ভরে উঠল কেবিন। পাইলটের গলার পাশে শিরাগুলো ফুলে উঠতে দেখল রানা, কপ্টার যথাসম্ভব স্থির রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

'আপনারা বললেই!'

রানার কাছ থেকে এক গজ দূরে বসেছে সুসমি, তবে পাইলটের কথা শুনে মাথাটা আরেক দিকে ঘুরিয়ে শরীরটা ঠেলে সামনে নিয়ে এলো। ঢুকে পড়ল রানার দুই বাহুর মাঝখানে। একজন ক্রু ঢিলে উইঞ্চটাকে টান-টান করল। 'কিনারা দিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিন পা, পিছন থেকে ঠেলে ফেলে দিই আমি।'

ক্রুর কথামত কাজ করল রানা, অনুভব করল সাগরের ঢেউ থেকে লাফিয়ে ওঠা পানি ওর বুট ভিজিয়ে দিচ্ছে। নিচে তাকাতে দেখল লিংকনের খোলটাকে অনবরত চাবকাচ্ছে অশান্ত সাগর। সুসমির মাথা ওর মাথায় ঠেকে আছে, তার সুবাস পথ খুঁজে নিয়ে ওর নাকে ঢুকল। পিঠে বেশ জোরাল একটা ধাক্কা অনুভব করল ও, পরমুহূর্তে ঝুলে পড়ল শূন্যে, ওর বাহুর ভেতর সুসমি, বগলের

তলায় ডেবে যাচ্ছে হারনেস। বাতাস আর পানির অবিরত ছিটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানির রঙ ধূসর, সাদা ফেনার রেখাগুলোকে সাগরের পাঁজরের মত লাগছে, নিয়ম-শৃংখলার ধার না ধেরে সাবমেরিনের বোকে ডুবিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে দেখে মনে হলো একটা ঘূর্ণাবর্তে পড়তে যাচ্ছে ওরা।

'ঠিক আছে, ওঁদেরকে আমি ধরেছি।' ইংরেজিতে মার্কিনী বাচনভঙ্গি; কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস থাকায় স্বস্তিবোধ করল রানা। একটা পোল-এর সাহায্যে ওর মাথার ওপরকার তার স্থির রাখা হলো, পা দুটো স্পর্শ করল সাবমেরিনের ধাতব আবরণ, ঠিক যখন ব্রিজের ওপর ভেঙে পড়ল একটা ঢেউ। ছুটে এসে একজন রেটিং স্ট্রপ খুলে দিল। উইঞ্চিই লাইন এক ঝটকায় মুক্ত হয়ে দ্রুত এঁকেবেঁকে হেলিকপ্টারে উঠে যাচ্ছে। হাত তুলে নাড়ল রানা, জবাবে পাইলট স্যালুট করল নুমার অন্যতম প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে। হ্যাচ ডোর বন্ধ হলো, খানিক ওপরে উঠে স্টারবোর্ড-এর দিকে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা সাবধানী দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে সুসমি। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে আছে, কঠিন একটা জেদ আর দৃঢ় সঙ্কল্পে চকচক করছে চোখ জোড়া।

কমান্ডার ফিটজেরাল্ডকে দেখামাত্র পছন্দ করল রানা। ভদ্রলোক লম্বা, শিরা ও পেশি যেন পাল্লা দিয়ে সারা শরীরে বেরিয়ে আছে, তাঁর তুলনায় ছোট মনে হচ্ছে কেবিনটাকে। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ, সবচেয়ে বেশি চোখের চারপাশে, যেন দুপুর-রোদে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করলেন ওদের সঙ্গে। 'ওয়েলকাম এবর্ড, মেজর। অ্যান্ড ইউ...'

রানা দেখল সুসমির ওপর চোখ পড়তেই কমান্ডার ফিটজেরাল্ডের চোখ সরু হয়ে গেল, প্রায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সুসমি, হেলমেট খুলে সমস্ত চুল

ছড়িয়ে দিল মাথার তিন পাশে।

'আমি দুঃখিত,' ফিটজেরাল্ড বললেন। 'কোন মেয়েকে আমি আশা করিনি।'

'চাইনিজ গণফৌজ-এর একজন মেজর আমি, নিনা সুসমি,' বলল সে, গলা ঠাণ্ডা। 'প্লীজ, সেভাবেই দেখবেন আমাকে। আমার সেক্স কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কমান্ডার ফিটজেরাল্ড দ্বিমত পোষণ করতে যাচ্ছেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনি যা বলেন, মেজর সুসমি। যাই হোক, আপনারা এখানে পৌঁছেছেন, এটাই বড় কথা। এই আবহাওয়ায় আমি ভয় পাচ্ছিলাম...'

'সার্ডিনিয়া থেকে রওনা হবার পর সারাক্ষণ শেডিউলের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরাও,' বলল রানা। 'সিলভার বোদালের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হতে কতক্ষণ লাগবে বলে আপনার ধারণা?'

উত্তর আটলান্টিকের একটা চার্ট খুললেন কমান্ডার ফিটজেরাল্ড। 'যেখানে ওটা আছে বলে আন্দাজ করছি, ঘণ্টায় পঁচিশ নটে এগুতে পারলে রেঞ্জের ভেতর পেতে ঘণ্টা দশেকের মত লাগবে।'

মনে মনে হাসল রানা। লস অ্যাঞ্জেলেস্ ক্লাস সাবমেরিনের স্পীড অনেক কমিয়ে বলছেন ফিটজেরাল্ড। 'আর তারপর ওটাকে আমরা থামতে বলব।'

সুসমির গলা একটু চড়া। 'কোন অজুহাতে?'

'তেল লীক করার,' বললেন ফিটজেরাল্ড। 'অয়ল প্যালিউশন বিশ্ব জুড়ে বিষম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ বছর শুধু যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলেই দশ মিলিয়ান গ্যালন ক্রুড অয়েল ছড়িয়েছে। বোদালের যে সাইজ, ঝুঁকির মাত্রা ভয়ংকর। আপনি জানেন এই আকারের একটা ট্যাংকার কি পরিমাণ তেল বহন করতে পারে? পাঁচ লাখ টনেরও বেশি।'

'অজুহাত হিসেবে মন্দ নয়,' বলল সুসমি। 'তবে সিলভার বোদাল যদি আমাদের নির্দেশ মানতে না চায়, তখন কি হবে?'

চার্ট গোল পাকাতে শুরু করে ফিটজেরাল্ড বললেন, 'সে ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে বলে আমি অন্তত মনে করি না, মেজর সুসমি। তবে একান্ত যদি সেরকম কিছু ঘটে, মিস্টার মাসুদ রানা চাইলে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে ওটাকে থামাতে পারব।'

'মিস্টার মাসুদ রায়...রানা চাইলে?' সুন্দর ভুরু জোড়া ভাঁজ করায় আরও সুন্দর হয়ে উঠল সুসমির চেহারা।

অমায়িক হেসে কমান্ডার ফিটজেরাল্ড বললেন, 'ইউ.এস. নেভীর হেডকোয়ার্টার থেকে সেরকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে আমাকে—আমি এই সাবমেরিনের কমান্ডার, কিন্তু যে অপারেশনটা শুরু হতে যাচ্ছে সেটার নেতৃত্বে থাকবেন মিস্টার মাসুদ রানা।' রানার দিকে ঘুরলেন তিনি। 'আমাদের কাছে কনভেনশন্যাল আর্মামেন্ট আছে, মিস্টার রানা। ইউএসএস লিংকন পানির ওপর ওঠার পর ওরা চিনতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না।'

শ্রাগ করল সুসমি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে একমত হতে পারছে না।

রানাও নিজের অস্বস্তি চেপে না রাখার সিদ্ধান্ত নিল। 'মিস সুসমির উদ্বেগের কারণ আছে, কমান্ডার। এই লোক, মানে ডানকিলাস নিরো ওরফে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে এক ধরনের যোগাযোগ হয়েছিল, ফলে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি কি তার ক্ষমতা আর মানুষ হিসেবে সে কতখানি নিষ্ঠুর। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করার লোক সে নয়।'

'বেশ, সেক্ষেত্রে তার যুদ্ধের সাধ মেটানো হবে।' কমান্ডার ফিটজেরাল্ডের চোয়াল ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠল। 'আপনার সম্মতি পেলে আমাকে ওই লোকের ট্যাংকারে একটা বোর্ডিং পার্টি

পাঠাবার অনুমতিও দেয়া আছে–প্রয়োজনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে হলেও। এই কাজের জন্যে কি ধরনের লোকজন আমি সংগ্রহ করে এনেছি আপনি এখনও দেখেননি, মিস্টার রানা। তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার কোন তুলনা হয় না।'

'সে ব্যাপারে আমি কোন প্রশ্ন তুলছি না,' বলল রানা। 'এমন কি মার্কিন নেভির সমালোচনাও করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি, আমরা প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি, যার সঙ্গে আজ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কেউ জিততে পারেনি।'

কমান্ডার ফিটজেরাল্ড গম্ভীর হেসে বললেন, 'তাহলে এটা একা শুধু আমার জন্যে নয়, আপনার জন্যেও মস্ত একটা চ্যালেঞ্জ।' সুসমির দিকে ফিরলেন তিনি। 'এবং আপনার জন্যেও। তবে আপাতত, সম্ভবত যুদ্ধ নয়, আপনার দরকার শাওয়ার, মেজর নিনা সুসমি। আপনি ইচ্ছে করলে আমার কেবিনেরটা ব্যবহার করতে পারেন।'

সুসমির নাকের ফুটো বড় হলো। 'আমাকে বিশেষ খাতির করার কোনও প্রয়োজন নেই, ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড।'

'তবু আমি বলব, কাউকে কাউকে বিশেষ খাতির করার ইচ্ছে জাগে সেটা তাদের পাওনা বলেই, কিন্তু সব সময় তা করতে পারা যায় না।' রানার দিকে ফিরলেন ফিটজেরাল্ড। 'চলুন আপনাদের কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিই। ওটা সম্ভবত মিস সুসমির সঙ্গে শেয়ার করতে হবে আপনাকে–আশা করি উনি কিছু মনে করবেন না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে;' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এর আগে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে হোটেলেও তো একসাথে থেকেছি।'

সুসমি কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল।

অচিরেই ওরা দু'জন আবিষ্কার করল যে কেউ যদি কোনও মার্কিন সাবমেরিনের ক্রু হয় তার অন্তত না খেতে পেয়ে মারা যাবার ভয় নেই। খাদ্য তালিকায় সব ভাল খাবারই পাওয়া গেল,

তবে পরিবেশে আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ আড়ষ্ট একটা ভাব থাকায় সময়টা তেমন উপভোগ্য হয়ে উঠল না। রানা ও সুসমি দু'জনেরই মনে হলো, ভাষা বা কোন রকম ইঙ্গিত-ইশারা ব্যবহার না করেও কমান্ডার ফিটজেরাল্ড তাঁর অফিসারদের যেন সতর্ক করে দিচ্ছেন, এদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

বোর্ডিং পার্টির সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। ফিটজেরাল্ড বললেন, 'আপনার জন্যে এদেরকে বাছাই করা হয়েছে, আপনিই এদেরকে নেতৃত্ব দেবেন।'

রানা খুঁটিয়ে দেখল সবাইকে। যোগ্য ও দক্ষ বলা যায়, তবে শ্রেষ্ঠ বা সেরাদের দলে এরা পড়ে না। ওদের একজন লীডার আছে, নাম মাইকেল টাগ–দেখতে ছোটখাট পাথুরে একটা পাহাড়, গলার আওয়াজ যেন মেঘের ডাক। 'আপনাদের ওই ট্যাংকার কোন দেশের পতাকা ব্যবহার করছে...সার?' জানতে চাইল সে।

'সময় ও সুযোগ মত পতাকা বদলায়,' বলল রানা। 'শেষবার তাকে বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার করতে দেখা গেছে বলে শুনেছি।'

'ওহ্, গ্রেইট! বাংলাদেশকে আক্রমণ করার জন্যে আমরাই প্রথম কমব্যাট রিবন অর্জন করব।'

রানা ব্যাপারটাকে কৌতুক হিসেবেই নিল। কিন্তু সুসমি বলল, 'আমেরিকানদের কাণ্ডজ্ঞান ও রসবোধ, দুটোই আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। এখানে একজন বাংলাদেশী রয়েছেন, তোমরা তাঁর অধীনে একটা অপারেশনে অংশ নিতে যাচ্ছ, অথচ ধোঁকা দেয়ার জন্যে একজন ক্রিমিন্যাল তাঁর দেশের পতাকা ব্যবহার করছে শুনে বলে ফেললে আমেরিকা বাংলাদেশকে আক্রমণ করবে। বাহ!'

'কৌতুক! স্রেফ ঠাট্টা!' তাড়াতাড়ি বলল মাইকেল টাগ। 'আপনি কিছু মনে করবেন জানলে...'

'মনে করতাম, কথাটা যদি তুমি চীন সম্পর্কে বলতে,' আড়চোখে রানাকে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিল সুসমি।

'আমি কিছু মনে করিনি, ব্যাপারটাকে কৌতুক হিসেবেই নিয়েছি,' হাসিমুখে বলল রানা। 'মনে করতাম, যদি জানতাম যে ওরা জানে না বিপদের সময় আমেরিকাকে সাহায্য করতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।'

এই মৃদু উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য-বিনিময়ের চার ঘণ্টা পর আধো-ঘুম থেকে জাগানো হলো রানাকে, গায়ে মৃদু চাপ দিয়ে। 'আমরা বোধহয় পৌঁছে গেছি, সার। আমরা সবাই আফ্‌ট্‌-এ জড়ো হচ্ছি।'

চোখ মেলার পর রানা দেখল কেবিনে সুসমি ছাড়া আর কেউ নেই। মেসেজটা দিয়ে ক্রু চলে গেছে। বাঙ্ক থেকে নামতে যাবে, রানা দেখল নিচের বাঙ্কে বসে নিজের বেরেটা চেক করছে সুসমি। ওটায় তাকে বুলেট ভরতে দেখে প্রশ্নটা আপনা থেকেই জাগল মনে। 'ব্যাপারটা নিয়তির ওপর ছেড়ে দিচ্ছ, নাকি ওগুলোর একটায় আমার নাম খোদাই করে রেখেছ?'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সুসমি, এবং এই প্রথম তার চেহারায় উথলে ওঠা ভাবাবেগ চাক্ষুষ করল রানা। 'তাওজি হুতাও। তোমার কাছে এই নামের বিশেষ কোন অর্থ আছে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তুমি তাকে খুন করেছ!'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলছে রানা। 'তুমি জানো আমার এই পেশা আমাকে...'

'আমি জানি মানুষ খুন করার লাইসেন্স আছে তোমার!' সুসমির চোখ দুটো থেকে আগুন বেরুচ্ছে। 'ওই লাইসেন্স আমার নেই, কিন্তু ওই ছেলেটাকে আমি ভালবাসতাম!'

'ওহ্, আমি দুঃখিত।' রানা সিরিয়াস। 'ব্যাপারটাকে আমি হালকা করতে চাইছি না, কিন্তু সত্যি বলছি আমি বুঝতে পারছি

না তুমি কার কথা বলতে চাইছ।'

'বেশি দিন আগের কথা নয়, তুমি ফ্রেঞ্চ আল্পস্-এ যাওনি?'

'ও, হ্যাঁ।' রানার গলার সুরে স্বস্তির আভাস। ব্যাপারটা কি নিয়ে বুঝতে পারল ও। না, এতটুকুও অপরাধবোধ জাগল না। 'ওই লোকটাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল মাইকেল টিচার নামে এক সিআইএ এজেন্টকে খুন করার। লোকটা আমাকে টিচার বলে ভুল করে। ব্যাপারটা ছিল—দু'জনের একজনকে মরতে হবে, হয় আমাকে নয়তো তাকে। সে আমাকে খুন করবে, আর আমি নিজেকে বাঁচাব। কেউ আমরা কাউকে চিনতাম না। তাই পূর্ব-শত্রুতার প্রশ্ন ছিল না। সে মারা গেছে, আমি বেঁচে আছি, এ স্রেফ তার জন্য দুর্ঘটনা আর আমার জন্য ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। সে যদি তোমার কেউ হয়ে থাকে...'—রানার গলা ম্লান হয়ে এলো—'...তাহলে সত্যিই আমি দুঃখিত। শুধু এটুকু বলতে পারি যে ব্যাপারাটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল।'

সুসমির চোখে ক্ষমা নেই, কথা না বললেও এখনও তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিতে ঘৃণা।

রানার মনে হলো আরও কিছু বলে। 'সুসমি, দু'জন আমরা একই পেশায় রয়েছি। আমরা স্পাই। এ বড় নোংরা কাজ। আমরা বিশ্বাস করতে চাই বটে যে মূল লক্ষ্যটা মহৎ, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে পারি না। আমরা দু'দশজন মানুষ মারি, এই আশায় যে লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে। তুমি যার কথা বলছ, সেই তাওজি হুতাওয়ের প্রতি আমার কোন রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না।'

সুসমির ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে তিক্ত হাসিতে ভরে উঠল। 'কারণ তুমি বেঁচে আছ!'

'কারণ আমি ভাগ্যবান!' রানার মুখ থেকে ছররার মত বেরিয়ে এলো শব্দগুলো। 'যখন প্রশ্ন দাঁড়ায় খুন হও বা করো, আমি করি। তুমিও তাই। এই খেলার এই নিয়ম।' বাঙ্ক থেকে পা

ঝুলিয়ে বড় একটা বিড়ালের মত নিঃশব্দে নিচে নামল।

সুসমির চোখে পলক নেই, দৃষ্টি আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। কথা বলার সময় শব্দগুলো বেরুল ধীরে ধীরে, স্পষ্ট হুমকির সুরে। 'যে খেলা খেলি আমি, তার নিয়ম-কানুন আমার ভালই জানা আছে। এই মিশন শেষ হয়ে গেলে তাওজি হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে। সে নেই, তুমিও থাকবে না।' লোড করা ক্লিপ ঠেলে বেরেটায় ঢোকাল সে।

সুন্দর, সাহসী একটা অবয়ব; ঘুমাবার চেষ্টা করায় আগোছাল হয়ে আছে মাথার চুল। সঙ্কল্পে দৃঢ় চোয়াল, গর্বে উঁচু হয়ে থাকা চিবুক। সব মিলিয়ে তীব্র অবজ্ঞা আর চ্যালেঞ্জ ফুটে আছে চেহারায়। 'নিশ্চয় বিশেষ একজনই ছিল সে,' বলে ঘুরল রানা, বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

কেবিনের বাইরে বেরুতেই সাবমেরিনের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জনে মিশে থাকা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অতীতের আরও অনেক অভিযানের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। কমব্যাট টিউনিকের চেইন টেনে দ্রুত পায়ে হাঁটছে, ক্রুদের কোয়ার্টারকে পাশ কাটিয়ে কম্প্যানিয়ানওয়ে ধরে উঠে এলো কন্ট্রোল রূমে। একজন রেটিং পাশ কাটাল ওকে।

কয়েকটা জাম্বো জেটের ককপিট এক করলে যেরকম দেখতে হবে, কন্ট্রোল রূমটা ঠিক সেরকম। স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে ডায়াল, স্ক্রীন, সুইচ, ফ্ল্যাশিং লাইট, টিউব, পাইপিং ও বহুরঙা তার। শার্টের আস্তিন গুটানো দু'জন লোক, মাথায় হেডফোন, ঘামছে। পরিবেশে চাপা উত্তেজনা।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন কন্ট্রোল রূমের মাঝখানে, কাঁধ দুটো সামান্য সামনের দিকে ঢালু। রানাকে দেখে অমায়িক হেসে মাথা ঝাঁকালেন। 'পেয়েছি ওটাকে।' পাশে দাঁড়ানো রেটিং-এর দিকে তাকালেন ফিটজেরাল্ড। 'স্ট্যান্ড বাই সেকেন্ড অবজারভেশন অন দা টার্গেট। আপ 'স্কোপ।'

হিসহিস শব্দ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো পেরিস্কোপ। পেরিস্কোপ অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যান্ডেল ধরে নিচে নামাল। ডেকে হাঁটু গেড়ে হ্যান্ডেলগুলো ধরলেন কমান্ডার, তারপর চোখ সাঁটলেন আইপীস-এ। ঊর্ধ্বমুখী পেরিস্কোপের সঙ্গে ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছেন তিনি। 'একবার চোখ বুলান, মিস্টার রানা।'

এগিয়ে এসে চকচকে হাতল দুটো ধরার সময় এক ধরনের উল্লাস অনুভব করল রানা। শিকারী চোখের সামনে টার্গেট। আর কি একটা টার্গেট! নিখুঁত ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়, তবে দৈর্ঘ্যে ট্যাংকারটা কমপক্ষে সিকি মাইল তো হবেই। পিছন দিকে ব্রিজ স্ট্রাকচার মাথাচাড়া দিয়েছে ছোট একটা দুর্গের মত, আর দেয়ালগুলো যেন সাগরের ওপর পাহাড়-প্রাচীর।

রানার শ্বাসগ্রহণের দ্রুত শব্দ শুনতে পেলেন কমান্ডার ফিটজেরাল্ড। 'ইয়েস! বলতে পারেন আশিটা টেনিস-কোর্টের সমষ্টি। খেয়াল করেছেন, পানিতে কতটা ডুবে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কি কারণ? ব্যালাস্ট?'

'আমার তো তাই ধারণা। বেশি তেল বহন না করলে ব্যালাস্ট হতে বাধ্য।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে পাশে সুসমিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। পেরিস্কোপের দিকে ইঙ্গিত করতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। ব্যাপারটা লক্ষণীয় যে অল্প ক'জন ক্রু যে যার নিজের কাজে এত ব্যস্ত ও মগ্ন, ঢোলা কমব্যাট ইউনিফর্ম ভেদ করে ফুটে থাকা সুসমির নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য চোখ তুলে দেখার সময় পর্যন্ত নেই কারও।

সিধে হলো সুসমি, আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। 'হেলিডেকে আমি একটা হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছি।'

রানা ঘাড় ফেরাল ফিটজেরাল্ডের দিকে। 'আমি নিশ্চিত নই, তবে মনে হচ্ছে ওটা একটা বেল ওয়াইইউএইচ-আইবি। আমাদের প্রতিপক্ষ ডানকিলাস নিরোর মডিফাই করা ওই

মডেলের একটা কপ্টার আছে। আমরা আগে দেখেছি।'

'এরমানে ট্যাংকারে সে থাকতে পারে? ইন্টারেস্টিং।' ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডের চোখ চকচক করে উঠল, বুকটা সামনের দিকে ঠেলে দিলেন। 'ওকে, আরও কাছ থেকে দেখা যাক।' পেরিস্কোপের দিকে এগিয়ে এলেন। একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছেন। 'টার্গেট বেয়ারিং...মার্ক! রেঞ্জ...মার্ক! ডাউন 'স্কোপ।'

সুসমির দিকে তাকাল রানা, কিন্তু ওর দৃষ্টি এড়িয়ে থাকল মেয়েটা। হ্যাঁ, বাবা, মেয়ে বটে! বাঘিনী বললেই হয়। আচ্ছা, যা বলল তাই কি বোঝাতে চেয়েছে সে? কাজ শেষ হয়ে গেলে ওর পিঠে সত্যি একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে? ইচ্ছে হয় দু'হাতের ভেতর টেনে এনে একটা ঝাঁকি দিয়ে কিছু কঠিন সত্য আর উপলব্ধি সংক্রমিত করে তার ভেতর।

ওদিকে টার্গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে সাবমেরিন লিংকন।

'ওয়ান ডিভিশন ইন হাই পাওয়ার।'

'রেঞ্জ সিক্স থাউজ্যান্ড টু হানড্রেড ইয়ার্ডস।'

'অ্যাঙ্গেল অন দা বো স্টারবোর্ড সিক্সটি।'

'কন্ট্রোল–টর্পেডো রুম। বোর্ডিং পার্টি রেডি, সার।'

'বোর্ডিং পার্টি' শুনে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে হুঁশ ফিরল রানার। মেজর নিনা সুসমি তার উদ্ভিন্ন যৌবন আর চোখ ধাঁধানো দেহসৌষ্ঠব নিয়ে বৌদ্ধদের নরকে চলে যাক, যদি থাকে। ভাজার মত আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাছ আছে ওর। তার দিকে পিছন ফিরে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও, সাবমেরিনের মাঝামাঝি কোথাও পৌঁছাতে চায়।

'স্পীড থ্রী নটস্।'

'অফিসার অভ দা ডেক, উত্তরে ঘুরে স্পীড তোলো এগারো নট।'

'ডেক অফিসার বলছি, সার। রাইট, টোয়েনটি ডিগ্রি রানার। টার্নস ফর ইলেভেন নটস্।'

তারপর, 'স্টেডি অন কোর্স, নর্থ।'

টর্পেডো রুমের দিকে এক পা এগিয়েছে রানা, এই সময় সাবমেরিন এমন একটা ঝাঁকি খেলো যে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে এক সারি ইন্সট্রুমেন্ট-এর গায়ে ছিটকে পড়ল ও। সমস্ত আলো নিবুনিবু, মনে হলো জলমগ্ন কোন বাধার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ওরা। লোকজন ছিটকে পড়েছে একজন আরেকজনের গায়ের ওপর, মেঝেতে আগোছাল একটা স্তূপের মত দেখাচ্ছে। কাছাকাছি ছিল, রানার বাহুর ভেতর আটকা পড়েছে সুসমি।

'কন্ট্রোল–সোনার। টোটাল পাওয়ার সাপ্লাইজ ফেইলার অন অল সেটস্।'

'কন্ট্রোল মেনূভারিং। উই আর লুজিং ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। আই শ্যাল হ্যাভ টু ব্রেক ডাউন দা সিস্টেম।'

আলো আবার নিবুনিবু হলো, ক্রমশ উচ্চকিত কান ঝালাপালা করা একঘেয়ে যান্ত্রিক গোঙানি অসুস্থ করে তুলল রানাকে। সাবমেরিনের খোল এমন ভাবে কাঁপছে, যেন একটা ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো করা হচ্ছে ওটাকে। একটা দাঁত ফুটো করার সময় সেটার ভেতর হাজির থাকার মত অনুভূতি হচ্ছে।

'ঈশ্বরের দোহাই!' চেঁচিয়ে উঠলেন কমান্ডার ফিটজেরাল্ড। 'ঘটছেটা কি?' সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'আপনি এরকম ঘাবড়ে গেলে তো...'

পিএ সিস্টেম থেকে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'রিয়্যাক্টার স্ক্রাম! রিয়্যাক্টার স্ক্রাম। এই মুহূর্তে আমরা সমস্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে বঞ্চিত।'

আরেকটা ঝাঁকি খেলো সাবমেরিন, কানের পর্দা ফাটানো একটানা যান্ত্রিক ও কর্কশ ধ্বনি ধাতব শরীর বেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। আলো মিটমিট করে জ্বলল, উজ্জ্বল হতে গিয়েও হলো না, তারপর কমতে কমতে একেবারে নিভে গেল। কাঁপুনির শব্দ কমতে শুরু করল, একই সঙ্গে ভেন্টিলেশন ফ্যানগুলো থেমে যাচ্ছে। এরপর

শঙ্কা ভরা ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধতে শুরু করল। কমান্ডার ফিটজেরাল্ডের কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়ির রেডিয়াম-ডায়াল দেখতে পাচ্ছে রানা। ভদ্রলোক কি ভাবছেন আন্দাজ করতে পারছে ও। ডেকে একটা পেন্সিল গড়াচ্ছে।

তারপর দৃঢ় কর্তৃত্বের সুরে কমান্ডার বললেন, 'সারফেস! ব্লো ফরওয়ার্ড! ব্লো আফট! ফুল এহেড, ফুল রাইজ অন বোথ প্লেইনস্। আপ 'স্কোপ।'

ব্যালাস্ট ট্যাংকে কমপ্রেসড্ এয়ার ঢোকার আওয়াজ কানে তালা মেরে দিচ্ছে। রানার কমব্যাট সুটে সুসমির নখ ঢুকে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে খাড়াভাবে ওপরে উঠছে সাবমেরিন। লিংকন ভাঙছে না, বুঝতে পেরে রানাকে ছেড়ে দিল সুসমি। ফিটজেরাল্ড পেরিস্কোপে চোখ সেঁটে ওটার সঙ্গে সিধে হলেন। কন্ট্রোল রুমে এত বেশি উত্তেজনা যে স্নায়ুতে ব্যথা লাগছে। লোকজন বেঁচে থাকার প্রত্যাশা আর হিসাব করছে সেকেন্ড ধরে। সবাই ওরা দাঁড়িয়ে আছে যেন দোজখের ফটকে একদল পাপী। কমান্ডার ফিটজেরাল্ডের কাঠামোটা কোন রকমে চেনা যাচ্ছে, পেরিস্কোপটা একশো আশি ডিগ্রী ঘোরাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ আঁতকে ওঠার আওয়াজ শোনা গেল। এ হলো বিশ্বাস করতে না চেয়ে আঁতকানো। 'হে ঈশ্বর! এ সম্ভব নয়!'

ষোলো

এবার প্রচণ্ড এক শক ওয়েভের ধাক্কায় অন্ধকারে ছিটকে পড়ল

রানা। কামানের গোলার মত একজন ক্রুর গায়ে আঘাত করল ও, তারপর তাকে নিয়ে পড়ল ডেকে, ঘষা খেয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর থামল; হাত-পা ছড়ানো, চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। ওর চারপাশে লোকজন গোঙাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে, গালি আর অভিশাপও দিচ্ছে। যারা দাঁড়াতে পারল, নিষ্প্রাণ ইকুইপমেন্ট থেকে সাড়া পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। রানা ভাবছে খোলটা ফেটে গেলেই এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়বে সাগর। অন্ধকার বলেই অসহ্য হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বস্তায় ভরা বিড়ালের মত তারা, ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আঁচড়াআঁচড়ি করে কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর দিল রানা, হাতের স্পর্শে কমান্ডার ফিটজেরাল্ডকে ছুঁলো, এই সময় ছোট আরও একটা শক ওয়েভ সাবমেরিনকে ধরে ঝাঁকি দিল। পিছন দিক থেকে ভোঁতা একটা শব্দ ভেসে এলো, কেউ যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে বাড়ি মারছে খোলে।

'এ-সব কি ঘটছে?'

'জানি না। সিলভার বোদাল পিছন দিক থেকে আসছিল। ভাবলাম আমাদেরকে ধাক্কা দেবে।'

'তা দিলে এখন আমরা কথা বলতে পারতাম না। তার আগে কি ঘটেছে? আমরা পাওয়ার হারালাম কেন?'

'জানলে তো বলব। যেন মনে হচ্ছে আমাদেরকে আটকে দেয়া হয়েছে।'

'ঠিক তাই,' সুসমির ঠাণ্ডা গলা পাশ থেকেই শোনা গেল, কথাগুলো কাটাকাটা। 'এ-ধরনের টেকনিক পিপলস রিপাবলিক অভ চায়নায় নিখুঁত ও উন্নত করা হয়েছে। সেজন্যেই এই অপারেশন সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাইনি আমি।'

'চাইলেই বোধহয় ভাল করতেন, আমরা আরও সাবধান হবার সুযোগ পেতাম। আশা করি ভবিষ্যতে বিপদের আভাস দিতে কার্পণ্য করবেন না।'

ভবিষ্যৎ বলে সত্যি কিছু আছে কি?—ভাবছে রানা।

ফিটজেরাল্ড পেরিস্কোপ অ্যাকটিভেট করতে বাতাসের হিসহিস শুনতে পেল ও। চিন্তাটা ঝট করে জাগল মাথায়–সাগর হঠাৎ একদম শান্ত হয়ে গেল কেন? ওরা নিশ্চয়ই এখন সারফেসে, অথচ কোন রকম নড়াচড়া নেই বললেই চলে। কিছু লোক লাইটার জ্বেলেছে, সেগুলোর শিখা একটুও কাঁপছে না। শব্দ বলতে সে-ই অদ্ভুত একঘেয়ে ঢং-ঢং ধাতব শব্দ। রানা অনুভব করল ওর ঘাড়ের পিছনে চুল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

'কি দেখতে পাচ্ছেন বলুন!'

'কিচ্ছু না। একদম কিচ্ছু দেখছি না। ব্ল্যাকআউট।'

'জীজাস!' একজন ক্রুর গলা।

রানা বুঝতে পারছে, আতংকের বীজ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে গোটা সাবমেরিনে।

'আমরা এখন করবটা কি, ক্যাপটেন?' সেই একই ক্রুর গলা। 'হ্যাচ খুলব?'

ফিটজেরাল্ডের গলা এতটুকু কাঁপল না। 'আগে আমাকে জানতে হবে বাইরে কি আছে, তার আগে নয়।'

রানার দু'ফুট পিছনে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটল, ঝট করে এক পাশে সরে এলো ও। সাবমেরিনের খোল থেকে গুঞ্জন উঠছে। বাইরে যা-ই ঘটুক না কেন, স্নায়ুগুলোকে ছিঁড়ে সুতো বানানোই উদ্দেশ্য। লাইটার বের করে জ্বালল রানা, উঁচু করে খোলের দিকে ধরল। সিলিন্ডার আকৃতির একটা ধাতব বোল্ট সাবমেরিনের এক পাশে ফায়ার করা হয়েছে। ওটার মাঝখানে ছোট একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। এ-সবের মানে কি? ওরা কোথায়?

'ক্যাপটেন। আপনার হাতে অতি মূল্যবান মাত্র দু'মিনিট সময়। এই সময়ের ভেতর হ্যাচ খুলবেন আপনি, সাবমেরিন সহ আত্মসমর্পণ করবেন।' আওয়াজটা ভোঁতা, অবশ্যই খোলের পাশে আটকানো লিমপিট মাইক্রোফোন থেকে আসছে। ভোঁতা ও

যান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও ভারী গমগমে একটা ভাব আছে কণ্ঠস্বরে, ফলে ওটা যে কবীর চৌধুরীর গলা রানার অন্তত তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ও দেখল অন্ধকারে চকচক করছে সুসমির চোখ দুটো। সেখানে ওর নিজের অনুভূতিই পড়তে পারল ও। ভয়।

'বিকল্প হলো সায়ানাইড গ্যাস ছেড়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা,' সাড়া না পেয়ে আবার কথা বলছে ডানকিলাস নিরো ওরফে পাগল বিজ্ঞানী। 'প্রয়োজনে আমরা গ্যাস দিয়ে খোল ভরে দেব। এখনও সময় আছে, আপনার নিরস্ত্র লোকজনকে ডেকে জড়ো করুন। কারও কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে বা কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, গুলি করা হবে। আপনার হাতে এখন সময় আছে আর মাত্র দেড় মিনিট।'

অন্ধকারে লোকজনের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছে রানা। একটা লাইটার নিভে গেল। বিকল্প কোন উপায় কি সত্যি নেই? একটা টর্পেডো টিউবের ভেতর দিয়ে পালানো যায় না? না, সময় নেই। গ্যাস মাস্ক? সায়ানাইড গ্যাসের বিরুদ্ধে কোন মাস্কই কাজ করে না।

'আর এক মিনিট, ক্যাপটেন,' বলল কবীর চৌধুরী। 'গ্যাস সিলিন্ডার অ্যাকটিভেট করার জন্যে প্রস্তুত হও তোমরা,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিল সে। 'রিলোড গ্যাস বোল্ট।'

হিসহিস করলেন ফিটজেরাল্ড। 'বাস্টার্ডস! আমরা ওদের তোপের মুখে পড়েছি।' সেইল-এর দিকে এগোতে যাচ্ছেন।

কন্ট্রোল রূমের টান টান উত্তেজনায় ঢিল পড়েছে। সুসমির দিকে ফিরল রানা। 'তোমার চুল ঢাকো। কবীর চৌধুরী জানে না আমরা লিংকনে আছি। সেট-আপটা কি রকম জানার পর কি করা যায় সিদ্ধান্ত নেব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল সুসমি, ক্যাপের ভেতর চুল লুকাচ্ছে। কন্ট্রোল রূম অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে। কপাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল, সেই

ঘাম শার্টের আস্তিন দিয়ে মুছল রানা।

'আচ্ছা, জীবন এখনও তাহলে আপনার কাছে আকর্ষণীয়, ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড।' খোলের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে কবীর চৌধুরীর ভারী গলা। 'ভেরি গুড। একমাত্র সুপারপাওয়ারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, আপনাদের বেঁচে থাকার মজাই আলাদা। আপনার সব লোককে এই মুহূর্তে জড়ো করুন। সময় আর খুব কমই বাকি আছে।'

হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ফিরলেন ফিটজেরাল্ড। মুখটা ঝুলে পড়েছে তাঁর। 'ওকে, মেন। ফরওয়ার্ড কেসিং-এ এক হও সবাই। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।' রানার দিকে ফিরলেন, তবে কিছু বললেন না।

'আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ফিটজেরাল্ড এমন সুরে কথা বললেন যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে তাঁর নিজেরই খুব কষ্ট হচ্ছে। 'ট্যাংকারের ভেতরে।'

'হোয়াট!' সুসমির লম্বা পা তাকে সেইল-এর দিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কাঁধের পিছনে রানার মুখ।

রানা ভাবছে, কমান্ডার কি পাগল হয়ে গেছেন? মাথার ওপর গোল একটা আলো দেখতে পেল ও, উঠে পড়ল নেভিগেশন্যাল ব্রিজে। এরপর যা দেখল, বিস্ময় ও অবিশ্বাসে বড় হয়ে উঠল চোখ জোড়া। কমান্ডার ফিটজেরাল্ডের শব্দগুলো যে কি ছিল? 'হে ঈশ্বর! এ সম্ভব নয়!' প্রথমদর্শনে মনে হলো ও যেন একটা ক্যাথেড্রাল-এর ভেতর রয়েছে। দেয়াল ও গম্বুজ আকৃতির সিলিং দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা জায়গা। সারি সারি পিলার, স্তম্ভ ও অবলম্বন। গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, প্রথমেই যাতে সামনের একটা রঙিন কাঁচ মোড়া জানালায় চোখ পড়ে—এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, আলোর আভা ছড়াচ্ছে। তবে না, এটা কোন উপাসনালয় নয়। খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়বে কাঁচের গায়ে ক্রুশ আকৃতির স্ক্রীনটা।

আসলে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত একটা কন্ট্রোল রূমের সামনের দিকটা আড়াল করে রেখেছে। সারি সারি স্তম্ভগুলো ইস্পাতের, গ্যাঙওয়ে, ক্যাটওয়াক, করিডর ইত্যাদি বহন করছে। ওগুলোয় তিন প্রস্থ সিঁড়ি উঠে গেছে–দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে একজোড়া, জায়গাটার মাঝখান থেকে অপরটা। এলিভেটরগুলো পৌঁছে দেবে গ্যালারীর বিশেষ বিশেষ অংশে। ওগুলোর নিচে রয়েছে টিউব আকৃতির হোভারকার ট্র্যাক, নিয়মিত ব্যবধানে এন্ট্রি পয়েন্টসহ। এ-সব অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর হলেও, এ সবে শুরু। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ গোটা এলাকাটা আসলে সাগরে ভরপুর একটা ডক, দুটো জেটি আর তিনটে মুরিং বে-তে ভাগ করা। ইউএসএস লিংকন মাঝখানের বে-তে রয়েছে, ওটার দু'পাশে রয়েছে একটা করে আরও দুটো সাবমেরিন। বিস্ময়ের ঘোরটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছে রানা। ধারণা হিসেবে, ও এ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছে বা ভেবেছে সে-সবের চেয়ে এটা অনেক বেশি ফ্যানট্যাসটিক। ট্যাংকারের ছদ্মাবরণে তৈরি একটা জলযান, যে জলযান নিউক্লিয়ার সাবমেরিন গিলে নিতে পারে। আর আগে থেকে যে-দুটো সাবমেরিন এখানে রয়েছে? একটা আমেরিকান, আরেকটা চাইনিজ। ওর মুখে সার্চলাইটের উজ্জ্বলতা খেলা করছে, সেটাকে উপেক্ষা করে ওগুলোর নেইমপ্লেইট পড়তে চেষ্টা করল।

'জলদি! ধৈর্যশীল বলে আমার সুখ্যাতি নেই!' আবার সেই কবীর চৌধুরীর ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

মই বেয়ে ডেকে নামার সময় রানা ভাবছে, আওয়াজটার উৎস কোথায়? চারদিক থেকে, জেটি ও গ্যালারীর দিক থেকেও, হাতে বাগিয়ে ধরা সাব-মেশিন-গান নিয়ে বহু লোক কাভার দিচ্ছে ওদেরকে।

একটা রাবার টিউব দেখল রানা, বোল্ট-এর সঙ্গে সংযুক্ত। লিংকনের খোলের ভেতর দিয়ে এই বোল্টটাই ফায়ার করা

হয়েছিল। একটা ট্রলিতে গ্যাস সিলিন্ডার বসানো রয়েছে, রাবার টিউবটা লিংকনের গা থেকে বেরিয়ে ওই গ্যাস সিলিন্ডারে ঢুকেছে। গ্যাস সিলিন্ডারের ট্যাপ-এ সাবধানে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক, তার পাশের লোকটা কি যেন একটা ধরে আছে, দেখতে অনেকটা নিউম্যাটিক ড্রিল-এর মত। এটা নিশ্চয়ই একটা আগ্নেয়াস্ত্র, গ্যাস বোল্ট ফায়ার করে। স্পীডবোট ক্রুদের মত এখানকার লোকগুলোও নীল ইউনিফর্ম পরে আছে, পকেটের গায়ে ও কাঁধের কাছে সিল্ক সুতো দিয়ে প্রতীক চিহ্ন, সেই মাছ বোনা। লোকগুলোকে অতিরিক্ত সতর্ক দেখাচ্ছে। বোঝাই যায় প্রফেশনাল মার্সেনারিদের ভাড়া করেছে কবীর চৌধুরী। ভয়ের সঙ্গে রানার মনে কবীর চৌধুরীর প্রশংসাও জাগল। এই একজন লোক, গোটা দুনিয়াকে জিম্মি করতে পারে।

'ওটা আমাদের কুবলাই খান!' সরে রানার পাশে চলে এসে ফিসফিস করল সুসমি, মাথাটা নিচু করে রেখেছে।

উত্তরে কিছু না বলে ওদের সামনে, ইস্পাতের পিলারগুলোর ওদিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় সাবমেরিনটাকে দেখল রানা। ও শুধু তিনটে হরফ দেখতে পেল '–FIN'। এমারেল্ড ডলফিন। যাক, নিখোঁজ দুটো সাবমেরিনেরই খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু ক্রুরা সব কোথায়? কবীর চৌধুরী ওদেরকে মেরে ফেলেনি তো?

লিংকনের ক্রুদেরকে ফরওয়ার্ড কেসিং-এর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে। কিসের সামনে দাঁড়াচ্ছে ওরা, ফায়ারিং স্কোয়াড?

ইতস্তত করছে রানা, ভাবছে কাছাকাছি গার্ডটাকে লক্ষ্য করে লাফ দেবে কি না। কিন্তু লাভ কি! একজনের কাছ থেকে না হয় অস্ত্র কেড়ে নিল, পরমুহূর্তে বাকি লোকগুলো ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে না? না, হুট করে কিছু করা যাবে না। অপেক্ষা করে দেখতে হবে কি ঘটে।

'বন্দীদের সেলে ভরো!' কবীর চৌধুরীর আদেশ শোনা গেল।

চিবুক নামিয়ে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ওরা খুন হতে যাচ্ছে না–অন্তত এখুনি নয়। আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে গার্ডরা, লিংকনের লাইনবন্দী ক্রুরা গ্যাঙওয়ে ধরে জেটিতে নেমে যাচ্ছে। সামনে তাকিয়ে গ্যালারির নিচের বাল্কহেডে তিনটে ভারী ইস্পাতের দরজা দেখতে পেল রানা। গ্যালারির ঠিক উল্টো দিকে কন্ট্রোল রূম। দরজাগুলোর বাইরে দু'জন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা যাচ্ছে, খুদে ও চৌকো ফোকরগুলোর ভেতর এক ঝাঁক হতাশ মুখ।

'তোমরা মেরিন পাঠাওনি কেন?' মার্কিনি উচ্চারণে তাদের একজন জানতে চাইল।

চওড়া গ্যালারির নিচে ব্রিজ, ওখান থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না বোঝার পর পিছন দিকে তাকিয়ে সিলভার বোদালের ভেতরকার দৈর্ঘ্যে চোখ বুলাল রানা। গোল ও ভোঁতার বদলে বরং সরল ও সোজা হবার কারণটা বোঝা গেল। রেখাটা দেখতে পেল ও, প্রকাণ্ড একজোড়া বন্ধ দরজার চিহ্ন। রানা আরও একবার ধারণাটার বিশালত্বের কথা ভেবে মুগ্ধ হলো। এই আকারের ও এই মাত্রার জটিল একটা কিছু তৈরি করতে অতি অবশ্যই কয়েকশো মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এত টাকা খরচ করে সিলভার বোদালের কাছ থেকে কি পেতে চায় কবীর চৌধুরী? না, অসম্ভব, এবার অন্তত শুধু টাকার পিছনে ছুটছে না সে। এর আগে প্রায় প্রতিটি অপরাধ সংগঠনের কারণ হিসেবে সে ব্যাখ্যা দিত, বিজ্ঞান সাধনার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার তার। এবার আর সে অজুহাত খাটবে না। যে টাকা খরচ করে এই ট্যাংকার বানিয়েছে সে, এক হাজার বিজ্ঞানী সারা জীবন সাধনা করতে পারত। না, টাকা নয়, কবীর চৌধুরী এবার অন্য কিছু চায়।

'স্টপ!' কেউ যেন রাইফেল থেকে গুলি করল, আসলে পিএ সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসা কণ্ঠস্বর। প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে হাতের আগ্নেয়াস্ত্র সামনে ঠেলে দিল, বন্দীদের লাইনটা হোঁচট খাওয়ার

উপক্রম করে দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা অনুভব করল একটা বিট মিস করল ওর হার্ট। কি ঘটল? আড়চোখে সুসমির দিকে তাকাল, কিন্তু সে মাথা নিচু করে ডকের তেল চকচকে পানি দেখছে।

'আমার ধারণা, আমরা একের অধিক অপ্রত্যাশিত অতিথি পেয়েছি। গার্ডদের বলছি, মিস্টার ও মিসেস অপ্রতুল চ্যাটার্জিকে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে এসো!' কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে হুমকির সঙ্গে বিদ্রূপের সুর; রানার বুক দুরু দুরু করে উঠল।

ওরা ধরা পড়ল কিভাবে?

তারপর রানা দেখতে পেল, ওদের মাথা থেকে ষাট ফুট ওপরে একটা রেইলে ফিট করা টিভি স্ক্যানার চারদিকের সমস্ত ইমেজ কন্ট্রোল রুমে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

বন্দীদের দিকে এগিয়ে এলো একজন গার্ড। চিনতে পারল রানা, ল্যাবরেটরিতে দেখেছে। ভঙ্গিটা মারমুখো, চেহারায় নীচতা; আরও এক পা এগিয়ে অটোমেটিকটা রানার পেটে ঢোকাল মাংসের ভেতর সাইট না ডোবা পর্যন্ত। চোখ-মুখ কুঁচকে ব্যথাটা সহ্য করছে রানা, সেই সঙ্গে নিজের অস্ত্র দিয়ে কবীর চৌধুরীর কর্সিকান শিষ্যের মগজ বের করার ঝোঁকটা দমন করছে। কিছু একটা বলে দিল শরীরের সবটুকু শক্তি প্রয়োজন হবে। সুসমিকে লাইন থেকে টেনে নেয়া হলো। পিছনে মাজলের গুঁতো খেতে খেতে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে জেটি থেকে কন্ট্রোল রুমে উঠছে দু'জন। সেলগুলোর খুদে ফাঁক-ফোকর থেকে ইংরেজি ও চীনা ভাষায় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। রানা লক্ষ করল কোন কোন ব্যাঙ্কের সেফ-এ যেমন দেখা যায়, সেলগুলোর দরজায় চাকা লাগিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তবে, আর কিছু না হোক, এমারেল্ড ডলফিন আর কুবলাই খানের ক্রুরা হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েনি, তাদের প্রাণশক্তি ও মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা এখনও অটুট আছে।

কন্ট্রোল রুমের স্টারবোর্ড সাইডে সিঁড়ির ধাপগুলো শেষ

হয়েছে। দৈত্যাকার স্টীল লুভার-ধোঁয়া বের করার ও বৃষ্টি ঠেকাবার ছোট টাওয়ারসদৃশ কাঠামো-খোলা অবস্থায় সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে; প্রতি জোড়ার মাঝখানে কাঁধ না ঘুরিয়ে হেঁটে যাবার মত যথেষ্ট ফাঁক। ভেতরে তাকাতে রানা দেখল কন্ট্রোল রুমটাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে বিশ ফুট উঁচু একটা গ্লোব, ভেতর থেকে আলোকিত এবং ধীরে ধীরে ঘুরছে। গ্লোব সারফেসের বিভিন্ন পয়েন্টে আলাদা আলাদা রঙের আলো মিটমিট করছে। গ্লোবটার চারপাশে একটা গোল কনসোল, সেটাকে ঘিরে ছ'জন টেকনিশিয়ান বসে আছে, তাদের সামনে কয়েক ডজন কমপিউটর, প্রিন্ট-আউট মেশিন আর ট্র্যান্সমিশন ইউনিট। গ্লোবের পিছনে দীর্ঘ একসারিতে অসংখ্য ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশন স্ক্রীন, প্রতিটির সামনে একজন করে ওয়াচার বসে আছে। রানার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ তিক্ত হাসি। ওদেরকে দেখে ফেলার মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। এই অতিকায় জলযানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড বলা হলেও, অন্তত এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন পাগল বিজ্ঞানী, কোথাও ফাঁক রাখেনি বা এতটুকু ঝুঁকি নিচ্ছে না।

'গুড ডে, শ্রী অপ্রতুল চট্টো-আরে ধ্যাত, এ-সব ছদ্মনামে আর দরক'র কি-শ্রীমান মাসুদ রানা, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শনি···হাহ্-হাহ্-হাহ্! এতে তোমার উৎফুল্ল বা গর্বিত হবার কিছু নেই, হে। আমার জীবনের অভিশাপ তুমি ঠিকই, তবে সেটা ছিলে, অর্থাৎ অতীতের কাহিনী। বর্তমান সম্পূর্ণ অন্য গান গাইছে।' রানার বুকে একটা প্রাচীন তর্জনী তাক করল। 'তুমি কি জানো, আমি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দু'একটা কবিতার এক-আধটা পংক্তির ভারী ভক্ত? এই যেমন-"আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না!···", কিংবা, "আমি ভগবানের বুকে এঁকে দিই

পদচিহ্ন...” আবার ভেবে বোসো না এই ভগবান কোন ধর্মের ভগবান...সে প্রসঙ্গ পরে। এমন কি পদচিহ্নও আমার নয়,’ আঙুলটা এবার সুসমির দিকে তাক করল। ‘ওদের, মানে, চীনাদের।’ রিভলভিং আর্মচেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে। চেয়ারটা গ্লোব-এর সামনে থাকায় কন্ট্রোল রূমের কোথায় কি ঘটছে সব এখান থেকে দেখা যায়। আড়ষ্ট, তবে গতি অত্যন্ত দ্রুত, প্রায় হড়কানোর মত একটা ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, কালো আলখেল্লায় আপাদমস্তক আবৃত প্রকাণ্ড এক বাদুড় যেন। ‘তোমরা একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছ। আমি আমার অপারেশন “শুভ প্রহর” শুরু করতে যাচ্ছি। অনেকেই অবশ্য এটাকে ঈশ্বরদের পতন হিসেবে দেখতে পাবে। কেয়ামত, হাহ্-হা, কেয়ামত!’ মার্চেন্ট নেভি ক্যাপটেনের ইউনিফর্ম পরা এক লোকের দিকে ঘুরল সে, কন্ট্রোল রূমে ঢোকার মুখে টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। রানা কিছু বলার আগেই তাকে নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। ‘লঞ্চিং-এর প্রস্তুতি নিন, ক্যাপটেন।’

‘ইয়েস, সার।’ ঘুরে কন্ট্রোল রূমের ভেতর দিকে ফিরে গেল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পরই পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে তার গলা ভেসে এলো। ‘অ্যাটেনশন অল পারসনেল। নিরো ক্রুজ ওয়ান অ্যান্ড টু–এমবার্ক ইওর সাবমেরিনস্। রিপিট–ক্রুজ ওয়ান অ্যান্ড টু, এমবার্ক ইওর সাবমেরিনস্।’

রানা প্রায় বিমূঢ়, দেখল এমারেল্ড ডলফিন আর কুবলাই খান-এর ওপর ক্যাটওয়াকগুলো লোকজনে ভরে উঠছে, গোটা স্ট্রাকচার সচল পায়ের আঘাতে ড্রামের মত বাজছে। দুই সারি পিঁপড়ের মত সাবমেরিন দুটোর দিকে নেমে আসছে তারা।

সুসমির দিকে তাকাল রানা। ওর বিহ্বল ভাব তার চেহারাতেও। ঈশ্বরদের পতন? কেয়ামত? এ-সব কি শুনছে ওরা! রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চরম সংঘর্ষ? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? দুনিয়ার ধ্বংস?

একটা পিএ সিস্টেম কর্কশ ঘ্যারঘ্যার শব্দ করে জ্যান্ত হলো।

'দু'দল ক্রুই সাবমেরিনে উঠেছে, ক্যাপটেন। মিসাইল অনলোড-এর কাজ শেষ।' হড়কে জায়গামত সরে এলো হ্যাচ কাভার। ডেক মসৃণ। পানি এত চকচকে, যেন একটা সুইমিং-পুলের সারফেস।

কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল রানা। বড়সড় অবয়বে কোন বিশেষ ভাব নেই তার, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। 'এ-সবের মানে কি, চৌধুরী?'

দুই হাতের দশটা আঙুল পরস্পরের সঙ্গে ঠেকাল কবীর চৌধুরী, ভঙ্গিটা অনেকটা যেন হাত তুলে প্রার্থনা করার মত। তার ভারী ও ভরাট কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তে অত্যন্ত নিচু আর নরম শোনাল। 'ওই সাবমেরিন একটা আমেরিকার, আরেকটা চীনের–উদারতা ও মহত্ত্বের নিদর্শন হিসেবে আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। ওগুলো একটু পরই সাগরে পাঠানো হবে। ওগুলোকে নির্দিষ্ট টার্গেট দেয়া হয়েছে, বেলা বারোটার দিকে পৌঁছে যাবে ফায়ারিং পজিশনে। বারোটার কিছুক্ষণ পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক সহ বিশটা শহর, চীনের সাংহাই ও বেজিংসহ পনেরোটা শহর আর বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরকালের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' এত শান্ত সে, কথার সুর এত স্বাভাবিক, রানার গা শিরশির করে উঠল।

'কেন?' প্রশ্ন করার পর বুঝতে পারল রানা গলার আওয়াজটা ওর।

হঠাৎ চোখ রাঙাল কবীর চৌধুরী। প্রথমে চামড়ার ভাজ খুলে আকারে অবিশ্বাস্য বড় হয়ে উঠল চোখ দুটো, রঙ হয়ে উঠল লাল। 'বড্ড বাড় বেড়েছ তুমি, আমেরিকা! যুদ্ধ বাধিয়ে ইরাকের তেল নিতে চাইছ, মাথায় হাত বুলিয়ে নিতে চাইছ বাংলাদেশের গ্যাস। দাঁড়াও, একমাত্র সুপারপাওয়ার হবার মজা তোমাকে দেখাচ্ছি!'

'কিন্তু আমরা কি দোষ করলাম?' রানার পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে

জিজ্ঞেস করল সুসমি। 'আমরা তো সুপারপাওয়ারও নই, কারও তেল-গ্যাস পাবার লোভও করছি না...'

'চোপ, পাজী মেয়ে!' অকস্মাৎ হুংকার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা আমি বরদাশত করব না। কি বলছি, মন দিয়ে শোনো। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার ওপর একা ছড়ি ঘোরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। একটাই কারণ, তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই, সেই একমাত্র সুপারপাওয়ার। কাজেই কুবলাই খানের মিসাইল ছুঁড়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করা হবে।' সুসমির দিকে ফিরল সে। 'আর তোমাদেরকে ধ্বংস করা হবে এই জন্যে যে আমেরিকার পর চীনই পরবর্তী সুপারপাওয়ার হিসেবে উঠে আসতে যাচ্ছে।' হঠাৎ হাসল কবীর চৌধুরী, রানার দিকে তাকাল। 'আর বাংলাদেশকে কেন শাস্তি দিচ্ছি? আশা করি এটার ব্যাখ্যা না দিলেও চলে, তাই না, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কোন মন্তব্য করল না।

'হ্যাঁ, আমারও জন্মভূমি, মাতৃভূমি–ভালও বাসি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু মা যখন ছেলের অমঙ্গল চায়, চেষ্টা করে ছেলেকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে, মায়ের স্নেহ-ভালবাসা থেকে সে যখন বঞ্চিত হয়, কোন দামই যখন পায় না–সেই মায়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার ছেলের আছে বৈকি।'

'কিন্তু তুমি বলেছ কেয়ামত...'

'চীনের অ্যাটম বোমা খেয়ে মার্কিনিরা বসে থাকবে?' মিষ্টি করে হাসল কবীর চৌধুরী, কে বলবে পাগল সে। 'কতবড় দেশ ভেবে দেখো না, ধ্বংস হতেও তো সময় লাগবে। তাছাড়া আমি তো এদের সবগুলো শহর ধ্বংস করতে পারছি না। অর্থাৎ পাল্টা আঘাত হানার সময় ও সুযোগ যুক্তরাষ্ট্র পাবে। পাল্টা আঘাত কাকে করবে তারা? অবশ্যই চীনকে। কারণ মিসাইল আর বোমাগুলোর গায়ে লেখা থাকবে ওগুলো চীন থেকে এসেছে। সেই

রকম চীনও পাল্টা আঘাত হানবে। কোথায়? বলাই বাহুল্য, আমেরিকায়। হাহ্-হাহ্-হাহ্-হাহ্…'

'এর অর্থ…'

'এরই অর্থ কেয়ামত! চীন-আমেরিকা যুদ্ধ করলে আমেরিকার পা-চাটা কুকুরটা চুপ করে বসে থাকবে? চুপ করে বসে থাকবে রাশিয়া, ফ্রান্স, ভারত আর পাকিস্তান?'

নিস্তব্ধতা নামল, ডকসাইডে শুধু পানি আছড়ে পড়ার শব্দ হচ্ছে। একটু পর পিএ সিস্টেম থেকে ক্যাপটেনের গলা ভেসে এলো। 'বোর দরজাগুলো খোলো।'

কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকাবার আগে রেইলিংটা আঁকড়ে ধরল রানা। 'ঠিক আছে। বলো কি চাও তুমি।'

কবীর চৌধুরী যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে তো বটেই। 'চাই, রানা? তুমি দেখছি আমাকে হাসাতে চাও। দেয়ার মত কি আছে তোমার কাছে?'

'ব্যক্তিগতভাবে তেমন কিছুই নেই।' নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে রানা। 'তবে আমরা, আমি ও সুসমি, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছি তারা তোমাকে অনেক কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখে।'

'তাহলে আগে আনুষ্ঠানিকভাবে শোনা যাক তোমরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছ।' প্রস্তাব রাখল কবীর চৌধুরী।

'আমরা সারা দুনিয়ার সমস্ত সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিনিধিত্ব করছি, কবীর চৌধুরী। তাদের মধ্যে প্রায় দু'শো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও আছেন। এমন কিছু নেই যা তাঁরা তোমাকে দিতে পারেন না। তুমি অঙ্কটা বলো।'

কবীর চৌধুরী এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, যেন রানার কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে তার। 'রানা, তুমি কি টাকার কথা বলছ? টাকা…আসলে ওই সমস্যার সমাধান তো বেশ কিছুদিন আগেই করে ফেলেছি আমি। টাকার আর কোন দরকার নেই আমার।

দরকার নেই, তাই আগ্রহও নেই।'

'তাহলে কি চান আপনি?' সুসমির গলায় জরুরী তাগাদার সুর। 'ক্ষমতা? এক বিশ্ব, এক সরকার, আর সেই সরকারের প্রধান আপনি?'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো, ভাঙল পিএ সিস্টেম থেকে ভেসে আসা ক্যাপটেনের গলা। 'নিরো ওয়ান-সাগরে বেরিয়ে পড়ো। নিরো টু-সামনের সাবমেরিনকে অনুসরণ করো।'

চোখে আতংক, এমারেল্ড ডলফিনকে সামনে বাড়তে দেখছে রানা। 'হ্যাঁ, কবীর চৌধুরী! বলো তুমি কি চাও। কি পেলে সাবমেরিন দুটোকে ডেকে নেবে?'

ভূতে বা ঘোরে পাওয়া মানুষের মত, আড়ষ্ট যেন ঠিক একটা রোবট, ধীরে ধীরে ঘুরল কবীর চৌধুরী। রানা দেখল, চোখ নয়, যেন লম্বা দুটো করিডরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেগুলোর শেষ প্রান্ত বলে কিছু নেই। সেই পুরানো অনুভূতিটা ফিরে এলো, এবার আরও অনেক জোরাল-কবীর চৌধুরী সত্যি আসলে বদ্ধ উন্মাদ। 'তুমি আসলে আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না, রানা। এটা পুরানো হয়ে গেছে। আমি নতুন একটা বিশ্ব চাই।'

সতেরো

'কি! নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করবেন?' সুসমির গলায় অবিশ্বাস।

'সাগরের তলায়। তোমার বন্ধু,' ইঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'জানে আমি কি বলছি।'

'না, আমি জানি না!' রানার কণ্ঠস্বর রাগে কেঁপে গেল। 'তোমার যদি সাগরের মেঝেতে কলোনি তৈরির ইচ্ছে হয়, করো তৈরি। কিন্তু ডজন ডজন পারমাণবিক বোমা ফেলে সাগরের ওপরটাকে ধ্বংস করে দিয়ে কেন? কয়েকশো কোটি নিরীহ মানুষকে খুন করে কেন?'

'তারা কেউ নিরীহ নয়!' এবার কবীর চৌধুরী রেগে উঠল। 'যে দুনিয়ায় বাস করো সেটার দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখেছ তুমি? খবরের কাগজ শুধু পড়োই, কোন খবর তোমার মনে দাগ কাটে? টিভি দেখার সময় পাও না, না? ওহ্, গড! বিলিভ মি! দুনিয়া স্রেফ পচে গেছে। দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা, অসততা আর ঘৃণা, এগুলোর সমষ্টি ছাড়া এটাকে আর কি বলা যায়? সমাজ রসাতলে চলে যাচ্ছে। আমি শুধু প্রক্রিয়াটায় গতি সঞ্চার করছি। যা করছি তার পিছনে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, আছে মহৎ একটা উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণা। এটা সত্যি প্রয়োজন, রানা। বাতিল ও পুরানো হয়ে গেছে আমাদের এই গ্রহ। মানুষ হয়ে উঠেছে দুর্গন্ধের উৎস। এ স্রেফ আবর্জনা। সব ফেলে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আদর্শ এক পৃথিবী, সেটাই হবে সৎ ও সুন্দর মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বেহেশত্...'

বাধা দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মাটির ওপর নিউক্লিয়ার ওঅর বেধে গেলে ভেবে দেখেছ সাগরে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে? আমার ধারণা পানিতেই বরং দূষণের পরিমাণ বেশি হবে।'

রওনা হওয়া দুই সাবমেরিন এই মুহূর্তে সিলভার বোদালের হাঁ করা প্রকাণ্ড মুখে পৌঁছাল। ঠিক আঁকা একটা ছবির মত দেখতে লাগছে।

'আমি সব রকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছি, রানা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'নূহ নবীর গল্প শোনোনি? প্রাচীন সেই ইতিহাসেরই আধুনিক সংস্করণ হতে যাচ্ছে এটা। আমার বোয়াল মাছে আশ্রয় পেয়েছে প্রায় সকল প্রজাতির জীব-জন্তু...'

'তুমি একটা পাগল!'

'তোমার অভিমত সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই,' সহাস্যে, অবজ্ঞার সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'আমি গ্রহণ করব উত্তরপুরুষদের রায়।'

'সেটা তুমি এখুনি আমার কাছ থেকে জেনে নাও,' বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী ছিল–ছিল–ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী উন্মাদ।'

স্থির পাথর হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। তারপর, ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল তার পেশিতে। 'এ তোমার পুরানো কৌশল, রানা। উত্তেজিত করে আমাকে দিয়ে ভুল করাবার অপচেষ্টা।' হাসল সে। 'কোন লাভ হবে না, হে। শোনো, আমি একজন সায়ানটিস্ট এবং সেই সঙ্গে একজন রিয়ালিস্ট। আমি সস্তা ভাবাবেগের অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করি।'

রানা দেখল বো-র প্রকাণ্ড দরজা দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ যেন একটা সমাধির ভেতর আটকা পড়া। একজোড়া সাবমেরিন পৃথিবীকে ধ্বংস করতে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ও এখানে বিরল এক প্রতিভার সঙ্গে রয়ে গেছে যার মন যেভাবেই হোক কানায় কানায় ভরে উঠেছে শুধু বিষে। চট করে একবার কাছাকাছি গার্ডদের দেখে নিল রানা। দু'জনেই সতর্ক, কড়া নজরও রাখছে, হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরা। কবীর চৌধুরীকে জিম্মি করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গার্ডদের ইঙ্গিত করল পাগল বিজ্ঞানী। 'তো রানা, আমাকে ল্যাবরেটরিতে ফিরতে হচ্ছে। তুমি এখানেই থাকছ।' যেন কথাটা রানাকে হজম করতে দেয়ার জন্যে দু'সেকেন্ড ওর তাকিয়ে থাকার পর সুসমির দিকে ফিরল। 'তুমি, মেজর, আমার সঙ্গে এসো। জেনে হয়তো তুমি খুব অবাক হবে যে তোমার দর্শন পাবার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে একজন। কোমলতা, ভালবাসা, আদর–এ-সব তার মধ্যে আশা করাটা বোকামি।'

কবীর চৌধুরীকে হিংস্র ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। 'হ্যাঁ। চূর্ণন, চর্বন, পেষণ ইত্যাদি কাজের জন্যে রীতিমত সফিস্টিকেটেড একটা অ্যাপেরেটাস, মানে একটা যন্ত্রই বলতে পারো তাকে—বিশেষ কিছু মহলে জানোয়ার নামে পরিচিত। শোনো, তাহলে অদ্ভুত একটা কথা শোনাই তোমাকে।' এমন ভাব দেখাল, কবীর চৌধুরী নিজেই যেন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। 'আগেই তো বললাম, তাই না, তার মধ্যে কোমলতা বা ভালবাসা বলে কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, তোমাকে দেখার পর তার মনে কোমলতার জন্ম হয়েছে। উদ্ভট বলব, নাকি ভীতিকর—জানি না।' রানার চোখে ঘৃণা ও আতংক মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। 'ওদের এই মিলন সম্পর্কে আমি আগাম কোন মন্তব্য করতে চাই না, রানা। এমন কি, বিজ্ঞানী নয় এমন লোকদের মধ্যেও ব্যাপারটা প্রবল কৌতূহল জাগাবে। এই মিলনের ফলে সম্ভাব্য কি কি ঘটতে পারে তা ভাবতে গেলে সত্যি রোমাঞ্চিত হতে হয়। একদিকে রূপ-যৌবন আর বুদ্ধিমত্তা, আরেক দিকে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা আর কল্পনাকে হার মানানো দৈহিক শক্তি। এ ধরনের অস্বাভাবিক মিলনের ফলাফল উল্লেখযোগ্য কিছু একটা হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

শিউরে উঠে সুসমি বলল, 'আমি বরং আত্মহত্যা করব।'

তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, ওটাই একমাত্র বিকল্প।' একজন গার্ডকে ইশারা করল সে, লোকটা এগিয়ে এসে শক্ত করে সুসমির হাত ধরল।

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল সুসমি, দৃষ্টিতে আবেদন; মুখ ঝুলে পড়তে শুরু করায় চেহারা থেকে গর্বিত ভাবটুকু দ্রুত মুছে যাচ্ছে। পা বাড়াল রানা, আর ঠিক তখনই দ্বিতীয় গার্ডটা উল্টো করে ধরা তার অস্ত্রটা ধাম করে নামিয়ে আনল ওর কাঁধের ওপর, গলার পাশে। পরমুহূর্তে লোকটা তার অটোমেটিক সিধে করল, ট্রিগারে আঙুল। রানা টলছে, ইচ্ছে ও শক্তি থাকলেও সুসমির দিকে এগোবার উপায় নেই—জানে, লোকটা ট্রিগার টেনে দেবে,

কবীর চৌধুরী সে অনুমতি তাকে আগেই দিয়ে রেখেছে।

'স্কুলছাত্রের মত বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা থেকে বিরত হও, রানা।' ব্যঙ্গ করছে চৌধুরী। রানার ইচ্ছে হলো প্রচণ্ড এক ঘুসিতে ভেজা ভেজা গোল মুখটা ফাটিয়ে দেয়, কল্পনার চোখে দেখতে পেল ডিমের মত ফাটল ধরছে ওটায়। 'এই, ওকে তোমরা বাকি সব বন্দীদের সঙ্গে আটকে রাখো। ক্যাপটেনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া আছে।' চোখ তুলে সায়ানাইড গ্যাস ভরা ক্যানিস্টারগুলোর দিকে তাকাল সে, চাকার ওপর গড়িয়ে ওগুলোকে জেটি বরাবর এক সারিতে রাখা হয়েছে। 'বিদায়, রানা। এই শব্দটায়, বলতেই হয়, আমার কানের জন্যে শ্রুতিমধুর একটা সুর আছে।'

কবীর চৌধুরীকে গ্রাহ্য না করে সুসমির মনে খানিকটা আশা জাগাতে চেষ্টা করল রানা। 'আবার আমাদের দেখা হবে, নিনা।'

'গুডবাই, রানা।' সুসমির কথায় কোন ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা নেই। হয়তো একটু হাল ছেড়ে দেয়ার সুর। সুবর্ণ অনেক সুযোগ হাতছাড়া করার অনুশোচনা। তাকে ধরে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা দেখছে রানা, চেষ্টা করছে মনটাকে খালি রাখতে, সেখানে যাতে কোন আবেগ ঢুকতে না পারে। একটা মেয়ের কথা ভেবে কি লাভ, যেখানে গোটা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে? তবে দুনিয়ারই বা কি তাৎপর্য সুসমির মত লক্ষকোটি মেয়েদের ছাড়া? ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে কিভাবে একজন লোক মানবতার সেবা করতে পারে?

একটা কবাট একদিকে সরে গিয়ে একটা দরজা উন্মুক্ত করল। ভেতরে এলিভেটর। প্রথমে ঢুকল কবীর চৌধুরী, তারপর সুসমি, সবশেষে একজন গার্ড। শেষ একবার সুসমির সুন্দর, সাহসী মুখটা দেখতে পেল রানা। ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি যেন বলতে চাইল। এত দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল না—চোখ দুটো কি পানিতে ভরে উঠেছে তার?

'মুভ!' রানার ঘাড়ে হালকা বাড়ি মারল অটোমেটিকের ব্যারেল। তারপরই দ্রুত পিছিয়ে গেল গার্ড, কাভার দিচ্ছে দূর থেকে।

সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে রানা, এই সিঁড়ি দিয়েই কন্ট্রোল রূমের দিকে এসেছিল। ওর পিছন থেকে কমপিউটর চালাবার শব্দ ভেসে আসছে, যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে প্রিন্টারগুলো। টেকনিশিয়ানরা গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। মাথার ওপর নির্দেশিত পথে ধীরে ধীরে ঘুরছে স্ক্যানার। গ্যাংওয়ে আর ক্যাটওয়াকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা। রানা জানে কিছু যদি করতে হয়, তাড়াতাড়ি। আড়াইশো বন্দী যদি বুঝে থাকে কারাগার থেকে পালানো সম্ভব নয়, তাদের মধ্যে ওর উপস্থিতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। অথচ হাতে সময় পাওয়া যাবে খুবই কম। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরই সাবমেরিন দুটো যে যার পজিশনে পৌঁছে যাবে।

যেভাবেই হোক, ওই কন্ট্রোল রূমে ঢুকতে হবে ওকে।

এখন ওরা সিঁড়ির নিচে, জেটি বরাবর হাঁটছে। কারাগারের প্রথম দরজার দু'জন গার্ড চোখে প্রত্যাশা নিয়ে মুখ তুলে তাকাল। আরও এক লোক আসছে ট্রলিতে গ্যাস ক্যানিস্টার নিয়ে। ক্যানিস্টারগুলোর মাথায় রয়েছে বোল্ট গান। আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানা, উত্তেজনার ধারাল একটা কোপ অনুভব করল। ওটা কি এখনও লোড করা? কিভাবে ওটা দখল করা যায়?

ট্রলিটার দু'পাশে কোন রেইলিং নেই, সামনে বা পিছনেও কোন ঠেক নেই; একটাকে কোনভাবে স্থানচ্যুত করতে পারলেই সবগুলো ক্যানিস্টার হুড়মুড় করে নেমে আসবে। জিভের ডগা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল রানা। কারাগারের সামনের দু'জন গার্ড নিজেদের অটোমেটিক কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। ট্রলিটা বিশ ফুট দূরে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, ইঙ্গিতে ওকে আরও সামনে এগোতে বলল গার্ড। লোকটা পাঁচ ফুট

পিছনে। ঠিক হ্যায়! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। উরুর পেশি টানটান করল, স্টীল-ক্যাপড্ প্যারাশুট বুটের ভেতর আঙুলগুলো শক্ত। দশ ফুট। পাঁচ ফুট। হাঁটার গতি কমাল, যেন ট্রলিটাকে পাশ কাটাতে দিচ্ছে। তারপরই 'ই-য়াপ!' রানার গলা থেকে শব্দটা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এলো, ঠিক যখন শরীরের সবটুকু শক্তি নিয়ে ওর লাথিটা ট্রলির নিচে লাগল।

ট্রলির নিচে খাড়া একটাই ঠেক, লাথিটা তাতেই মেরেছে রানা। ব্যথাটা পা থেকে উঠে এসে মুখের ভেতর দাঁতগুলোকেও যেন নড়িয়ে দিল। কাঠের ঠেকটা শূন্যে উড়াল দিল, সেই সঙ্গে প্রথম ক্যানিস্টার সবেগে নেমে এলো। ওটা তখনও ডেক স্পর্শ করেনি, ছোঁ দিয়ে বোল্ট গান তুলে নিল রানা, ট্রলির গার্ডকে ধাঁই করে গর্দানে মেরে ফেলে দিল পানিতে।

গ্যাস ক্যানিস্টারগুলো চারদিকে গড়াচ্ছে। প্রথম গার্ডকে হোঁচট খেতে দেখল রানা, কারণ তার পায়ের ওপর হাতুড়ির বাড়ির মত আঘাত করেছে একটা ক্যানিস্টার। মাথা নিচু করে কারাগারের দ্বিতীয় দরজার দিকে ছুটল রানা। খেপে ওঠা এক ঝাঁক মৌমাছির মত অটোমেটিক ফায়ারের বুলেটগুলো ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে খাড়া একটা পোল-এর পিছনে গা ঢাকা দিতে হলো। দু'জন কারারক্ষী কাঁধ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নামিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে।

সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াক থেকে কর্কশ গর্জন শুরু করল একটা মেশিন-গান, বুলেটগুলো মাথার ওপর মেটাল প্লেটিঙে লেগে শব্দ তুলে আরেক দিকে ছুটে যাচ্ছে। ক্যাটওয়াক গার্ডদের অপ্রত্যাশিত অংশ গ্রহণ জেটি এলাকার হামলাকারীদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল, এই সুযোগে লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। হাতের ভারী বোল্ট গান কায়দামত ধরে লক্ষ্যস্থির করতে সময় লেগে যাচ্ছে। ট্রিগার টেনে দিতেই পিছন দিকে ছিটকে পড়ার অবস্থা হলো। চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না, এর ফোর্স বা শক্তি

রীতিমত অসুস্থকর–বোল্টটা প্রথম ওয়ার্ডারকে এমনভাবে ভেদ করে গেল সে যেন ভেজা টিস্যুর একটা বাক্স, তারপর ঢুকল দ্বিতীয় ওয়ার্ডার-এর শরীরে; চর্বি, মাংস, শিরা, নাড়ি, হাড় ইত্যাদি ভেদ করে পিঠের বাইরে বেরিয়ে এলো ইঞ্চি ছয়েক। ভাঙা পুতুলের মত লোকগুলোর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, একজন অপরজনকে অনুসরণ করে পড়ে গেল ডেকে, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ডাইভ দিল রানা, খপ্ করে ধরল প্রথম লোকটার অটোমেটিক। ট্রিগারটা খুঁজে পেল, গড়িয়ে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে–ওর সামনের দিকটায় বৃষ্টির মত বুলেট পড়ছে।

কবীর চৌধুরীর গার্ড এখন খোলা জায়গায়; মুখটা মুখ নয়, বেপরোয়া জেদ আর ঘৃণায় ভরা মুখোশ। রানা লক্ষ্যস্থির করল পায়ে, তারপর ব্যারেল ওপর দিকে তুলতে শুরু করল। লোকটার শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল, ধাক্কাটা এত জোরে লেগেছে যে অটোমেটিকটা ডেক ধরে দশ ফুট হড়কে গেল। আবার নিজেকে গড়িয়ে দিল রানা, সিধে হলো, শরীর প্রায় দু'ভাঁজ করে ছুটছে, লক্ষ্য কারাগারের কাছাকাছি দরজাটা। ভয় দেখিয়ে সেন্ট্রাল গ্যাঙওয়েের দিকে এক পশলা গুলি করল ও, তারপর হুইলটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল। প্রথমে নড়লই না। একটু পর যাও বা নড়ল, গতি অসহ্য রকম ধীর। তবে একটু পরই দ্রুত হলো ঘোরার গতি। বাহুর ওপর দিকে আচমকা তীব্র ব্যথা বলে দিল ওকে গুলি লেগেছে।

বন করে খানিকটা ঘুরতেই লোকটাকে দেখতে পেল রানা, সাবমেরিন লিংকন-এর একটা ফিন-এ দাঁড়িয়ে আবার ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করছে। এক পশলা গুলি করে তাকে ডেকে ফেলে দিল ও, সেখান থেকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পানিতে পড়ে গেল। আরে শালা! একটা হুইল কতক্ষণ ঘোরানো যায়! দরজাটা খুলবে কখন? এখন তো চারদিক থেকে বুলেট ছুটে আসছে।

'জলদি! তাড়াতাড়ি!' শুধু দরজার পিছন থেকে নয়, ওর

মনের ভেতর থেকেও চিৎকার আর তাগাদাটা শুনতে পাচ্ছে রানা। দরজার গায়ে ওদের কাঁধের চাপ অনুভব করতে পারছে ও। হঠাৎ পিছন দিকে ধাক্কা খেলো। মানুষের একটা স্রোত হুড়মুড় করে জেটি এলাকায় বেরিয়ে এলো। ওর পাশে ডেকে হাঁটু গাড়লেন কমান্ডার ফিটজেরাল্ড। 'ঈশ্বরকে অগুনতি ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। আমি সুপারিশ করব আপনি যাতে এই বীরত্বের জন্যে আমাদের জাতীয় পুরস্কার মেডেল অভ মেরিট পান।'

'ও-সব বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করেছি।' রানা এখনি আবার অ্যাকশন শুরু করতে চাইছে। 'আপনি নিচে থেকে পরিস্থিতি সামলান। আমাকে ডেকে উঠতে হবে। কবীর চৌধুরী সুসমিকে নিয়ে গেছে। যেভাবেই হোক ওই কন্ট্রোল রুমে ঢুকতে হবে আমাদের।'

ফিটজেরাল্ড মাথা ঝাঁকাবার সময়ও পেলেন না, তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা লোকজনের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে আসছে। প্রথমেই কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিই আড়াল খুঁজে নিতে সাহায্য করল সবাইকে। পাল্টা জবাব দেয়ার জন্যে ওদের কাছে মাত্র তিনটে অটোমেটিক রয়েছে। একটু পরই অবশ্য সংখ্যাটা বেড়ে চারে দাঁড়াল। গ্যালারী থেকে এক লোক গুলি করছিল, ট্রিগার টেনে তাকে ফেলে দিল রানা। সদ্য কারামুক্ত একজন ক্রু তার অস্ত্রটা তুলে নিয়ে ফিরে এলো আড়ালে।

নিচু করা কাঁধের ধাক্কায় ডিম্বাকৃতি একটা ধাতব দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে, রানার গোড়ালির পিছনে বুলেটগুলো যেন টগবগ করে ফুটছে। এক প্রস্থ সিঁড়ি এঁকেবেঁকে ওপর দিকে উঠে গেছে। ডেকে ওঠার সময় এখন শুধু ধাতব ধাপে ওর বুটের শব্দ। আস্তিনের ভেতর রক্ত গড়ানোর স্পর্শ অনুভব করছে ও, তবে হাতটা এখনও কাজ করছে। গুরুদায়িত্ব পালনের একটা দৃঢ় সংকল্পই ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। কবীর চৌধুরীকে থামাতেই হবে। থামাবার উপায়

একটাই। হত্যা। ওর দূষিত মগজ ধ্বংস করা গেলেই শুধু শরীরের ভেতর আশ্রয় নেয়া পিশাচটাকে থামানো সম্ভব। আশা করা যায় সাবমেরিনের কমান্ডাররা যুক্তি মানবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা কেয়ামত, যাই বলা হোক, এড়ানো সম্ভব।

মুখে তাজা বাতাস অনুভব করল রানা। তারমানে নিশ্চয়ই ডেকের কাছাকাছি চলে এসেছে। পায়ের পেশি টনটন করছে ব্যথায়, পরিষ্কার সংকেত দিচ্ছে ওর ভার বহন করতে সক্ষম নয় আর। তারপরও সামনে বাড়ল রানা, ঢলে পড়ল ভারী হাতলটার ওপর। সেটা নিচের দিকে নেমে গিয়ে ডেকে ঢোকার পথ খুলে দিল ওকে। হায় আল্লাহ! কোথায় সে? ডেক হাউজিং থেকে মাথা বের করতেই প্রবল বাতাস খুলিটাকে ধরে টান দিল। ও যেন বিশাল কোন্ বিল্ডিং-এর ছাদে রয়েছে। ধু-ধু প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া রেলওয়ে লাইনের মত ঝাঁক ঝাঁক, সারি সারি পাইপ চারদিকে।

রোটর ব্লেডের ক্রমশ বেড়ে ওঠা গর্জন শুনতে পেয়ে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে স্টার্ন-এর দিকে তাকাল রানা। টাওয়ারসদৃশ ব্রিজ স্ট্রাকচারের সামনে সেই বেল কপ্টার, শূন্যে তোলা হচ্ছে। ওদিকে ছুটল রানা, পাইপগুলো পেরুবার জন্যে লাফ দিতে হলো, যতক্ষণ না পৌঁছাতে পারল সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াকে।

লাফ দিয়ে একটা হ্যাচ কাভারে চড়ল রানা, আঁচড়াআঁচড়ি করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, অটোমেটিকটা ঠেলে দিচ্ছে নিজের সামনে। এক সময় ক্যাটওয়াকের নাগাল পেয়ে গেল, সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও। কপ্টার স্থির হলো, কাত হলো সামান্য, তারপর ক্যাটওয়াকের বরাবর লাইন ধরে এমনভাবে এগুতে শুরু করল যেন ওটাকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করছে। কপ্টারের ভোঁতা নাক চকচক করতে দেখছে রানা, ফড়িংয়ের মাথার মত, প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ওর কাজ শুধু অস্ত্র তুলে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ঝাঁঝরা করে

দেয়া। শরীর টান টান হলো, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিতে পাইলটের কাঠামো ধরা পড়ল, ধরা পড়ল কবীর চৌধুরীও–এবং নিনা সুসমি।

কাঁপা কাঁপা গর্জন রানার কানের গহ্বর ভরে তুলল। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। ওর মাথার ওপর আকাশ ঢেকে দিল কপ্টারটা। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আর ফিউজিলাজ ছিন্নভিন্ন হবার ধাতব শব্দ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে রানা। ককপিট বিস্ফোরিত হলো একটা বালব্-এর মত। কোথায়। কিছুই না। ট্রিগারে পেঁচিয়ে থাকা আঙুলটা যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাঁপছে। কিছুই ঘটছে না। চারদিক কাঁপানো রোটর ব্লেডের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। রানা ঘুরল। বেল ইতিমধ্যে ওপরে উঠতে শুরু করেছে, সিলভার বোদালের বো ছেঁড়ে কাত হচ্ছে স্টারবোর্ডের দিকে।

শারীরিক ব্যথার উৎস হয়ে ওঠে এমন এক লজ্জার সঙ্গে রানা উপলব্ধি করল, কি করে বসেছে সে। নিজের সঙ্গে, মাতৃভূমির সঙ্গে, গোটা পৃথিবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে শুধু একটা মেয়ের জন্যে। ককপিটে সুসমি ছিল বলে গুলি করেনি। কত বড় গাধা ও!

তিক্ততায় ভরা মন নিয়ে নিজের ব্যর্থতার দিকে পিছন ফিরল রানা, কপ্টারটার চলে যাওয়া দেখতে রাজি নয়।

ঠিক যেন একটা কুইকসটিক উইন্ডমিল, ওর সামনে শূন্যে খাড়া হয়ে রয়েছে ব্রিজ। এই তো! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনো, রানা! হামলা করো! অ্যাটাক! ক্যাটওয়াক ধরে হেলিডেকের দিকে ছুটতে শুরু করল ও।

হেলিডেকের পেরিমিটার থেকে ক্যানগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন মেকানিক আর একজন গার্ড। তারমানে রিফুয়েলিঙের কাজ হাতেই সারা হয়। লং রেঞ্জ থেকে শুরু করল রানা, বুলেটগুলোর প্যাসেজ দেখে নিয়ে শুধরে নিল লক্ষ্য। একটা

ফুয়েল ক্যান বিস্ফোরিত হলো। চোখের পলকে অগ্নিশিখার চৌকো একটা পুকুরে পরিণত হলো হেলিডেক। এভিয়েশান স্পিরিট ওটার চারদিক ভাসিয়ে দিচ্ছে। হলুদ একটা শিখা আকাশ ছুঁতে যাচ্ছে, শেষ প্রান্ত কেঁপে কেঁপে চকমক করায় ব্রিজটাকে যেন ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছে ও। কমলা শিখার ভেতর গাঢ় লাল রঙের শিখা লকলকে জিভের মত ছুটোছুটি করছে, ওরকম একটা বাইরে বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল ওটা আসলে মানুষ, জ্বলন্ত মশালে পরিণত হয়েছে। রানার চোখের সামনে ডেকে যেন গলে গেল লোকটা, কিংবা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুনের আঁচ রানার চোখের পাতা পুড়িয়ে দিচ্ছে, গরম করে তুলছে মুখ। শ্বাস নেয়ার মত বাতাস নেই কোথাও। অগ্নিশিখার গর্জন কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ধাক্কায় পিছু হটল রানা, প্রথমটার চেয়েও জোরাল। বাকি ফুয়েল ক্যানগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। এবার হলুদের চারধারে কালো ফিতে দেখা গেল, ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল ব্রিজ। কফারড্যাম-এর পাশ থেকে নিশ্চয়ই একটা অয়েল-ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে।

ক্যাটওয়াকের রেইল টপকে ডেকে নামল রানা। আগুনটা মনোযোগ হরণে দারুণ সফল। দৌড় শুরু করে লাফ দিয়ে পাইপগুলো টপকাল, পৌঁছে গেল কাছাকাছি ডেক হাউজিং-এ। আত্মধিক্কারের ফলে সৃষ্ট মনের ধোঁয়া কেটে যাচ্ছে, হাতের কাজ সুষ্ঠুভাবে সারার জন্যে মাথাটাকে রি-প্রোগ্রাম করছে। কন্ট্রোল রূমে ঢোকো। এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামছে, কম্প্যানিয়ানওয়ে থেকে ওর পাশে বেরিয়ে এলো একজন গার্ড। ট্রিগারে চাপ দিল রানা। কিন্তু ম্যাগাজিন খালি। গুলি করার জন্যে ঘুরতে যাচ্ছে লোকটা। উপায় না দেখে ব্যারেলটা তার অরক্ষিত পেটে যতদূর যায় সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কুঁজো হয়ে গেল সে, হাতের অস্ত্রটা ওপর দিকে সবেগে তুলে

এনে তার চোয়ালে আঘাত করল। মড়াৎ করে ভেঙে গেল লোকটার ঘাড়। একটা একটা করে আঙুল ছাড়িয়ে লাশের হাত থেকে অস্ত্রটা দখলে নিল রানা। নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

সিঁড়ির তলায় পৌঁছাচ্ছে, একটানা ড্রাম পেটানোর মত অটোমেটিক ফায়ারের শব্দ শুনতে পেল। হেভী মেটাল ডোর-এর পিছনে অপেক্ষা করছে ও, হৃৎপিণ্ডের বিরতিহীন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কব্জির কাছে নেমে এসে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত, বাহুটা ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে আসছে। কিন্তু কোন কিছুই বিবেচ্য নয় এখন, শুধু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া। ওর কাঁধে বিশাল এক দায়িত্ব। পারুক বা হারুক, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ সেই দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবে ও।

কয়েকবার বড় করে শ্বাস টেনে হাতলটা মোচড়াল রানা, তারপর দরজার গায়ে সামান্য হেলান দিল, যাতে মাত্র ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হয়। ওর সামনে ঘোলা পানি চকচক করছে। যেমন আন্দাজ করেছিল, ও যেখানে পোর্ট কম্প্যানিয়ানওয়ে ধরে ঢুকেছিল, তারচেয়ে এখন বো-র দিকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। ওর ওপরে, স্টার্ন-এর দিকে, সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াক–ওখান থেকে ডেক এরিয়ার সবটুকু দেখা যায়, ফলে ওখানকার গার্ডরা সবাইকেই নাগালের মধ্যে পাচ্ছে। ক্যাটওয়াকটার মাঝখানে এখন একটা রিভলভিং গান-প্লাটফর্ম দেখা যাচ্ছে, কারাগারের দিকে মুখ করে বসানো। শীল্ড-এর পিছনে গুড়ি মেরে বসে থাকা তিনজন গানার-এর পিঠ দেখতে পাচ্ছে রানা। কন্ট্রোল রূমের দিকে তাকাতে মনটা দমে গেল। দৈত্যাকার স্টীল লুভার সবগুলো শক্তভাবে বন্ধ হয়ে দুর্ভেদ্য একটা পাঁচিলে পরিণত হয়েছে। ওগুলোর সামনের ঝুল-বারান্দায় ছয় কি সাতটা লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

তিক্ত হলেও সত্যি, চৌধুরী সাম্রাজ্যের নার্ভ সেন্টারে ঢোকার

সহজ কোন পথ নেই। অথচ দুনিয়া ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু হতে সময় আছে আর মাত্র চার ঘণ্টারও কম।

আঠারো

ক্লান্তি আর নিজের প্রতি অনাস্থা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, কিনারা ঘেঁষে জেটি এলাকায় বেরিয়ে এলো রানা। এ-ব্যাপারে কখনোই কোন সন্দেহ ছিল না যে কাজটা অত্যন্ত কঠিন হবে। একবার যদি নিজের প্রতি করুণা জাগে, তুমি শেষ। হয়তো অন্য কারও প্রতি করুণা জাগলেও কথাটা সত্যি।

সিটকে আয়রন প্লেটিঙের গায়ে পিছিয়ে এলো, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। যত দূর দেখতে পাচ্ছে, ফিটজেরাল্ড আর কারা-মুক্ত বাকি ক্রুরা বার্থগুলোকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু লোক পৌঁছেছে সাইড গ্যালারিতে, ওদিক থেকে মাঝে মধ্যে গুলি হচ্ছে। কিছু লোক কন্ট্রোল রূমে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়েছে। গার্ডদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলির হিসাব নিতে গিয়ে রানা বুঝতে পারল ফিটজেরাল্ডের দলের হাতে নতুন কিছু অটোমেটিকও এসে গেছে। তবে যেদিকেই যাক, আসলে সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াকে বসানো গান-প্ল্যাটফর্মের রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাদেরকে। প্রথম কাজ ওটাকে অকেজো করা। দৃষ্টি আরও কাছে সরিয়ে এনে চোখ বুলাল ও। হোভারকার ট্র্যাক আর ওটার প্রটেকটিভ টিউব রানার ঠিক ছ'ফুট দূর দিয়ে এগিয়েছে। একটা হোভারক্রাফটকে যেন ওর কাজে লাগার কথা ভেবেই কাছাকাছি

ফাঁকটায় রাখা হয়েছে। মাত্র বিশ ফুট দূরে। চারদিকটা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

মাত্র দু'পা এগিয়েছে, কানের পর্দা ছেঁড়া তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো ওর মাথার ওপর। ডাইভ দিল রানা, পতনের ধাক্কা সামলাবার আগেই চোখ দুটো চেপে বন্ধ করে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক বুলেট কখন ওকে ঝাঁঝরা করবে। কিছুই ঘটল না। সাইরেন-এর চিৎকার থামছে না। একটু ঢিল পড়ল পেশিতে। এ নিশ্চয়ই অ্যালার্ম সিস্টেম, ডেকে আগুন লাগার ঘোষণা দিচ্ছে। না, বন্ধুরা, এদিক থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। সবাই যে যার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। আর জান বাঁচানোর চেয়ে বড় কাজ কি হতে পারে! মাথা তুলে ক্রল করে হোভারকারের দিকে এগোল রানা। ছয় সিটের সহজ-সরল একটা খোল, পেডালটা বৈদ্যুতিক মনোরেইল-এর সঙ্গে সংযুক্ত। ওটা উঁচু করলেই হোভারকার চালাবার মত শক্তির সাপ্লাই পাওয়া যাবে।

কান ঝালাপালা করা সাইরেনের শব্দ অবশেষে থামল। অকস্মাৎ চারদিকে নেমে এলো প্রায় ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা, শুধু কারাগারের সামনে আহত হয়ে পড়ে থাকা এক লোক গোঙাচ্ছে। সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াক থেকে অল্প এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো। চিরকালের জন্যে থেমে গেল গোঙানিটা। রানার দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ঘষা খেলো যে পাশে কেউ থাকলে শব্দটা শুনতে পেত। কাউকে পিছন থেকে গুলি করা ও পছন্দ করে না, তবে মাঝে মধ্যে কাজটা তারা নিজেরাই ওর জন্যে সহজ করে দেয়।

মাথার ওপর গ্যালারি বরাবর সাবধানী চোখ রেখে সিধে হলো রানা, তারপর দূরের গ্যালারির দিকে তাকাল। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। ওকে শত্রু ভেবে ফিটজেরাল্ডের লোকেরাও গুলি করতে পারে, কাজেই অতি দ্রুত জায়গা বদল করতে হবে ওকে। খালি অস্ত্রটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হোভারকারের ককপিটে রাখল।

হামাগুড়ি দিয়ে ট্র্যাক কভারের ছাদে উঠে বোর দিকে এগোচ্ছে। পাঁচ কি ছ'গজ এগোতেই গান ক্রুদের ছাড়িয়ে এলো। মুখ তুলে ওপরে তাকাতে দেখতে পেল অবজারভেশন স্লিট বা ফাটল বিশিষ্ট চৌকো মেটাল প্লেটের পিছনে ঝুঁকে রয়েছে তাদের কাঁধ। হাতের অস্ত্র তুলল রানা। সতর্ক করা চিৎকারটা শুরু হতেই উল্টো দিকের ছায়া থেকে বিস্ফোরিত হলো অটোমেটিক ফায়ার। রানা মনোযোগ দিল গান ক্রুদের ওপর। যেই তারা ঘুরতে শুরু করল, অমনি দীর্ঘ এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ও। দু'জন লোককে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখল। তৃতীয় লোকটা মেশিন-গান ঘোরানোর হাতলের সঙ্গে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। আবার গুলি করল রানা, কিন্তু ডিফেন্সিভ শীল্ড না থেমে ঘুরছেই। ওটায় লেগে আগুনের ফুলকি তৈরি করছে ওর বুলেটগুলো। গান ব্যারেলটা ওর দিকে নিচু হচ্ছে, এই সময় তৃতীয় লোকটা হঠাৎ একপাশে হড়কে গেল, তারপর স্থির হয়ে পড়ে থাকল, হাত দুটো রেইলিঙের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে।

রানা অনুভব করল ঘামে নেয়ে উঠেছে সারা শরীর। ওর পায়ের নিচে টানেলে দাঁত বসাচ্ছে বুলেট, গ্রাহ্য না করে হোভারকারের দিকে ছুটছে ও। ফাঁকের ভেতর দিয়ে লাফ দিল, ঝাপটা মারল লিভারে। তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল, হোভারক্রাফট উঁচু হয়ে সামনের দিকে এগোল। আষাঢ়ে বৃষ্টির মত টানেল হাউজিঙে ড্রাম বাজাচ্ছে বুলেট। মাথা নিচু করে হাতলটা ওপরে তুলে ধরেছে রানা। আরও দুটো ওপেনিং বা ফাঁক পাশ কাটাল। জেটি এরিয়ায় চলে এসেছে ও, কারাগারের পোর্টসাইডে। ফিটজেরাল্ডের লোকজনের হতচকিত চেহারা দেখতে পেল, ওর দিকে অস্ত্র তুলতে যাচ্ছে।

'আরে, করো কি! স্টপ ইট!' হুংকার ছাড়লেন কমান্ডার ফিটজেরাল্ড।

পরিস্থিতি দ্রুত উপলব্ধি করতে পারায় ভদ্রলোকের প্রতি

কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ির পিছনে আড়াল নিল ও। এটাই কন্ট্রোল রূমে উঠে গেছে। মাথা নিচু করে ওর পাশে চলে এলেন ফিটজেরাল্ড। 'তাকে আপনি পেয়েছেন?'

'না।'

রানার চেহারা দেখে ফিটজেরাল্ড বুঝতে পারলেন খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, তবে জানার জন্যে চাপ দিলেন না। 'দুর্ভাগ্য আমাদের। মেশিন-গানটা অকেজো করার জন্যে ধন্যবাদ। যে লোকটা আপনার দিকে ব্যারেল ঘোরাচ্ছিল আমরা তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

রানা দেখল ফিটজেরাল্ড একটা এফএন অটোমেটিক রাইফেল ধরে আছেন। 'এটা কোত্থেকে এলো?'

'ম্যাগাজিন আমাদের দখলে চলে এসেছে। আর্মস ও অ্যামিউনিশনের কোন অভাব নেই।'

'চমৎকার।' খোলা দরজা দিয়ে কারাগারের ভেতর তাকাল রানা। এক সারিতে শুয়ে থাকা আহত ক্রুদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে, তদারকি করতে দেখা গেল মাইকেল টাগকে। লাশগুলো শুয়ে আছে যেখানে পড়েছে সেখানেই। মৃত্যুর গন্ধে ভারী হয়ে আছে পরিবেশ। 'ক্ষতির পরিমাণ?'

মুখ কালো, ফিটজেরাল্ড বললেন, 'ভয়ানক। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওরা আমাদেরকে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে। মারা গেছে প্রায় ত্রিশজন, জখম হয়েছে পনেরো কি ষোলোজন। হামলা চালিয়ে ম্যাগাজিন দখল করেছেন চীনা ক্যাপটেন।' প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'তিনি, তাঁর চীনা ক্রুরা বুনো বিড়ালের মত লড়েছে।'

'এমারেল্ড ডলফিনে আপনার অপজিট নাম্বার, ক্যাপটেন ওয়েফারের খবর কি?'

'উনি ওদিকে, আরেক সিঁড়ির পিছনে। কন্ট্রোল রূমে যাবার জন্যে পাগল হয়ে আছেন। তাঁর ধারণা হ্যান্ড-গ্রেনেড ফাটিয়ে পথ

করে নিতে পারবেন।'

চার ইঞ্চি পুরু স্টীল লুভার-এর কথা মনে পড়ল রানার। হাতঘড়ি দেখল; হাতে সময় আর মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। 'চলুন, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাক।'

ওয়েফারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মাথায় সোনালি চুল, চেহারাটা এত সুন্দর যে দেখে মনে হয় জীবনের অপ্রীতিকর দিকগুলো তাঁকে ভোগাবার সুযোগ পায়নি। 'পারব না মানে!' রানার প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার ছেলেদের বলতে যা দেরি, বুলেটের সামনে বুক পেতে দেবে। আপনারা শুধু কাভারিং ফায়ার দিন, তারপর দেখুন কেমন জাদু দেখাই।'

'না-না, বুলেটের সামনে বুক পেতে দিলে তো কোন লাভ হবে না। মরা মানুষ আপনার কি কাজে লাগবে!' রানা অস্বস্তিবোধ করছে। তবে এ-কথাও ভুলতে পারছে না যে একটা করে সেকেন্ড পার হচ্ছে, আর সাবমেরিন দুটো ফায়ারিং পজিশনের আরও কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কিছু একটা করতেই হবে। ব্যগ্র ওয়েফারের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ক্লান্ত ফিটজেরাল্ডের দিকে তাকাল ও। 'ঠিক আছে।'

পাঁচ মিনিট পর; গ্যালারির আড়ালে বিশজন লোক নিয়ে তৈরি হয়ে আছেন ক্যাপটেন ওয়েফার। তাদের অস্ত্র ম্যাগাজিন থেকে পাওয়া স্মাইযার সাব-মেশিন গান আর কাপড়ে মোড়া চারটে হ্যান্ড-গ্রেনেড। কাপড় দিয়ে মোড়ার কারণ হলো ওগুলোকে গড়াতে না দিয়ে মেটাল স্ক্রীনের গোড়ায় ফাটানোর ইচ্ছে।

অ্যাসল্ট পার্টি দু'ভাবে বিভক্ত, প্রতি দলে দশজন করে। জেটি এলাকা থেকে কাভারিং ফায়ার পেয়ে একসঙ্গে হামলা শুরু করবে তারা দুটো সিঁড়ি বেয়ে উঠে। কাভারিং ফায়ার কার বা কিসের বিরুদ্ধে? ইস্পাতের খালি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্নটা করল রানা। ইচ্ছে হলো ভবিষ্যদ্বাণী করে কি ঘটতে পারে, তবে চেষ্টা করল মন থেকে সব মুছে ফেলতে।

হাতটা একপাশ থেকে আরেক পাশে নাড়িয়ে ক্যাপটেন ওয়েফার সংকেত দিলেন যে তিনি তৈরি। মেশিন-গান ফায়ার স্টীল লুভারগুলোকে আঘাত করছে। স্নায়ুবিদারক তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে ধাতব গা থেকে ছিটকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। লুভারগুলো ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর বন্ধ চোখের মত। তারপর, হঠাৎ, খুলে গেল চোখগুলো। ওয়েফারের লোকজন রণ-হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেছে, এই সময় চারটে ইস্পাতের দেয়ালে চারটে খাড়া ফাটল তৈরি হলো, সেই ফাটল থেকে উঁকি মারল হেভি মেশিন-গানের ব্যারেল।

কুঁকড়ে গেল রানা, কিছু ঘটার আগেই কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। ব্যারেলগুলো ঝাঁকি খেলো, হামলাকারীরা কাটা পড়ল যেন কাস্তের কোপে। মাজল্ ভেলোসিটি এতই বেশি, লোকগুলো যেন মুছে গেল ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা ছবির মত। একজন ছিল বাকি সবার আগে, শরীরে কয়েক ঝাঁক বুলেটের গতি নিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, এমন এক ভঙ্গিতে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে রইল, যেন হোসপাইপের অত্যন্ত শক্তিশালী একটা পানির ধারা তার বুকে লাগছে। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল লাশটা। একা শুধু ক্যাপটেন ওয়েফার হামলা চালিয়ে গেলেন, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছেন। একটা হ্যান্ড-গ্রেনেড ছুঁড়লেন, এবং তারপর একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন কি কারণে ওটার পিছু নিয়ে নিজেও হোঁচট খেতে খেতে ছুটলেন। দু'কদম এগিয়েছেন, লুভার-এর একটা ফাঁকে সরু শিখার স্তম্ভ বিস্ফোরিত হয়ে ঢেকে ফেলল তাঁকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলেন, মুখ থুবড়ে পড়লেন নিজের গ্রেনেডের ওপর। সেটা বিস্ফোরিত হতে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। জ্বলন্ত ইউনিফর্মের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল ডেক জুড়ে। স্টীল লুভারগুলোর কোন ক্ষতিই হয়নি। যেন একটা মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে, গান

ব্যারেলগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরু ফাঁকগুলোও বন্ধ হয়ে গেল। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর লোকজন মোচড় খাচ্ছে, মাংস পোড়ার অসহনীয় গন্ধ বাতাসে। রানার শরীর ও মন দুটোই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

'ওহ্ মাই গড!' ফিটজেরাল্ড চোখ বুজে আছেন।

'হ্যাঁ।' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছে রানা, ভাবছে ফল দেবে এমন কি করা যায়। 'তবে একটা শিক্ষা পেয়েছি। স্মল আর্ম ব্যবহার করে ওখানে ঢোকা সম্ভব নয়। ম্যাগাজিনে আর কি আছে বলুন।'

আস্তিন দিয়ে কপাল মুছে চোখ মিট মিট করলেন ফিটজেরাল্ড। তিনি যেন একজন বক্সার, কড়া একটা ঘুসি খেয়ে মারটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করছেন, জানেন লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। 'টর্পেডো। ওগুলো বের করে তারা চেকও করেছে। নিউক্লিয়ার ও কনভেনশনাল।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই রানার মাথায় একটা আইডিয়া ডালপালা গজাতে শুরু করেছে। 'আপনি একজন আর্মারার যোগাড় করতে পারবেন?'

পিছন দিকটায় যে যেখানে আড়াল পেয়েছে গুড়ি মেরে বসে আছে, তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে রানার দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড। 'হ্যাঁ, পারব। কেন?'

চোয়াল শক্ত করল রানা। 'একটা বোমা বানাতে চাই।'

দেড় ঘণ্টা পর, ম্যাগাজিন অর্থাৎ অস্ত্রাগারে দাঁড়িয়ে থাকা রানার অনুভূতি হলো একজন সার্জেনের মত, কোন রোগীর জীবন বাঁচানোর অপারেশন পরিচালনা করছে। আর্মারার-এর টেবিলে একটা কনভেনশনাল টর্পেডোর বিচ্ছিন্ন করা শেল দেখা যাচ্ছে, ওটাকে ঘিরে স্তূপ হয়ে আছে রঙিন সব তার আর ইলেকট্রিকাল সার্কিট। দু'জন লোক ঝুঁকে আছে 'রোগীর' ওপর, আরেকজন

পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কপালের ঘাম মুছে দিচ্ছে। এ ঘামের উৎস শুধু ভয় নয়, ম্যাগাজিনে সঞ্চিত তীব্র উত্তাপও এর জন্যে দায়ী। গত এক ঘণ্টায় ভয়াবহতার দিক থেকে মাত্রা ছাড়ানো তিনটে বিস্ফোরণ ট্যাংকার সিলভার বোদালকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। রানা ধরে নিয়েছে এগুলো হলো ডেকে ওর লাগিয়ে আসা আগুনের ফল। বাল্কহেডগুলো ছুঁলে গরম লাগছে, ধরে নেয়া চলে আগুনটা গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মানে হলো, হয় ডুবে মরতে হবে, নয়তো পুড়ে।

'কেমন এগোচ্ছে?' মূল কাজে ওকে হাত লাগাতে না দেয়ায় রানা অস্থিরতায় ভুগছে।

'প্রায় হয়ে এসেছে, সার।' গলার আওয়াজ শান্ত, নিয়ন্ত্রিত। 'আমরা শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি কোনভাবেই যেন ইমপাল্‌স্ কনডাক্টর সার্কিট ছুঁয়ে না ফেলি।'

গলার বাতাস কষ্ট করে গিলে নিল রানা। 'যদি ছোঁও?'

'ইয়ে, সার···' গলায় ক্ষমা-প্রার্থনার সুর, '···ওটা ফেটে যেতে পারে।'

প্রশ্নটা করার অপরাধে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে, সেই সঙ্গে এছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে চাইছে রানা। এই যেমন–হঠাৎ মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাওয়া নেহাতই দৈবাৎ একটা ব্যাপার–সুসমির কপালে কি ঘটছে?

'আমি দুঃখিত।' যারা শুনবে তাদের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না যে কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার অভাব আছে। 'তবে হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতি তোমার যে ভীতি আছে সেটাকে অবশ্যই দূর করতে হবে। নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে আরও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছ, এটা প্রমাণ করতে পারলে তোমার হাতকড়া খুলে নেয়া হবে। আমি চাই তুমি যৌক্তিক আচরণ করো। ভেবে দেখো কেমন ভাগ্যবতী

মেয়ে তুমি, আর সবাইকে বাদ দিয়ে তোমাকে পছন্দ করা হয়েছে। যিশুর মায়ের কথা ভেবে দেখো। তাঁর ব্যাপারটা তোমার কাছে তাৎপর্যময় বলে মনে হয় না? নগণ্য ও সাধারণ, অথচ তাকেই বেছে নেয়া হলো আদর্শ গর্ভধাত্রী হিসেবে, যাতে নতুন একটা সম্প্রদায়ের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়।' তার দৃষ্টি বাঁকা পথে ঘুরে এলো নখ দিয়ে আঁচড়ানো ক্ষতবিক্ষত জানোয়ারের মুখ থেকে।

মুখ তুলে তাকাতে জানোয়ারের খুদে চোখ দুটোয় চকচকে একটা ভাব দেখে শিউরে উঠল সুসমি। তার রাবারের মত ঠোঁট ভাঁজ খেয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে সুসমি—পশুটা যেন আর আমাকে চুমো খেতে না আসে।

'কাজ শেষ, সার।'

সামনে এগিয়ে এসে রানা দেখল তারগুলো থেকে ডিটোনেটারটা সাবধানে টেনে সরিয়ে নেয়া হলো। ওর স্বস্তির নিঃশ্বাস কারও আর শুনতে বাকি থাকল না। 'ফেটে যাবার ভয় না থাকলে তোমাদের পিঠ চাপড়ে দিতাম,' নিচু গলায় বলল ও। 'ফিউজটা কি রকম?'

'বারো সেকেন্ডের, সার।'

বিস্ফোরকের ছোট ব্যাগটা ডিটোনেটারের চারপাশে শক্ত করে প্যাক করতে দেখল রানা, তারপর চোখ তুলে টেবিলের ওদিকে দাঁড়ানো ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডের দিকে তাকাল। তাঁর মুখের ভাব পড়তে যদি ওর ভুল না হয়, সেখানে লেখা রয়েছে—এতে যদি কাজ না হয়, দুনিয়ার আশা ত্যাগ করাই ভাল।

উনিশ

ইস্পাতের আড়কাঠ ধরে ঝুলে রয়েছে, ক্লান্তি আর বমিবমি ভাব-এর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে রানার ভেতর। অসহ্য ব্যথায় দপ্‌দপ্‌ করছে কাঁধ। ষাট ফুট নিচে ডকের পানিতে নিষ্প্রভ একটা চকচকে ভাব। হাত ছুটে গেলে লিংকন-এর স্টারবোর্ড ডাইভিং প্লেইনে পড়বে ও। আল্লাহ্‌, পড়লেই শেষ! শরীরের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেকে উঁচু করল, আড়কাঠে উঠে বসার সময় চোখ-মুখ কোঁচকাল ধাতব কিনারা উরুর চামড়া চিরে দেয়ায়। ক্লান্তির আরেকটা ঢেউ এসে আচ্ছন্ন করে তুলল ওকে, চোখ বুজে এক চুল নড়ছে না। তারপর নিশ্চিত হলো, ভারসাম্য ঠিক আছে, ইস্পাতের আড়কাঠ থেকে পড়ে যাবার ভয় নেই। বেশ কিছুক্ষণ হাঁপাল ও, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো হৃৎপিণ্ড। তারপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হ্যাভারস্যাক কাঁধ থেকে খুলল। ভারসাম্য রক্ষায় আবার সমস্যা হচ্ছে। প্যাকটা ভারী। অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়ে বেশি সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে নিজের সামনে ইস্পাতের আড়কাঠ বা স্টীল গার্ডার-এর ওপর রাখল প্যাকটা। ফ্ল্যাপ-এর একটা কোণ খুলে হাঁ হয়ে আছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে সরু পেন্সিল ফিউজ। ঝিম ধরা ভাবটা কাটিয়ে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সেন্ট্রাল ক্যাটওয়াকের দিকে তাকাল। আড়কাঠের নিচে, নিজস্ব রেইলে সচল, উড়ে আসার ভঙ্গিতে ওর কাছে চলে আসছে টিভি স্ক্যানার। সব কিছু দেখে ফেলে, এরকম একটা কুৎসিত

পোকার মত ধীরে ধীরে একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরছে।

রানা ওটাকে ওর নিচে দিয়ে চলে যেতে দিল। লক্ষ করল, ভারী একটা ধাতব বাহু ওটাকে রেইল-এর সঙ্গে আটকে রেখেছে। সামান্য ঘর্ঘর শব্দ তুলে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোচ্ছে, পৌঁছাল লুভারড় স্ক্রীন-এর সেন্ট্রাল পয়েন্টে। বাঁ হাত তুলে ঘড়ির কাঁটার ওপর চোখ রাখল রানা। এক...দুই...তিন... সেকেন্ডগুলো পার হচ্ছে, ফিরতি পথে স্ক্যানারের সময় ও গতির হিসাব রাখছে ও। বারো সেকেন্ড পার হবার পর বুঝতে পারল রেইলের ঠিক কোথায় থাকবে স্ক্যানারটা—লুভার থেকে পনেরো ফুট দূরে। নিচে দিয়ে স্ক্যানারটাকে ফিরে যেতে দিল ও। গার্ডার ধরে সাবধানে সামনের দিকে এগোচ্ছে। এবার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না, হৃৎপিণ্ড অনবরত লাফাচ্ছে, সেই সঙ্গে ভিজে যাচ্ছে হাতের তালু। লুভার-এর গায়ে উইপন স্লিট বা ফাটলে চোখ রেখে কেউ তাকিয়ে থাকলে ওকে অবশ্যই দেখতে পাবে। এই মুহূর্তে ডালে বসা সহজ একটা টার্গেট রানা।

চোখ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা একটা পয়েন্টে পৌঁছাল, হ্যাভারস্যাকের পিঠে আটকানো S আকৃতির হুকটা ধরার জন্যে ঝুঁকতে হলো সামনের দিকে। আবার অসুস্থতার একটা ঢেউ আচ্ছন্ন করে তুলল। পিছনে, নিজের ট্র্যাক-এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে স্ক্যানার, অনুগত ভঙ্গিতে ঘুরে যাচ্ছে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা মৃদু ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে। আধ মিনিট, তারপরই আবার ওটা ওর নিচে পৌঁছাবে। ইতিমধ্যে ঝুল-বারান্দার প্রায় ওপরে চলে এসেছে ও, দেখতে পাচ্ছে সিঁড়ির গোড়ায় গুড়ি মেরে বসে রয়েছেন ফিটজেরাল্ড আর তাঁর লোকেরা। ওদেরকে আরও ভাল একটা সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ যেন ওকে বেচারা ওয়েফারের চেয়ে একটু বেশি শক্তি দেন। বেশ কষ্ট করে ঘাড় ফেরাতে দেখতে পেল স্ক্যানারটা আর মাত্র বিশ ফুট দূরে। দাঁতে দাঁত চেপে পুরোপুরি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, মাথা একদিকে

ফেরানো, মুখ সেঁটে আছে ইস্পাতের গার্ডারে। হাত দুটো দু'দিক থেকে ঝুলছে, দু'হাতে ধরে আছে ভারী হ্যাভারস্যাক, অপেক্ষা করছে।

বুম!

বিস্ফোরণের শক্তি জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিল, নিবু নিবু হলো সমস্ত বাতি, থেমে গেল স্ক্যানার। রানা ওর দাঁড়ে পায়ের আঙুল বাধিয়ে ঝুলে আছে, ব্যথা ও আতংকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ওর নাগাল থেকে স্ক্যানার চার ফুট দূরে। বোমার ওজন ওর আহত হাতটাকে সকেট থেকে ছিঁড়ে বের করে আনতে চাইছে। আর অল্প কয়েক সেকেন্ডের বেশি ঝুলে থাকা সম্ভব নয়। সর্বশেষ বিস্ফোরণটা যদি পাওয়ার সাপ্লাইয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে তাহলে ওরা শেষ। আয় না রে, শালা! ঠোঁট কমড়ে ধরায় রক্তের স্বাদ পেল। ওর হাতের আঙুল ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছে। বোমাটা যদি জেটি এলাকায় পড়ে যায় আর ফাটে...চিন্তাটা আঙুলগুলোকে মোড়ার শক্তি এনে দিল। অনুভব করছে বাহুর পেশিগুলো একটা একটা করে শক্তি হারাচ্ছে। এই সময় আলো উজ্জ্বল হলো, মৃদু ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে আবার সচল হলো স্ক্যানার। দুটো আড়ষ্ট আঙুল দিয়ে ফিউজটা ধরল রানা। কোন সাড়া নেই, তবু চাপ দিয়ে স্ক্যানার-এর বাহুর দিকে তাক করল হুকটা। ওর হাতের উল্টোপিঠের মাংসে খাঁজ কাটল ওটা, তারপর মোচড় খেয়ে স্ক্যানার-এর বাহুতে আটকে গেল। হ্যাভারস্যাক খসে পড়ল, কেঁপে কেঁপে ঝুলে রয়েছে স্ক্যানার-এর পিছনে; মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে আগের মতই নিজের পথ ধরে এগোচ্ছে স্ক্যানার।

রানা যেন সম্মোহিত, ইস্পাতের দেয়ালের সঙ্গে ওটার দূরত্ব কমে আসা দেখছে। আর ঠিক তখনই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি ওর কানে চিৎকার জুড়ে দিল। রানা যেন একটা ব্যাঙ, উল্টো দিকে লাফ দিচ্ছে। কিছুদূর আসার পর খসে পড়ল ডকে।

জেটিতে পড়তে ব্যর্থ হলো কয়েক ইঞ্চির জন্যে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়েছে, তখনই বজ্রপাতের মত বিকট শব্দের সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো আগুনের ঝলক দেখা গেল, গোটা জাহাজ কেঁপে উঠল থরথর করে। ওর মাথা তলিয়ে গেল পানির নিচে। আবার যখন পানির ওপর চোখ তুলল, দেখল ঘন ধোঁয়ার চাদর ঝুল-বারান্দাকে ঢেকে দিচ্ছে। স্মল আর্মস ফায়ারের শব্দও ঢুকল কানে।

কয়েক জোড়া হাত পানি থেকে টেনে তুলল ওকে। একটা অটোমেটিক ছিনিয়ে নিয়ে স্টারবোর্ড সিঁড়ির দিকে ছুটল ও। গ্যালারি লেভেলের ওপর উঠল ওর মাথা, দেখল সেন্ট্রাল লুভারগুলো বিস্ফোরণে কাত হয়ে পড়েছে, দেখতে হয়েছে উদ্ভট আকৃতির কালো দাঁতের মত মেটাল স্ক্রীনে বিরাট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ছুটে এসে রানা দেখল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বিস্ফোরণে কবীর চৌধুরী যে-সব লোক মারা যায়নি তাদের এক কোণে খেদিয়ে এনে মেঝেতে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, সবার হাত মাথার পিছনে। কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে পাওয়া গেল, ভয়ে এখনও মেশিনের পিছনে লুকিয়ে আছে। প্রতিটি মেশিন-গানার যে যার পোস্টে মারা গেছে। ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডকে হেঁটে আসতে দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা, সঙ্গে একজন চীনা ভদ্রলোক রয়েছেন। 'কুবলাই খানের ক্যাপটেন চুয়াঙ মাও। বিস্ফোরণের পর ইনিই তাঁর লোকজন নিয়ে ভেতরে ঢুকে সবাইকে নিরস্ত্র করেছেন।'

'তবে আসল কাজটা করেছেন আপনি, মাসুদ রানা,' হ্যান্ডশেক করার সময় ঘন ঘন মাথা নত করে বললেন চুয়াঙ মাও। 'সেজন্যে আমাদের গণচীন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আপনাকে লাল সালাম, কমরেড।'

'ধন্যবাদ, লাল সালাম সবিনয়ে গ্রহণ করা হলো,' বলল

রানা। 'কিন্তু হাতে কাজ এখনও অনেক। ক্যাপটেন কোথায়?'

প্রকাণ্ড গ্লোবটার দিকে ইঙ্গিত করলেন চুয়াঙ মাও, এখনও লাটিমের মত ঘুরছে সেটা। 'এখনও যদি মারা গিয়ে না থাকে, একটু পর যাবে।'

লোকটাকে রক্তে ভেজা ইউনিফর্ম গায়ে পড়ে থাকা অবস্থায় খুঁজে পেল রানা। মৃত্যুর ছায়া পড়তে শুরু করেছে মুখে। তবে যেন জেদ আর দম্ভ দেখাতেই মাথাটা উঁচু করল। 'তুমি দেরি করে ফেলেছ। আমাদের সাবমেরিন দুটো এর মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে গেছে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওগুলো থেকে মিসাইল ছোঁড়া হবে।' মাথা নাড়ল। 'তোমার কিছুই করার নেই।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। ক্লান্তি প্রায় মৃত্যু ডেকে আনছে। ক্ষতটা আবার খুলে গেছে, এই ব্যথা সহ্য করার মত নয়। ওর এখন শুধু ইচ্ছে করছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওকে চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে পাগলের মত দ্রুত। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়। কি করতে পারে ওরা? কি করার আছে? স্তরে স্তরে সাজানো ইকুইপমেন্টগুলোর ওপর ছুটোছুটি করছে দৃষ্টি কোন সমাধান পাবার প্রত্যাশায়। কিছু একটায় আটকে গেল চোখ। একটা সুযোগ আছে। ক্ষীণ, সামান্য একটা সম্ভাবনা।

কনসোল-এর একটা রিলে স্ক্রীনে এক সেট কো-অর্ডিনেট্স্ দেখা যাচ্ছে। ওগুলো থেকে চোখ তুলে দৈত্যাকার গ্লোবটার দিকে তাকাল রানা। দুটো আলো, চিহ্নিত করছে 'কে.সি-ওয়ান' ও 'কে.সি-টু', একটা আলো উত্তর আটলান্টিক থেকে, আরেকটা ভারত মহাসাগর থেকে। কবীর চৌধুরী এক ও কবীর চৌধুরী দুই। এমারেল্ড ডলফিন আর কুবলাই খান। রিলে স্ক্রীনে কো-অর্ডিনেট্স্-এর সঙ্গে গ্লোবে দেখানো পজিশন মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে রানা। কুবলাই খানের পজিশন স্ক্রীনের সঙ্গে প্রায় মেলে। কিন্তু এমারল্ডে ডলফিনের কো-অর্ডিনেট্স্ কোথায়?

আরেকটা বিস্ফোরণ গোটা জাহাজকে কাঁপিয়ে দিল, এবার

স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়াটা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে ভেন্টিলেটর দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রানা অনুভব করতে পারছে প্রতিটি নির্যাতিত হার্টবিটের সঙ্গে টিক-টিক করে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়। ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড ও ক্যাপটেন চুয়াঙ মাও, দু'জনেই ওর মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন

'মিস্টার রানা!'

'কমরেড!'

হাত তুলে দু'জনকেই থামতে ও শান্ত হতে বলল রানা, চোখের সামনে তুলে হাতঘড়ি দেখছে। 'জানি আমাদের হাতে আর চার মিনিট সময়। আপনারা কি একটা প্রিন্টআউট ট্র্যান্সমিশন ইউনিট চালাতে পারবেন?'

'অবশ্যই! কেন?' জিজ্ঞেস করলেন কুবলাই খানের ক্যাপটেন চুয়াঙ মাও।

'খুঁজে বের করুন, তারপর ট্র্যান্সমিট করার জন্যে তৈরি হন। কি বা কেন, একটু পর বলছি।'

কনসোল-এর উল্টোদিকের আইল-এ চোখ বুলাল রানা। সারি সারি মেশিন, তার একটার গায়ে লাশ আটকে রয়েছে লাশটা সরাতে বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। রক্তের দাগের ভেতর অস্পষ্ট, আরেক সেট কো-অর্ডিনেটস্-এর মিট মিট করা ডিজিটাল দেখতে পেল। গ্লোব-এর সঙ্গে মেলাল, এমারেল্ড ডলফিনের ইন্ডিকেটেড পজিশনের কাছাকাছি ওগুলো। ছুটে চুয়াঙ মাও-এর পাশে চলে এসে 'কবীর চৌধুরী ওয়ান' চিহ্নিত বোতামটায় চাপ দিল রানা।

চুয়াঙ মাও উত্তেজনায় অধীর, সেই সঙ্গে বিহ্বল, মুখ তুলে রানাকে দেখছে। আরেক পাশে দাঁড়ানো ফিটজেরাল্ডও হতভম্ব, চোখে প্রশ্ন।

'আমরা চেষ্টা করতে পারি,' বলল রানা, সম্পূর্ণ শান্ত। 'কি চেষ্টা করতে পারি? সাবমেরিনগুলোকে রি-টার্গেট করতে।'

'নতুন টার্গেট দেবেন, কমরেড রানা?' চুয়াঙ মাও এখনও বিহ্বল। 'কি সেগুলো?'

'ওগুলোই ওগুলোর টার্গেট, পরস্পরের,' বলল রানা, কার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে থামল না। 'কুবলাই খানকে দেব এমারেল্ড ডলফিন, আর এমারেল্ড ডলফিনকে দেব কুবলাই খান...'

'মাই গড!' ফিটজেরাল্ডের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এতে কাজ হতে পারে!'

'লাল সালাম, কমরেড, লাল সালাম!' চুয়াঙ মাও সশ্রদ্ধচিত্তে ঘন ঘন মাথা নোয়ালেন। তাঁর আঙুল কী-বোর্ডের ওপর তৈরি হয়ে ঝুলছে। সংখ্যাগুলো আওড়াতে শুরু করল রানা। যে মেসেজটা পৃথিবী নামক এই গ্রহটাকে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে সেটা তাঁর সামনে ধীরে ধীরে একটা বিজনেস টেলেক্স-এর মত আকৃতি পেতে শুরু করল। 'ক্যাপটেন অভ কবীর চৌধুরী ওয়ান। নিউ টার্গিট কো-অর্ডিনেটস্। রিপিট, নিউ টার্গিট কো-অর্ডিনেটস্–'

কাজটা শেষ করতে এক মিনিটও লাগল না। চুয়াঙ মাও কালবিলম্ব না করে কুবলাই খানের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। হঠাৎ প্রশ্নটা জাগল মনে। সাবমেরিন দুটো যদি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে? শিউরে উঠল রানা। গোটা প্ল্যানটা নির্ভর করছে 'যদি'-র ওপর। টেলেক্স মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ঘেলা বারোটা বাজতে ঠিক এক মিনিট বাকি থাকতে কিচিরমিচির শব্দের সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওটা।

'কে.সি-ওয়ান। মেসেজ রিসিভড্ অ্যান্ড আন্ডারস্টুড।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেশিনের দিকে তর্জনী তাক করলেন চুয়াঙ মাও। 'সাড়া দাও, কে.সি-টু, বাপের সঙ্গে কথা বলো।'

গ্লোবটার দিকে তাকাল রানা। অনেকগুলো মার্কিন ও চীনা শহর ছাড়াও বাংলাদেশের দুটো শহরে মিটমিট করছে আলোর

ফোঁটাগুলো। এসব শহরে মানুষ কাজ করছে, হাঁটছে, ঘুমাচ্ছে–সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে মারাও যাবে; অথচ এ-সম্পর্কে কেউ তারা কিছু জানে না।

'কমরেড রানা!'

টেলেক্স মেশিন আবার কাজ করছে। 'কে. সি-টু। মেসেজ রিসিভ অ্যান্ড আন্ডারস্টুড।' সময় এখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। যদিও এখনও বলার সময় আসেনি এটা অশুভ প্রহর, নাকি শুভ প্রহর।

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, অলস ভঙ্গিতে ঘুরতে থাকা গ্লোবটার ওপর চোখ; আর কিছু করার নেই রানার। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ শান্ত ও। হয়তো আরও বেশি কিছু আশা করা হয়েছিল ওর কাছ থেকে, কিন্তু নিজের সাধ্যের সবটুকু করেছে ও। কে কি মনে করল তাতে কিছু এসে যায় না, এই মুহূর্তে কড়া দু'আউন্স হুইস্কি পেতে হবে ওকে।

'কমরেড! দেখুন!'

গ্লোবে কিছু একটা ঘটছে। সাবমেরিনের আকৃতি থেকে ওপরে উঠছে বিন্দু দিয়ে তৈরি আলোর রেখা। কেঁপে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। এ নিশ্চয়ই মিসাইলের পথ ট্রেস করছে। হায় হায়! রেখাগুলো তো আটলান্টিক থেকে বাংলাদেশ আর চীনের দিকেই যাচ্ছে। আর ভারত মহাসাগর থেকে আকাশে ওঠা আলোর রেখা ছুটছে আমেরিকার দিকে।

তবে না! আকাশের অনেক ওপরে ওঠার সময় বৃত্তাকার একটা পথ তৈরি করল প্রথমে, তারপর ঘুরে গেল, সরাসরি রওনা হলো পরস্পরের দিকে। রেখা দুটো পরস্পরকে পাশ কাটাল, তারপর শুরু হলো ওগুলোর নিচে নামা। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে রানা, দেখছে প্রতি মুহূর্তে বিন্দু দিয়ে তৈরি রেখাগুলো 'কে.সি-ওয়ান' আর 'কে.সি-টু'-র কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

ওর পিছনে ট্যাংকার আরও একটু কাত হলো, ধাতব

গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—ওটারও যেন এই নাটকে ছোট্ট একটা ভূমিকা আছে।

গ্লোবটা আরেক পাক ঘুরে এলো। দেখা গেল কোথাও কোন বিন্দু, রেখা বা সাবমেরিনের লম্বাটে আকৃতি নেই।

'জিজাস ক্রাইস্ট!' ফিটজেরাল্ড হাঁপাচ্ছেন। 'মনে হচ্ছে আমরা পেরেছি!'

'অন্যের কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেয়া সাম্রাজ্যবাদীদের একটা পুরানো অভ্যাস।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছেন চুয়াঙ মাও, করুণা প্রকাশের ভঙ্গিতে ফিউজেরাল্ডের কাঁধ চাপড়ে দিলেন, নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখে রানার দিকে ফিরে মাথা নোয়ালেন। 'এ আপনার একার কৃতিত্ব, কমরেড রানা। লাল সালাম...'

একটা বিস্ফোরণ তার মুখ বন্ধ করে দিল। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। বিপদ এখনও কাটেনি। 'এবার আসুন নিজেরা বাঁচি। ডেকে কি অবস্থা?'

'ওখানে ওঠা সম্ভব নয়।' মাইকেল টাগ ওদের পাশে এসে দাঁড়াল, ধোঁয়া আর তেলে কালো হয়ে গেছে চেহারা। 'বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত আগুনের একটা চাদর ঝুলছে। প্রচণ্ড আঁচে কম্প্যানিয়ানওয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।'

'যে পথ দিয়ে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে,' ফিটজেরাল্ড বললেন। 'সবাইকে লিংকনে নিয়ে এসো। আর, বো-র ওই দরজা দুটো খোলার ব্যবস্থা করো। কবীর চৌধুরীর লোক যারা বেঁচে আছে তারা সবার শেষে সুযোগ পাবে।'

'ইয়েস, সার!' ঘুরল টাগ, মুখের সামনে লাউড-হেইলার তুলে নির্দেশ দিতে শুরু করল।

একটা রেডিওর খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা। 'কি ঘটছে বাইরের দুনিয়াকে জানানো দরকার। ওই দুই সাবমেরিন দুই সমুদ্রের মাঝখানে নিশ্চিহ্ন হলেও নিউক্লিয়ার ওঅরহেডের বিস্ফোরণ চারদিকে কতটুকু কি ক্ষতি করেছে তাও আমাদের

জানতে হবে। সন্দেহ নেই, দুনিয়া জুড়ে নিউক্লিয়ার আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা সবচেয়ে বেশি। দেশে দেশে যুদ্ধ বেধে যাওয়া খুবই সম্ভব।'

ফিটজেরাল্ড মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে, আমি আর ক্যাপটেন চুয়াঙ মাও এমবারকেশন সুপারভাইজ করছি। তবে খুব বেশি দেরি করবেন না!' শেষ কথাগুলো চিৎকার করে বলতে হলো, কারণ পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল জাহাজ। ভেন্টিলেটার গ্রিল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের রঙে ফাটল ধরছে, গরম আঁচই দায়ী।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে একটা ভিএইচএফ সেট খুঁজে নিল রানা। ছুঁতেই আঙুলে গরম ছ্যাকা লাগল। বিশেষ একটা কলসাইন ট্র্যান্সমিট শুরু করল। বিসিআই-এর কাভার অর্গানাইজেশন রানা এজেন্সির সবচেয়ে কাছের শাখা অফিস কলটা সঙ্গে সঙ্গে পিক করার কথা। সেট-এর আলো নিভে যাচ্ছে, জেনারেটারের যান্ত্রিক গুঞ্জন কমে নার্ভাস করে তোলা নিস্তব্ধতা নেমে আসছে। কি করছ তোমরা, সাড়া নেই কেন? এটা কি অসতর্ক থাকার সময়?

'...স্টেশন টোয়েনটি টু। স্টেইট ইওর মেসেজ। ওভার।'

থ্যাঙ্ক গড! স্পীকারের দিকে ঝুঁকল রানা। 'মেসেজটা এই মুহূর্তে সরাসরি বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান, নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর জেফ ব্যারেল, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জিফু ঝাঝং, চাইনিজ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ জুং জাউ ঝাউ এবং হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগনে পৌঁছাতে হবে। পরে দক্ষিণ আটলান্টিক ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের কাছাকাছি দেশগুলোকে সতর্ক করা যেতে পারে।

'মেসেজটা হলো: কোন পারমাণবিক শক্তি পরমাণু যুদ্ধ শুরু করেনি। মার্কিন সাবমেরিন এমারেল্ড ডলফিন ও চীনা সাবমেরিন

পরস্পরকে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ মিসাইল ছুঁড়ে ধ্বংস করেছে, ওর জন্যে দায়ী সর্বকালের সবচেয়ে কুখ্যাত একজন বিজ্ঞানী, যে কিনা মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার একজন ক্রিমিন্যালও বটে।

'মনিটরিং সিস্টেম থেকে পাওয়া তথ্য কতটুকু সত্য বা বাস্তব তা এখনও যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি, তবে আমাদের জানামতে সব মিলিয়ে দুই থেকে চারটে আইসিবিএম ব্যবহার করা হয়েছে, কম ওজনের নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ।

'মেসেজের শেষ অংশ: কেউ কোন যুদ্ধ শুরু করেনি, কাজেই সন্দেহবশত বা ভুলবশত কেউ যেন কারও ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের কথা না ভাবে। পরবর্তী রিপোর্ট সময়মত পাঠানো হবে। আউট।' সেট অফ করে দিয়ে গ্যালারির দিকে ছুটল রানা।

ধোঁয়া আর উত্তাপ কন্ট্রোল রুমটাকে ডেথ-চেম্বারে পরিণত করছে। রাক্ষুসে বোয়াল মাছ, ট্যাংকার বোদাল, স্টারবোর্ডের দিকে আরও কাত হয়ে পড়েছে। পা চালাতে কষ্ট হচ্ছে রানার। প্রবল বিস্ফোরণের ধাক্কায় জাহাজ আবার কেঁপে উঠল, কন্ট্রোল রুম থেকে রানাকে প্রায় ছুঁড়ে দিল ডেকে। প্রকাণ্ড গ্লোব কনসোল বাড়ি খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছেঁড়া তার ধোঁয়া ভর্তি অন্ধকারে ছোবল মারার ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে। হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগোল রানা, ভাঙা একটা কাঁচ হাতে ঢুকে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে।

'মিস্টার রানা?' ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড রানার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোন রকমে ভারসাম্য রক্ষা করলেন। রানাকে টেনে নিয়ে এলেন তিনি লুভারগুলোর ফাঁকের সামনে। 'বো-র দরজা কোনমতে খোলা যাচ্ছে না। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ করে নিতে হবে।'

ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে এসে চুয়াঙ মাও-ও বললেন। 'হ্যাঁ, আর কোন উপায় দেখছি না।'

গ্যালারি ধরে কিছুটা ওপরে উঠে ডেকের ওপর চোখ বুলাল রানা। পানি দ্রুত উঠে আসছে, স্টারবোর্ড সাইডের জেটির দিকটা এরই মধ্যে ডুবে গেছে। ইউএসএস লিংকনের জেটি মুক্ত হয়ে ঘুরে গেছে, ফরওয়ার্ড হ্যাচে পৌঁছানোর জন্যে সাঁতরে এগোতে হচ্ছে লোকজনকে। লিংকনের চারপাশে এমারেল্ড ডলফিনের মার্কিন ও কুবলাই খানের চীনা ক্রুরা গিজ গিজ করছে; সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্য করছে কমিউনিস্টদের, আবার উল্টোটাও ঘটছে। লিংকনের ক্রুরাও আমেরিকান, ফলে তুলনা করলে দেখা যাবে চীনারাই বেশি সাহায্য পাচ্ছে। কবীর চৌধুরীর সশস্ত্র লোকজন, টেকনিশিয়ান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের অস্ত্রের মুখে এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। চারদিকে ভীতিকর দৃশ্য। ধোঁয়া, আগুন, মাংস পোড়ার গন্ধ। আহত লোকজন ভয় পাচ্ছে তাদেরকে বোধহয় ফেলে রেখে যাওয়া হবে। অনেকে সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে নিজেরাই পানিতে নেমে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে লিংকনে।

ক্যাপটেন ওয়েফারের একজন আহত ক্রুকে দেখতে পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে তাকে সাহায্য করল রানা। সিঁড়ির নিচে ওর পা গোড়ালির ওপর ইঞ্চি তিনেক ডুবে গেল। ওর দুই বাহুতে ধরা লোকটা প্রলাপ বকছে। আরেকটা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ট্যাংকার। পানি ইতিমধ্যে কোমরে উঠে এসেছে, ঝাঁকিটা সামলানো তাই কঠিন হলো না। কারাগার ডুবু ডুবু। লোকটা কি ওর বুকে মারা গেল? অদৃশ্য জেটির দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রানা। শেষ বার্থিং রোপটাও খুলে গেছে, লিংকন এখন ডুবন্ত জেটির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ভেসে রয়েছে। ওটার পিছনে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ফিটজেরাল্ড।

আরও একটু কাত হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ট্যাংকার। লিংকনের দু'জন ক্রু রানার হাত থেকে অজ্ঞান লোকটাকে তুলে নিল।

'সবাইকে নিচে পাঠাও!' নির্দেশ দিলেন ফিটজেরাল্ড, তারপর মেইন অ্যাকসেস হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লিংকনে উঠে তাঁর পিছু নিল রানা।

নিচে নরক বলতে গেলে গুলজার। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ, আহতরা জায়গা করে নিয়েছে তাদের পায়ের ফাঁকে। হৈ-চৈ, হট্টগোল, কান্না, ধমক, অভিশাপ, বিলাপ, গোঙানি–এরকম শব্দদূষণ খুব কমই শুনেছে রানা।

ফিটজেরাল্ড কোন রকমে কন্ট্রোল রূমে পৌঁছাতে পারলেন, পৌঁছেই পিএ সিস্টেমে হুংকার ছাড়লেন। 'অল পারসানেল বিলো ডেকস্। ক্লোজ হ্যাচেস্। ডাইভিং স্টেশনস্।'

রানা ক্যাপটেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'অল পারসানেল এবোর্ড, স্যার–,' বিরতির মধ্যে যেন ম্লান ও করুণ একটা সুর। '–শুধু যারা রয়ে গেছে তারা বাদে, সার। হ্যাচেস্ শাট অ্যান্ড ক্লিপড্। সাবমেরিন রেডি ফর সী।'

ফিটজেরাল্ডের ঠোঁট কাঁপল, তারপর জরুরী তাগাদার সুরে বললেন, 'টর্পেডো রূম–কন্ট্রোল। লোড টিউব ওয়ান উইথ মার্ক ফরটিসিক্স টর্পেডো। এঞ্জিন রূম–কন্ট্রোল। হোল্ড হার স্টেডি।'

চারপাশের লোকদের ওপর চোখ বুলাল রানা। দরদর করে ঘামছে সবাই। উত্তেজনায় টান টান পরিবেশ।

'টর্পেডো রূম–কন্ট্রোল। ওপেন আউটার ডোর অন টিউব ওয়ান।'

এক লোক চোখ বুজে বিড়বিড় শুরু করল, 'মা মেরি, মা মেরি।'

রানার পিছন থেকে ভেসে এলো চুয়াঙ মাওয়ের কণ্ঠস্বর। ধর্ম মানুন বা না মানুন, তিনিও সম্ভবত প্রার্থনাই করছেন।

'কন্ট্রোল–টর্পেডো রূম। আউটার ডোর অন টিউব ওয়ান ওপেন।'

কেউ বা কিছু একটা সাবমেরিনের খোলে চাপড় মারল। মুঠো

শক্ত হয়ে গেল ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডের। 'ম্যাচ বেয়ারিং অ্যান্ড শূট।'

কন্ট্রোল রূমের পিছন থেকে দুটো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'সেট।'

'শূট!'

লিংকন কেঁপে উঠল। টান পড়ল রানার পেশিতে। কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঢেউ ঝাঁকি খাওয়াল সাবমেরিনকে। বো. শূন্যে উঠে গেল। লোকজন হাতের কাছে যা পেল তাই আঁকড়ে ধরে তাল সামলাচ্ছে। নিজের সামনে ডেক কাত হয়ে যেতে দেখছে রানা। পায়ের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে থাকা আহত লোকজন ব্যথায় ও ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শক ওয়েভ আঘাত করল লিংকনকে—জেটিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা সেই প্রকাণ্ড ঢেউ এটা। রানা ফিটজেরাল্ডের ওপর, ফিটজেরাল্ড চুয়াঙ মাওয়ের ওপর ঢলে পড়লেন—তিনজনই হাত-পা ছড়িয়ে ডেকে পড়ে থাকল। ফিটজেরাল্ড আগে সিধে হলেন, খোপ থেকে টেনে তুললেন পেরিস্কোপটা। হাতল ধরে ঝুঁকলেন তিনি, পিঠ বাঁকা হয়ে গেল। পাঁচ সেকেন্ড পর পেরিস্কোপ থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। হাসছেন। 'দেখুন।'

পেরিস্কোপে চোখ সাঁটল রানা। সামনে বিশাল আকারের জোড়া দরজা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওগুলোর মাঝখানে বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, কিনারাগুলো কর্কশ ও এবড়োখেবড়ো—যে-পথ দিয়ে বেরিয়ে গেছে টর্পেডো। ফাঁকটার সামনে আকাশ দেখতে পাচ্ছে রানা।

ফিটজেরাল্ড উল্লাসে ফেটে পড়লেন। 'টেইক হার আউট!'

বিশ

'ইয়েস?'

হাতের কাগজটায় টোকা মারলেন ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড। 'আপনাকে পাঠানো বিসিআই চীফের মেসেজ।'

কাগজটা প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল রানা। নির্দেশটা স্পষ্ট। 'কবীর চৌধুরীর ল্যাবরেটরি ধ্বংস করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। রাহাত খান।'

'মিস্টার রানা?' ফিটজেরাল্ড অপেক্ষা করছেন।

কাগজটা থেকে মুখ তুলল রানা। 'ওটা ওখানে এখনও আছে কিনা কে বলবে। আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, ওটা সী বেডের সঙ্গে আটকানো নয়। সরিয়ে ফেলা যায়।'

ফিটজেরাল্ডের হাতে আরও একটা কাগজ দেখা গেল। 'এটা পাঠিয়েছেন নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার কথামত কাজ করতে হবে। নির্দেশের সঙ্গে লেটেস্ট এরিয়াল রিকনিসন্স রিপোর্টও পাঠিয়েছেন। কবীর চৌধুরীর ল্যাবরেটরিকে এক ঘণ্টা আগেও সেই আগের জায়গাতেই দেখা গেছে। তবে প্রাণের কোন লক্ষণ ধরা পড়েনি। কোন হেলিকপ্টারও দেখা যায়নি।'

'তাহলে ল্যাব ছেড়ে চলে গেছে সবাই।' এটা কি ভুল ধারণা করছে রানা? নাকি ওখানে সুসমি নেই ভেবে আসলে স্বস্তি বোধ করছে? 'আপনি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?' জানতে

চাইল ও।

'যেভাবে চাইবেন,' ফিটজেরাল্ড বললেন। 'আপনি বললে টর্পেডো ছুঁড়ে বিপথগামী বিজ্ঞানীর ল্যাব ধ্বংস করে দিতে পারি। আপনি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, লেআউটটা যদি সেরকমই হয়, আমরা কড়াইয়ের গায়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেতরে ঢুকব। সবাই জানবে আগ্নেয়গিরির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্গিরণ। ইটালিয়ান নেভিকে বললেই হবে, তারা এগিয়ে এসে এলাকাটায় জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেবে। ওদের সরকারকে এরইমধ্যে সব জানানো হয়েছে।'

'হুম।' রানা গম্ভীর।

'কি ব্যাপার, মিস্টার রানা?' ফিটজেরাল্ড বিমূঢ়। 'আপনি কি কবীর চৌধুরীকে ধরতে চান না?'

রানা কিছু বলছে না, ভাবছে।

'কমরেড! এই মহাপাতক কবীর চৌধুরীকে অবশ্যই আমাদের হত্যা করা দরকার!' প্রচণ্ড রাগে কাঁপছেন চুয়াঙ মাও।

'আপনারা যা চান আমিও তাই চাই,' অবশেষে বলল রানা, ধীরে ধীরে। 'তবে আমার একটা বিশেষ সুযোগ দরকার। আপনারা ল্যাবটা ধ্বংস করার আগে ভেতরে আমি একবার একা ঢুকতে চাই।'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন, মিস্টার রানা?' ফিটজেরাল্ড প্রায় আঁতকে উঠলেন। 'কোন দুঃখে আপনি নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে যাবেন? ওখানে কি আছে, কারা আছে জানার কোনই প্রয়োজন নেই...'

'আছে,' বাধা দিল রানা, তবে ব্যাখ্যা করল না।

'কিন্তু আপনার বস্ই নির্দেশ দিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ল্যাবটা ধ্বংস করতে হবে।'

'আমার বস্ কি বলেছেন তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' বলল রানা। 'আপনি আসল কথাটা ভুলে যাচ্ছেন।'

'আসল কথা ভুলে যাচ্ছি?' ফিটজেরাল্ড বিস্মিত। 'কি সেটা?'

'কবীর চৌধুরী চাইনিজ এজেন্ট নিনা সুসমিকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'এ আপনি কি বলছেন, কমরেড রানা!' চুয়াঙ মাও হতভম্ব। 'তাহলে আমাকেও আপনার সঙ্গে থাকতে হবে...'

'আমি একা ঢুকব ল্যাবে,' রানার কণ্ঠস্বর দৃঢ়। 'সময় নেব এক ঘণ্টা। এর মধ্যে ফিরে না এলে শয়তানের ওই আস্তানা আপনারা উড়িয়ে দেবেন।'

রানা জানতেই পারল না ঠিক কত স্পীডে জিব্রালটার প্রণালী পেরিয়ে এলো ইউএসএস লিংকন, তবে আন্দাজ করল চল্লিশ নটের নিচে নয়। তবে সাবমেরিনের রেডিও থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সংবাদ শোনার সুযোগ পেল ও। আটলান্টিক ও ইন্ডিয়ান, দুই মহাসাগরে রহস্যময় দুটো টাইডাল ওয়েভ বা জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়ায় একশোরও বেশি পণ্যবাহী জাহাজ ডুবে গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আয়ারল্যান্ডের উপকূল এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, তবে প্রাণহানির সংখ্যা খুব কম। এদিকে, ভারত মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মালদ্বীপ। ওদের অন্তত কয়েকশো মাছ ধরার নৌকা ডুবে গেছে, প্লাবিত হয়েছে প্রায় ছ'টা দ্বীপ। দুই মহাসাগরে একই সময়ে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটার কারণ তদন্ত করার জন্যে জাতিসংঘ ও ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি দুটো আলাদা কমিটি গঠন করেছে। তবে বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে আশংকা ব্যক্ত করে বলেছেন, দুই মহাসাগরের সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝির কারণে কিংবা দুর্ঘটনাবশত স্বল্পমাত্রার পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে তাঁদের বেশিরভাগেরই ধারণা, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা খুব বেশি হবে না। রানা আন্দাজ করল, খুব বেশি হলে কম ওজনের মাত্র দুটো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে।

এরকম ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় দুনিয়ার সবচেয়ে

বড় অয়েল ট্যাংকার সিলভার বোদাল ডুবে যাবার খবরটা তেমন কোন গুরুত্বই পায়নি, খবরের শেষ দিকে এক আধবার উল্লেখ করা হলো, পরবর্তী নিউজ বুলেটিনে প্রসঙ্গটাই আর থাকল না।

বোনিফাসিয়ো প্রণালীতে সকালের দিকে ঢুকল লিংকন, পানি থেকে মাথা না তুলেই ঘুরে গেল স্টারবোর্ডের দিকে। ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডের কেবিনে ওয়েট সুট পরে বসে আছে রানা, নিজের ডাইভিং গিয়ার চেক করে নিচ্ছে। সুটটা ভালই ফিট করেছে। যথেষ্ট আঁটসাঁট, ফলে অয়লস্কিন ব্যাগে মোড়া ওয়ালথারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর বাঁ কাঁধে। স্কুবা ট্যাংকের গলায় রেগুলেটর ফিট করল ও, তারপর এয়ার ভালভ খুলল। ট্যাংক থেকে বার কয়েক ফুসফুসে বাতাস টেনে নিশ্চিত হয়ে নিল ঠিকমত কাজ করছে ওটা। মুখ তুলতেই দেখতে পেল দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন দুই ক্যাপটেন–ফিটজেরাল্ড ও চুয়াঙ মাও।

'আমরা সম্ভবত পৌঁছে গেছি,' বললেন ফিটজেরাল্ড। 'আপনি বরং একবার এসে দেখে যান।'

ট্যাংক, ফ্লিপার আর মাস্ক খুলে নিয়ে ওঁদের পিছু নিল রানা, তিনজন লাইন দিয়ে ঢুকল কন্ট্রোল রুমে। পেরিস্কোপের হাতল ধরে ঝুঁকে তাকাতেই পরিচিত গজদন্তসদৃশ পাথুরে উপকূল দেখতে পেল। বেশ খানিক দূর থেকে দেখায়, সেই সঙ্গে ওদের কৌণিক অবস্থান সঠিক হওয়ায়, এবড়োখেবড়ো অর্ধ বৃত্তাকার কড়াই-এর আউটলাইন সহজেই চেনা গেল। পাথরের প্রবেশপথ চিহ্নিত করছে সাদা ফেনার ছোপ ছোপ দাগ। রানার পেশিতে টান পড়ল, পেরিস্কোপ ঘোরাল পোর্টসাইডে। পাহাড়-প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে একটা খাঁড়ি, ওখানে সাদা বালির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে পারলে কড়াই-এর ঠোঁটে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। পেরিস্কোপ ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো রানা। 'হ্যাঁ, এটাই। হারবারে ঢোকার মুখে আর্লি ওয়ার্নিং ডিভাইস

আছে ওদের, কাজেই আমি খাঁড়ি হয়ে ঢোকার চেষ্টা করব। আপনি আরও একটু কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারেন? স্রোত খুব জোরাল।'

রানার আহত হাতটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড। 'বোকামির জন্যে কোন পদক থাকলে এখুনি আপনার বুকে আটকে দিতাম।'

'কমরেড রানা ফিফটি পার্সেন্ট সঠিক পথে আছেন,' পিছন থেকে বললেন কুবলাই খানের ক্যাপটেন চুয়াঙ মাও, আপাতত লিংকনে ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ডের অতিথি। 'হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক পথে থাকবেন আমাকেও যদি সঙ্গে নেন উনি।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমি শুধু নিজের জীবন বাজি ধরতে পারি, আর কারও নয়।' ট্যাংকটা তুলতে শুরু করল ও, সামনে চলে এসে স্ট্র্যাপের ভেতর হাত গলাতে ওকে সাহায্য করলেন মাও।

'আমি যা বলেছি মনে রাখবেন,' বললেন ফিটজেরাল্ড। 'আপনি এই ভেসেল ছেড়ে চলে যাবার পর হামলা শুরু করব আমি। ইটালিয়ান নেভি না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, ওরা এসে উদ্ধার করবে আপনাকে। আমার ওপর নির্দেশ আছে সারফেসে না ওঠার। উদ্গিরণের সময় আশপাশের জেলেরা যেন কোন সাবমেরিন দেখতে না পায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোমরের তৃতীয় স্ট্র্যাপটা আটকাল রানা। 'বুঝেছি। এখন আমাকে কোথায় দেখতে চান?'

ফিটজেরাল্ডের চোয়াল শক্ত হলো। 'সাবমেরিনের মাঝামাঝি একটা মিসাইল টিউবে পানি ভরছি। আপনি ওটার ভেতর থাকবেন। আমরা আউটার ডোর খুলে দেব, আপনি সাঁতরে বেরিয়ে যাবেন। ইকুইপমেন্ট নিয়ে আপনি কি যথেষ্ট লিফট পাবেন?'

রানা নিশ্চিত নয়, তবে মাথা ঝাঁকাল।

পনেরো মিনিট পর। একুশ ইঞ্চি ফায়ারিং টিউবে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। এই টিউব নিউক্লিয়ার মিসাইলের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়।

পানিতে ভরে যাচ্ছে টিউব। মাস্কটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নাক-মুখ ঢেকে ফেলল রানা। রেগুলেটর টিউব টেনে মাউথপীসটা মুখে পুরল। ইতিমধ্যে কোমরের কাছে উঠে এসেছে পানি। এরকম সময়েই মানুষের মনে মৃত্যুভয় জাগে। সিলভার বোদালের সঙ্গে যে-সব মানুষ মারা গেছে তাদের কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল রানা। এমন যদি হয়, সাগরে বেরুবার পর ও আর নড়তে পারল না? রেগুলেটর যদি ফেইল করে? ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ উঠতে দেখল ও। হ্যাচ পুরোপুরি খুলে যাচ্ছে। ওর মাথা থেকে তিন ফ্যাদম ওপরে সকালের রোদ চিকচিক করছে পানিতে।

সাগরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল তিনশো ফুট নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দু'দিকে লম্বা হয়ে রয়েছে। খোলে একটা চাপড় দিল রানা, অনুগত কুকুরকে যেন আদর করল। তারপর পা ছুঁড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল, উদ্দেশ্য সারফেস থেকে চারদিকটা দেখবে।

খাঁড়িতে পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগল রানার, তীর থেকে দূরে একটা পাথরের আড়ালে মাথা তুলল। আহত হাতটা আবার ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে। সামনে কোথাও কেউ নেই। অক্ষত বালুকাবেলায় ফিসফাস করছে শুধু কিছু সাদা ফেনা। বিশ্রাম নিতে মন চাইছে, কিন্তু জানে সময় নেই। যত কষ্টই হোক সামনে এগোতে হবে ওকে। কড়াই-এর কাছাকাছি চলে এলো ও, স্রোতকে সুযোগ দিল ওকে ঝামাপাথরের একটা উঁচু চাতালে তুলে দিতে, চাতালটার গায়ে শ্যাওলা জমেছে, আগাছায় ভর্তি; পিচ্ছিল ও নরম কুশনের মত অনুভূতি হলো। তীরে পৌঁছে ফ্লিপারগুলো টান দিয়ে খুলে ফেলল রানা। সূর্য এখনও দিগন্তরেখার খুব একটা ওপরে ওঠেনি। তবে কবীর চৌধুরী হারবারকে ঘিরে রাখা ছাই ও

কালো রঙের পাঁচিল কি যেন এক অশুভ প্রহরের অপেক্ষায় রয়েছে বলে মনে হলো ওর।

নিজের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা, ওর পায়ের তলায় ভলক্যানিক রক এমন মৃদু শব্দে গুঁড়ো হচ্ছে যেন কোন চার্চে ফিসফিস করছে কেউ। ধীরে ধীরে, সাবধানে উঠছে ও। ঠোঁটের কাছে পৌঁছে শুয়ে পড়ল, পাশে থাকল ফ্লিপার আর মাস্ক। হাঁপিয়ে গেছে ও, কাঁধ দপ্‌দপ্ করছে। ওর নিচে একটা সংকীর্ণ গিরিখাদ। ঝপ্ করে নেমে গেছে কড়াইয়ের গাঢ় পানিতে। দু'শো গজ দূরে ল্যাবটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, একটা অয়েল-রিগ ও মহাশূন্য অভিযানে ব্যবহারযোগ্য রকেটের লঞ্চিং প্যাড-এর মিশ্র আদলে তৈরি। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। নেই কোন প্রাণের সাড়া। হেলিডেকটা খালি পড়ে আছে। স্পীডবোটও দেখা যাচ্ছে না।

মাথা ঘুরিয়ে তীরের দিকে তাকাল রানা। র‍্যাম্পের শেষ প্রান্তে কোন জলযান নেই। দালানগুলোর সমস্ত শাটার বন্ধ। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে কবীর চৌধুরী তার হেডকোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু...

কিন্তুটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। তবে ওর মন বলছে জায়গাটা একেবারে খালি হতে পারে না। এখনও এখানে কেউ না কেউ আছেই।

আরও এক মিনিট সজাগ চোখ রেখে অপেক্ষা করল রানা। কড়াই-এর প্রতিটি দিক বারবার পরীক্ষা করছে। একটা জেদ চাপছে মনে। সত্যি কেউ আছে কিনা না দেখে ফিরবে না ও। হামাগুড়ি দিয়ে রিজটা টপকাল, গিরিখাদের গা বেয়ে নামছে। এখন ও ছায়ার ভেতর। নড়াচড়া করলে ওয়েট সুট চপ্‌চপ্ শব্দ করছে। নামার পথ সাবধানে বাছাই করছে, চেষ্টা করছে যতটা পারা যায় আড়ালে থাকতে। খালি পা, ধারাল পাথরে লেগে কেটে যাচ্ছে। পানির কিনারায় পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট লাগল। কব্জির

রোলেক্সে চোখ রেখে দেখল লিংকন ছেড়ে আসার পর সময় পার হয়েছে আধ ঘণ্টা।

মাস্কটা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে মুখে পরল রানা। তারপর পায়ে ফ্লিপার আটকাল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নেমে পড়ল সাগরে। সারফেসের নিচে সাঁতরাচ্ছে ও। সাগর ঘোলাটে, দৃষ্টি বেশিদূর চলে না। পায়ের প্রতিটি ঝাপটার সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ছে। কোন সোনার ডিভাইস ওর গতিপথ মনিটর করছে কি? অলস ভঙ্গিতে নেমে এসে ওর হাড় থেকে সমস্ত মাংস খসিয়ে নেবে না তো একটা ডেপথ্ চার্জ? চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে রানা এগিয়ে চলেছে, ভয়ের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বিরতিহীন নড়াচড়াকে। কিন্তু পথ যেন ফুরোয় না। ও কি টার্গেট থেকে অন্যদিকে সরে এসেছে? না, ওর সামনে ওই তো ওটা। ঘোলা পানির ভেতর অস্পষ্ট একটা গম্বুজ।

সাবধানতার মার নেই, পিছন দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। বুদ্বুদের দীর্ঘ একটা সারি, ঘোলা পানিতে যতদূর দৃষ্টি যায়। ও সারফেসের কাছাকাছি থাকলে ওগুলো কারও চোখে পড়ে যেতে পারে, তাই প্রথমে ডাইভ দিয়ে খোলের নিচে চলে এলো, তারপর পথ করে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল গুগলি-শামুকে ভর্তি গায়ের সঙ্গে ঘষা খেতে খেতে। আলোর আভা দ্রুত বাড়ছে। ঝাঁক ঝাঁক মাছ—আর কত বিচিত্র তাদের রঙ ও আকৃতি—ঘন ঘন আকস্মিক দিক বদলে যেন এক মজার খেলায় মেতে আছে। সারফেস ভেদ করে বাতাসে বেরুল ওর মাথা। মাস্ক খুলে মুখের ভেতর থেকে মাউথপীসটা বের করল। তাজা বাতাসে বুক ভরে নেয়ার সময় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। ল্যান্ডিং স্টেজের সঙ্গে পানির খুনসুটি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। সাঁতরে এসে ওটায় উঠল, হাতের ব্যথায় এমন মুখ কুঁচকে আছে, যেন কাউকে ভেঙাচ্ছে। ক্ষতটা খুলে যাওয়ায় ওয়েট সুটের ভেতর রক্ত গড়াবার স্পর্শ পাচ্ছে ও।

প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে ওয়ালথারটা বের করল। ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলতে হালকা সোলার মত লাগছে শরীরটা। বার কয়েক বড় করে শ্বাস নেয়ার পর টলমল করতে করতে দাঁড়াল। গত কয়েকদিনের বিরতিহীন উত্তেজনা ও অ্যাকশনের পর লিংকনে ওর যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়া হয়নি। সঞ্চিত শক্তির শেষটুকু ব্যবহার করছে ও।

পনটুনের একপাশে গিয়ার সরিয়ে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, হাতে পিস্তল। যে ক্যাটওয়াক আর ট্র্যাকগুলোয় এক সময় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল গার্ডরা, সেগুলো একদম খালি দেখে গা ছমছম করে উঠল। প্রথম স্টেজটার কাছে এসে এলিভেটরের দিকে মুখ করল। মনের ভেতর থেকে কেউ যেন ওটা ব্যবহার করতে নিষেধ করছে। পোর্ট-এর দিকে সরে আসতে একটা লোহার সিঁড়ি পেল, টিউব আকৃতির চারটে থামের একটাকে পেঁচিয়ে উঠে গেছে–এই থামগুলোই গোটা কাঠামোটাকে মাথায় তুলে রেখেছে। সাবধানে ধাপ বেয়ে উঠছে রানা। এমন একটা পয়েন্টে এসে পৌঁছাল যেখানে দুটো ঘেরা গ্যালারি। একটা সমকোণ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। একটা ছায়ার ভেতর, আরেকটার অর্ধেক উঠতি সূর্যের নাগালে। ত্রিশফুট নিচে খিল্‌খিল্‌ করছে সাগর, তবে আরও কাছাকাছি শব্দের উৎস আছে একটা। ছায়ায় ঢাকা গ্যালারি বরাবর কোথাও থেকে কাদের যেন গলা ভেসে আসছে।

শরীর টান টান হয়ে উঠল, ওয়ালথার ধরে থাকা ব্যথায় অসাড় আঙুলে শক্তি আনার চেষ্টা করল রানা। কথাগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তবে সুর শুনে সন্দেহের অবকাশ থাকল না যে কিছু নিয়ে তর্ক করছে কারা যেন। সিঁড়ির গোড়া থেকে গ্যালারি ধরে সাবধানে এগোল রানা। মাথার ওপর কোথাও ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ আওয়াজ করছে একটা শাটার সম্ভবত বাতাস লাগায়। একটা দরজাকে পাশ কাটাল রানা, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে সামনের দরজা দিয়ে। একজনের

গলার সুরে জরুরী ভাব স্পষ্ট, তার ভাষা ইটালিয়ান। একটা পোর্টহোলের নিচে মাথা নামাল রানা, দেখল ভারী ধাতব দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। দু'পা এগিয়ে কাঁধ দুটো দিয়ে কবাটে বাড়ি দিল ও, একটা বিস্ফোরণের মত ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কামরাটা খালি, ভেতরে কেউ নেই। তবে উল্টোদিকের দেয়ালে দুই স্তরের শেলফে টেলিভিশন স্ক্রীন আছে। প্রতিটি স্ক্রীন আলাদা আলাদা ছবি দেখাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর রানা বুঝতে পারল, সবগুলোই কমার্শিয়াল টিভি প্রোগ্রাম, পৃথিবীর চারদিক থেকে প্রচারিত হচ্ছে। টোকিও থেকে কুইজ গেইম, নিউ ইয়র্ক থেকে কমেডি নাটক, রোম থেকে নিউজ বুলেটিন। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে প্রকৃত সত্য আন্দাজ করে নিল রানা। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, এই খবরটা এখানে বসে শোনার অপেক্ষায় ছিল কবীর চৌধুরী। আতংকিত ঘোষণা, আর তারপরই এক এক করে স্ক্রীন খালি হয়ে যাওয়া। সবশেষে চরম নিরবতা। কবরের নিস্তব্ধতা।

শিউরে উঠে কামরা থেকে বেরুবার জন্যে ঘুরতে যাবে রানা, এই সময় একটা কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল ওকে।

'গুড ডে, রানা। আমি জানতাম তুমি আসবে।'

একুশ

হুবহু কবীর চৌধুরীর গলা। ভেসে এলো কামরার প্রতিটি টিভি স্ক্রীন থেকে। ভোজবাজির মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দৃশ্য মুছে গেছে,

স্ক্রীনগুলোয় এখন শুধু স্বর্ণ-সিংহাসনে বসা মোঘল সম্রাটের আয়েশী ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে তাকে। রূপালি পাত্রে কাজু বাদাম, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা একটা করে খাচ্ছে।

চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ফিটজেরাল্ডের দেয়া সময় শেষ হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। কবীর চৌধুরী যে খেলাই ওর সঙ্গে খেলতে চাক, সেটা না খেলার কোন বিকল্প খুব কমই আছে বলে মনে হয়। টিভি স্ক্রীন থেকে আবার কথা বলল সে।

'বেশ কিছুক্ষণ হলো তোমাকে আমি লক্ষ করছি। সত্যি কথা বলতে কি, সাগর থেকে উঠে আসার পর থেকেই।' কণ্ঠস্বরে কোন হিংস্রভাব বা বিদ্বেষ, কিছুই নেই। 'পরিস্থিতির বিচারে তোমার আগমন যথার্থ হয়েছে। এরকমটিই যে ঘটবে, এ আগে থেকে বলে দেয়া যায়। আহা, তোমাকে তো চিনি আমি। তোমার স্বভাবই হলো আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়া।'

'তোমার মুখে আমার স্বভাবের বিশ্লেষণ শুনতে এখানে আমি আসিনি,' রানার গলা ধারাল। 'নিনা সুসমি কোথায়?'

হাত দুটো সিংহাসনের দু'দিকে প্রসারিত করল কবীর চৌধুরী। 'দেখতেই পাচ্ছ আমার সঙ্গে নেই। শোনো, কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তারমধ্যে সুসমি একটা হতে পারে। আমি এখন রয়েছি রুম ফোরসি-তে। না-না, ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি সশস্ত্র নই।' ধীরে ধীরে ডান হাতটা একটা কনসোলের দিকে বাড়াল সে। স্ক্রীনগুলো খালি হয়ে গেল।

বাদাম ভরা বাটিটা নামিয়ে রেখে কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিল সে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটা নকল ছবি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যেতে উন্মোচিত হলো টিভি মনিটরের স্ক্রীন। পিকচার কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল, দেখল কুৎসিতদর্শন বিশাল

অক্টোপাস্ পানির ভেতর শুঁড় ছড়িয়ে রেখেছে। পালস রেট বেড়ে যাওয়ায় তার চোখের সাদাটে অংশ সামান্য লালচে হয়ে উঠল। গোল মুখটা প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত। ক্যামেরাটা গ্লাস ঢাকা ফোরসির মৃত্যুফাঁদের দিকে মুখ করা। স্বর্ণসিংহাসনে হেলান দিয়ে হাতলটা আঁকড়ে ধরল সে। তার খুব ইচ্ছে মেয়েটি যেমন চেঁচিয়েছে, রানাও তেমনি চিৎকার করুক। রানাকে মৃত্যুভয়ে আতংকিত দেখতে পেলে ভাল হত। দেখতে ইচ্ছে করে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট ছটফট করছে। চাক্ষুষ করবে জীবিত থাকা অবস্থায় অক্টোপাস্ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে রানাকে। দেখতে চায় চিরকালের জন্যে অভিশাপ-মুক্ত হয়েছে সে। দেখতে চায়! দেখতে চায়! যতক্ষণ ঘন লাল একটা পর্দা দৃশ্যটা ঢেকে না ফেলে।

'রুম ফোরসি? শব্দটা শুনতে ভাল লাগল না। আমি তোমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে পছন্দ করব।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই আবিষ্কার করল রানার হাতে ধরা ওয়ালথারের চকচকে ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো রানা। 'এবার, আমার আগের প্রশ্নে ফেরা যাক। সুসমি কোথায়?'

লোমহীন একজোড়া ভুরু কপালে তুলল সে। 'সুসমি? শেষবার নামটা ছিল নিনা সুসমি। তার আগে সম্ভবত মেজর নিনা সুসমি। আমি কি এখানে কোমল একটা সম্পর্কের সূচনা লক্ষ করছি?'

পিস্তলটা তার হৃৎপিণ্ডের আরও ছয় ইঞ্চি কাছে সরিয়ে আনল রানা। 'খুচরো আলাপের সময় নেই, চৌধুরী। আর দশ মিনিটও নেই, তোমার এই আস্তানা টর্পেডোর ঘায়ে ডুবে যাবে।'

আবার হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত করল সে। 'তোমার এই কথা কোন তাৎপর্য বহন করে না, রানা। এরই মধ্যে নিজেও মারা যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমার দেখার বিষয় হলো, তুমিও আমার সঙ্গে মরো কিনা। ইচ্ছে ছিল অক্টোপাসের খোরাক

বানাব তোমাকে, কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছে কি পূরণ হয়!' দেয়ালের দিকে একটা হাত তুলল কবীর চৌধুরী। 'বাইরেটা যদি দেখতে পাও, লক্ষ করবে আমরা ডুবছি।

'এমন কি সীমিত বুদ্ধিমত্তা ও অল্প কল্পনাশক্তির অধিকারী তুমিও না ভেবে উঠতে পারোনি যে এত থাকতে এখানে কেন আমি আমার ল্যাবরেটরি বানাতে গেলাম। এর একটা কারণ এটা ব্যাথিস্ফিয়ার, কেইবল্-এ ঝোলানো গবেষণাগার, আমার সহকর্মী বিজ্ঞানীরা এখানে বসে সামুদ্রিক প্রাণী ও সামুদ্রিক আগাছা নিয়ে গবেষণা করেন; দ্বিতীয় কারণ—এটাই আসল—এই কড়াই প্র্যাকটিক্যালি বটমলেস, ধরে নিতে পারো এর কোন তলা নেই। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে একটা সকেট তৈরি হয়, নেমে যায় মাটির কয়েক মাইল নিচে। ওখানেই আমার আশ্রয় নেয়ার কথা ছিল, যখন মাথার ওপর দিয়ে তুমুল নিউক্লিয়ার ঝড়-ঝাপটা বয়ে যাবে। পৃথিবী নামের এই মা জননীর নতুন একটা গর্ভ বলতে পারো ওই অতল গহ্বরকে। যে গর্ভ তোমার মত ইডিয়েট আর বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রজন্মের জন্ম দিত, আমার নেতৃত্বে তারা গড়ে তুলত নতুন একটা সভ্যতা—যেখানে থাকত না দুর্নীতি, নির্যাতন, অবিচার, বৈষম্য, ঘুষ, বর্ণবাদ, জাতিভেদ, ক্লেশ, ক্লান্তি, রোগ-শোক আর আর্থিক অসচ্ছলতা।

'কিন্তু তুমি আমার সেই স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছ!' তার গলা থেকে এই মুহূর্তে হুংকার বেরিয়ে আসছে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। 'তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ, কাজেই এখন আমিও তোমাকে শেষ করে দেব। তুমি ল্যাবে ঢোকা মাত্র আমি একটা বোতামে চাপ দিয়েছি, রানা। এই প্রকাণ্ড জলযানের ডাইভ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ডাইভ দিয়ে যেখানে নামবে সেখান থেকে আর কোন দিন উঠে আসবে না। ধীরে ধীরে, তবে নিশ্চিতভাবে, আমরা নামতেই থাকব,

যতক্ষণ প্রেশার এই কাঠামোটাকে টিনের কৌটার মত দুমড়ে-মুচড়ে তুবড়ে ছিন্নভিন্ন না করে!'

তার বকবকানি থেকে সারমর্মটুকু বের করে নিল রানা। সত্যি যদি ডুবছেই ওরা, এ থেকে লিংকনের ক্যাপটেন ফিটজেরাল্ড কি ধরে নেবেন? যত তাড়াতাড়ি আশা করেছিল তারচেয়েও আগে চলে এলো উত্তরটা।

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ মেঝে থেকে শূন্যে তুলে দিল রানার পা, কামরাটা কাঁপতে কাঁপতে কাত হতে যাচ্ছে। সময়ের আগেই হামলা শুরু করে দিয়েছেন ফিটজেরাল্ড, কিন্তু তাঁর আর কি দোষ! চোখের সামনে থেকে শিকার পালাচ্ছে দেখার পর তিনি তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না।

স্বর্ণসিংহাসনের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে রানা, ওর সামনে খাড়া একটা ঢালের মত উঁচু হচ্ছে কামরার মেঝে। একটা চেয়ার ছুটে আসছে দেখে গড়িয়ে একপাশে সরে এলো ও, কবীর চৌধুরী আর নিজের ওয়ালথারটা খুঁজছে।

দেয়াল বরাবর ছ'ফুট দূরে, লোভে চকচক করছে চোখ দুটো, বিকট শব্দে মেঝেতে থাবা মারল সে। রানার ওয়ালথার পিস্তলটার আকৃতি তার থাবার ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠল, দেয়ালে ঘষা খেয়ে সিধে হচ্ছে। ঘোলা একজোড়া চোখ থেকে আক্রোশ আর ঘৃণার রশ্মি বেরুচ্ছে বলে সন্দেহ হলো রানার। ওর পেশি নিজে থেকে টান টান হচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, যেন মাংসের ভেতর প্রথম বুলেটটাকে জায়গা করে দেয়ার প্রস্তুতি। তৃতীয় চোখটা ধাতব, সরাসরি ওর হৃৎপিণ্ডে তাক করা, এক চুল নড়ছে না। আর ঠিক তখনই কাঁচ ও ইস্পাতের তৈরি টেবিল ভেঙে পড়ল কামরার ভেতর। সরে যাবার সময় পেলেও, প্রতিপক্ষের কাঁধে আঘাত করল টেবিলের একটা কোণ। পিস্তলটা ছেড়ে দিল সে। নিজেও পড়ে গেছে মেঝেতে। তারপর সিধে হলো। দেখল পরিস্থিতি

উল্টো হয়ে গেছে। সে নিরস্ত্র, পিস্তলটা রানার হাতে।

'এমন অনেক সময় এসেছে যখন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আমি মারিনি,' শান্ত, প্রায় ম্লান সুরে বলল রানা। 'এমন ভাব দেখিয়েছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে। এর একটাই কারণ, কোন আশা নেই জেনেও আমি আশা করেছি তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে, আমার দেশ ও গোটা দুনিয়ার জন্যে খুব বড় কোন অবদান রাখবে–ইংরেজিতে যাকে বলে হোপ এগেইনস্ট হোপ। কিন্তু আজ বুঝি আমি আসলে ভুল করেছিলাম। তুমি সুস্থ হবার নও। প্রকৃতি তোমাকে তৈরিই করেছে নষ্ট প্রতিভা হিসেবে। তুমি হয়তো প্রকৃতির একটা ত্রুটি, হয়তো ভুল করেই তোমার ডিএনএ-তে এমন প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে তুমি ভাল করতে গিয়ে বারবার শুধু সভ্যতার জন্যে মহা বিপদ ডেকে আনবে...'

'আরে হালায়, লেকচার না মাইরা তরাতরি কাম সার!' অবজ্ঞার সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল সে। রানা হতভম্ব বললেও কিছু বলা হয় না। ও হাঁ। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'চান্স পাইছস, মাইরা ফালা, তারপর ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে দ্যাশে ফিইরা যা। মাগার একটা কথা মনে রাহিস, বাংলাদ্যাশের ঘরে ঘরে হাজার হাজার কবীর চৌধুরী জন্ম নিব–ঠিক আমারই লাহান।'

বাজে বকবকানি শোনার সময় কোথায়, সরাসরি তার মাথায় পর পর দুটো গুলি করল রানা। কবীর চৌধুরী ছিটকে পড়ে গেল, পড়ার আগেই মারা গেছে। সত্যি মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করার দরকার নেই, কারণ তার খুলি উড়ে যেতে দেখেছে রানা, দেখেছে দেয়ালে মগজের ছিটে লাগতে।

আরও একটা বিস্ফোরণ আহত খোলটাকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিল। কামরা ধীরে ধীরে সিধে হলো। তবে দ্রুতগতি পানির একটা স্রোত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল, কার্পেটের ওপর দিয়ে যেন

কারও খোঁজে ছুটে আসছে। লাশটার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। খুলি নেই, মগজ বেরিয়ে পড়েছে, তারপরও ভয় হচ্ছে জাত শত্রু লোকটা আবার না কোনভাবে বেঁচে ওঠে।

'আমি মরিনি।'

কে যেন ফিসফিস করল রানার কানে। ঝুঁকল রানা, হাঁটু গেড়ে বসল লাশের পাশে। রক্তাক্ত মুখটা ধরে নিজের দিকে ফেরাল। ঠোঁট নড়ছে?

'সত্যি আমি মরিনি, রানা,' অবিকল কবীর চৌধুরীর গলা। 'তুমি আমাকে মারতেও পারবে না, কারণ তোমার কাছ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে আমার আরেক আস্তানার পথে রয়েছি আমি। দুঃখ শুধু এই যে সব আবার নতুন করে শুরু করতে হবে...'

লাশটার কালো আলখেল্লার ভেতর হাত ভরে হাতড়াচ্ছে রানা। অবশেষে সিগারেটের প্যাকেট আকৃতির পকেট-টিভিটা পেয়ে বের করে আনল। স্ক্রীনে কবীর চৌধুরী দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পিছনে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

'ওটা? আমার প্রতিরূপ বলতে পারো। ঠিক ক্লোন নয়, আরও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নিজের এরকম আরও প্রতিরূপ বানাবার পরিকল্পনা আমার আছে...'

আছাড় দিয়ে পকেট-টিভিটা ভেঙে ফেলল রানা, তারপর লাফ দিয়ে দরজা টপকাল, সুসমির নাম ধরে চিৎকার করছে। পানি ইতিমধ্যে খেপা স্রোত হয়ে উঠেছে, টেনে ধরে রাখতে চাইছে ওর পা। কম্প্যানিয়ানওয়ে থেকে নেমে করিডরের শেষ মাথায় ফুলছে, উঁচু হচ্ছে। তিনটে মাছের পিছু নিয়ে ছুটে গেল তিনটে দৈত্যাকার স্কুইড। সর্বনাশ, কি ঘটছে এ-সব! তারপর মনে পড়ল। অ্যাকুয়েরিয়াম! ট্যাংকটা নিশ্চয়ই বিস্ফোরিত হয়েছে। হে আল্লাহ, সুসমি যদি ওখানে থাকে তাহলে তার কোন আশাই নেই। আবার

চিৎকার করে ডাকল ও, স্রোতের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে। করিডরের মাথার ওপর দিয়ে একটা ধাতব রেইল চলে গেছে, ওটা থেকে ঝুলছে পরিচিত গোল আকৃতির একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট, সম্ভবত রসদ আর ভারী ইকুইপমেন্ট সরাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

মাথা নিচু করে কেইবলটাকে পাশ কাটাল রানা, সিধে হবার সময় দেখল একটা ছায়া ওর পথ আগলেছে। ছায়াটার পিছনে পরিচিত ও ভীতিকর মাংসের বিশাল স্তূপ, অর্থাৎ জানোয়ার। তার প্রকাণ্ড মাথা করিডরের ছাদে ঘষা খাচ্ছে। ঠোঁট ফাঁক হলো রোমহর্ষক হাসির সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে। বটবৃক্ষের কাণ্ডের মত মোটা পা পানির স্রোতকে দ্বীপের মত ঠেকিয়ে দিচ্ছে। গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলল রানা, কিন্তু ওর আহত হাতে গতি খুব কম। হাতটা ধরে দেয়ালের ওপর আছড়াল জানোয়ার, গিঁটগুলো ভেঙে ফেলল বাদামের খোসার মত। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল রানা, মনে হলো কাঁদছে, তবে একই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ আর মরিয়া ভাব নিয়ে ভাঁজ করা হাঁটু ওপরে তুলল যত জোরে পারা যায়। গুঙিয়ে উঠল জানোয়ার, এক হাত দিয়ে রানার মুখটা পুরো ঢেকে ফেলল, তারপর ঠেলে ফেলে দিল বন্যায়।

পানির তলায় রানা দম আটকে মারা যাচ্ছে। পা ছুঁড়ছে ও, কিন্তু জানোয়ারকে লাগছে না। পায়ের ওপর ভর দিয়ে সিধে হবার চেষ্টা করল, পারল না। পানির নিচে জানোয়ারও নিজের মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে, তাকিয়ে আছে ওর চোখে। তার একটা হাত ওর বুকে। মরিয়া হয়ে জানোয়ারের চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল রানা। ওর কাঁধে ইস্পাতের দাঁত বসাতে যাচ্ছিল, রানাকে ছেড়ে সিধে হলো জানোয়ার।

পানির তোড় সামলে সিধে হতে পারল রানা, দেখল ও ঝুলে আছে ছোট একটা কন্ট্রোল বক্স ধরে–এক গোছা তারের সঙ্গে সংযুক্ত, যেগুলো চলে গেছে সিলিঙের রেইলের দিকে।

জানোয়ারের এক চোখ বন্ধ, বন্ধ পাতার নিচে থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। তীব্র স্রোত গ্রাহ্য না করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সে। এটা তার হিংস্রতা, নাকি কৌতুকবোধ রানা জানে না—এরকম আহত অবস্থায়ও চোখাচোখি হলেই সে তার ইস্পাতের দাঁতগুলো রানাকে দেখাবার জন্যে মুখ হাঁ করছে, তারপর হাসছে। প্রতিক্রিয়ায় গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রানার। এই মুহূর্তে ম্যাগনেটটা টোপের মত ঝুলছে ভয়ালদর্শন ধাতব দাঁতগুলোর সামনে। দৃশ্যটা রানার মাথার ভেতর ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। নিজের শরীরের সমস্ত ব্যথা ভুলে গিয়ে কন্ট্রোল-বক্সের কনট্যাক্ট বাটনটা হাত দিয়ে চেপে ধরল ও।

লাফ দিয়ে জানোয়ারের মুখে ঢুকে পড়ল ম্যাগনেটটা, ঢুকে আটকে থাকল, ঘূর্ণনজনিত ঘর্ঘর আওয়াজ করছে। জানোয়ারকে দেখে মনে হলো বিকৃত আকৃতি নিয়ে একটা শিশু, প্রকাণ্ড একটা স্তন চুষছে। তারপর মস্ত মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটল। হাতির পায়ের মত একটা হাত ম্যাগনেটটাকে দাঁত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, ওটা যেন সামান্য একটা মাছি বা পোকা। দ্বিতীয় বোতামে চাপ দিল রানা। তার টান টান হলো, স্রোতের বিরুদ্ধে টেনে আনছে জানোয়ারকে। এবার ম্যাগনেটটা খোলার জন্যে দু'হাত দিয়ে চেষ্টা করছে জানোয়ার, টোপ খাওয়া মাছের মত মোচড় খাচ্ছে শরীর। রানার আতংকিত, বিহ্বল দৃষ্টি দেখতে পেল জানোয়ারের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে পাঁচ-সাতটা মোটা শুঁড়। বলতে গেলে প্রায় চোখের পলকে অক্টোপাসটা জড়িয়ে ধরল তাকে। শুঁড়ের প্রচণ্ড চাপে, প্যাঁচে ও পেষণে জানোয়ার ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। রক্ত এত ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, রানার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল দৃশ্যটা। রক্তের একটা গাঢ় স্রোত ছুটে এসে ধাক্কা মারল ওর বুকে। দুঃস্বপ্নে তাড়া খাওয়া একজন মানুষের মত ঘুরেই ছুটল রানা। স্রোত ওকে সাহায্য করছে পালাতে

'সুসমি!' রানা আসলে চিৎকার করছে নিজের কাছে প্রমাণ করার জন্যে যে সত্যি বেঁচে আছে ও। স্রোত ওকে নিয়ে একটা বাঁক ঘুরল। পানি এখানে ধাতব দেয়ালে লেগে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছে। একটা কম্প্যানিয়ানওয়ে-র রেইল ধরে বন্যা থেকে নিজেকে তুলে আনল রানা। কাঠামোটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কাত হয়ে পড়ার পর এতক্ষণে দোমড়াতে শুরু করেছে, এমন গোঙাচ্ছে আর কাঁপছে যেন মৃত্যু ঘটতে আর বেশি দেরি নেই। সামনে দড়াম করে একটা দরজা খুলে গেল, ভেঙে ছিটকে পড়ল কবাটটা। সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানা, রোগা একটা হাত দেখা গেল চৌকাঠে।

'সুসমি!' ছুটল রানা, ডেক ও দেয়াল ধরে তাল সামলাচ্ছে। করিডরে বেরিয়ে এলো সুসমির মাথা আর কাঁধ। তার চোখ চিনতে পারল রানাকে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি কঠিন, শক্ত বরফ হয়ে গেল।

'সুসমি!' নিজের গলার আওয়াজ শুনিয়ে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। সুসমি নিশ্চয়ই একটা ঘোর, একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে। আল্লাহই জানে ওকে নিয়ে কি না কি করেছে ওরা। তারপর সুসমির হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। প্রথমে পিস্তলের মাজলটা কাত হয়ে থাকা সিলিঙের দিকে তাক করা হয়েছে বলে মনে হলো। তারপর ধীরে ধীরে নিচু হয়ে রানার বুক বরাবর স্থির হলো। ট্রিগারের ওপর চেপে বসছে আঙুল।

'এই মিশন শেষ হয়ে গেলে হুতাও হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে। সে বেঁচে নেই, তুমিও বেঁচে থাকবে না।' কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে গেল রানার।

ও এগিয়ে আসছে। 'সুসমি, অস্ত্রটা দাও আমাকে। হাতটা লম্বা করে দিল ও। পিস্তলের ব্যারেল একটু কাঁপল। রানার আঙুলগুলো সুসমির অস্ত্রটাকে ছুঁলো। মুঠোর ভেতর ভরল। চোখে

চোখ, কেউ পলক ফেলছে না। তারপর চোখ মিটমিট করল সুসমি, যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। করিডর থেকে একটা প্রতিধ্বনি ভেসে এলো, কেউ যেন তার প্রকাণ্ড হাত দিয়ে টেনে টেনে লোহার পাত ছিঁড়ছে। সুসমির হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে, তাকে নিজের বুকে টেনে আনল রানা। অনুভব করল মেয়েটার বুকের ভেতর পাখির মত ধক-ধক করছে হৃৎপিণ্ড। 'মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।' তার হাতটা শক্ত করে ধরল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে; পানির তীব্র একটা নতুন স্রোত তেড়ে আসছে ওদের দিকে।

ডুবে মরার ভয়টা মাত্রা ছাড়াচ্ছে। পেট পানির ওপর, পায়ের নিচে মেঝে নেই। হে আল্লাহ্, এই পানি ভর্তি কবর থেকে বেরুবার উপায় কি? দেয়াল এখন এমনভাবে কাত হয়ে আছে, মনে হচ্ছে ওটাই যেন ছাদ। হাঁটু গাড়ল রানা, চিবুক ডুবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নাক আর মাথাও ডুবে যাবে। তারপর? মাথাটা ঝাঁকাল রানা, সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সুসমির হাতটা আগের মতই ধরে আছে। পোর্টের দিকের বাল্কহেডে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, কাত হওয়া ডেকের ওপর ইঞ্চি ছয়েক খোলা। ওটার তলা থেকে তিন ইঞ্চি ওপরে ছোট একটা ফলক। চারটে ভাষায় স্টেনসিল করা রয়েছে জাদুকরী দুটো শব্দ: ইস্কেইপ হ্যাচ।

উঁচু হলো রানা, ভারী ধাতব দরজা ধরে টানল, ভেতরে ঢোকার সময় সুসমির হাতটা আরও শক্ত করে ধরে রাখল। প্যাড লাগানো ছোট একটা গোলক। পানির তোড় এত প্রবল যে দরজাটা রানা বন্ধ করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বিপদ টের পেয়ে রানার সাহায্যে এগিয়ে এলো সুসমি। নিজেদের জান বাঁচাবার জন্যে অস্তিত্বের সবটুকু শক্তি দিয়ে লড়ছে ওরা। অবশেষে বন্ধ হলো ভারী দরজাটা। সুসমি বোল্ট লাগাল। বন্ধ দরজার গায়ে

বাধা পেয়ে বাইরে গর্জন করছে পানির স্রোত। একটা লিভার ধরে টান দিল রানা। গোলক, অর্থাৎ খুদে এলিভেটর নামতে শুরু করল। যেন একটা বাধা পেয়ে ঝাঁকি খেলো গোলক, কিছু ছেঁড়ার একটা শব্দ হলো, তারপর মনে হলো ওরা যেন শূন্যে ভাসছে। সবশেষে, ওটাই সবচেয়ে মজার, ওপরে ওঠার অনুভূতি।

'রানা!'

রানা অনুভব করল সুসমির দুই কোমল বাহু জড়িয়ে ধরছে ওকে, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল ও।

বাইশ

সারাদিনের মধ্যে প্রথম খাওয়াটাই, অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট, সবচেয়ে প্রিয় রানার। আর যেহেতু স্বাস্থ্যোদ্ধার প্রয়োজন—শব্দটা ওর কাছে তেতো বিষ লাগে—সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

লন্ডনে এটা রানার অফিস কাম রেসিডেন্স। এক শ্বেতাঙ্গিনী প্রৌঢ়া মেইড-সারভেন্ট থাকে এখানে, রানা এলে ওর সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আজ সকালে ওকে ব্রেকফাস্ট খেতে দেয়া হয়েছে চিনি ছাড়া কড়া দু'কাপ কফি, হাফ পাইন্ট তাজা অরেঞ্জ জুস, দুটো ভাজা ডিম। আর ইংলিশ গাইগোরুর তিনটে ফালি, কম মশলা ও মাখনে ভাজা। আরও আছে টোস্ট, নরমান্ডি থেকে আনানো মাখন মাখানো।

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে, মেইডসারভেন্ট মিসেস প্রিসিলা ঘরে ঢুকে মোবাইল ফোনটা নিচু টেবিলে রাখল। 'ফিটজেরাল্ড নামে

এক আমেরিকান ভদ্রলোক, সার। সম্ভবত ক্যালিফোর্নিয়া থেকে…'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে ফোনটা তুলে কানে ঠেকাল রানা, 'হ্যালো? বলুন।'

আটলান্টিকের ওপার থেকে ভেসে আসছে, তারপরও স্পষ্ট শুনতে পেল রানা। 'মিস্টার রানা? দেখুন, আমি বলতে চাই–হেল! বিলিভ মি, আপনি ওখানে আছেন জানার পরও টর্পেডো ছোঁড়ার অর্ডার দিতে কি কষ্ট যে হয়েছে আমার। দেখলাম জিনিসটা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে…'

'যা করেছেন ভালই করেছেন, আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলেও তাই করত,' বলল রানা। বলল না তাঁর জায়গায় ও হলে কি করত।

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা, সত্যি আমি একটা অপরাধবোধ থেকে বাঁচলাম। মিস্টার চুয়াঙ মাও আমার ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি…'

'তিনি এখন কোথায়?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার মাওকে আমরা চাইনিজ দূতাবাসে পৌঁছে দিয়েছি। উনি ওনার ক্রুদের নিয়ে কাল বা পরশু চীনে ফিরে যাচ্ছেন।'

'ভেরি গুড।'

'তো রাখি, কেমন?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' ফোন সেট অফ করে টেবিলে রাখল রানা, মিসেস প্রিসিলা এখনও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে বলল, 'আমি আর কোন ফোন ধরব না, তবে নিনা সুসমি নামে কেউ এলে বা ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে।'

'সে এসেছে।'

ঝট করে ঘাড় ফেরাতে মিসেস প্রিসিলাকে নয়, কালো কোট আর হ্যাট পরা নিনা সুসমিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে মেঝেতে রাখছে। 'তুমি? এখানে? আমি

তো ভেবেছি চীনে ফিরে গেছ...'

'ধরো, আমি ছুটিতে আছি,' বলল সুসমি, তার ঠোঁট কাঁপছে–নিশ্চয় শীতে নয়, ভাবাবেগে। 'অন্তত একটা সপ্তাহ ছুটি।' গায়ের কোটটা খুলতে শুরু করল। দেখা গেল কোটের ভেতর নার্সদের সাদা ইউনিফর্ম পরে রয়েছে সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি আসলে তোমার শুশ্রূষা করতে এসেছি।'

'তাই নাকি!' আকাশের চাঁদ পেল যেন রানা হাতে। 'তাহলে তো আমারও ছুটি নিতে হয়! তোমার ওই লোডেড পিস্তলটা আবার আনোনি তো সঙ্গে?'

'এনেছি,' হাসল সুসমি। 'তবে ঢুকেই ওটা জমা দিয়েছি মিসেস প্রিসিলার কাছে। সাতদিন পর চলে যাওয়ার সময় ফেরত নেব।'

***

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

শফিক,
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

একটি ক্ষুদ্র অভিযোগ জানাব।

এবারের ৯ম ঢাকা বইমেলায় সেবা প্রকাশনীর স্টলে একজন সেলসম্যানকে ৫ খানা বই দেখাতে বলি। তার মধ্যে ২ খানা বই আমি ক্রয় করি, ৩ খানা ফেরত দেই। উক্ত ব্যক্তি আমার উপর রেগে গেল। ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল কেন আমি এতগুলি বই শেলফ থেকে নামাতে বললাম। উক্ত ব্যক্তির নাম জানি না। কারণ নাম লেখা ব্যাজ ছিল না। এখন থেকে ব্যাজ পরতে দেবেন।

পছন্দ করে বই কিনতে হলে তো ৪/৫ টি বই নামাতেই হবে। রাগারাগি করলে তো হবে না। আপনার মতামত কি?

কী আর বলব, বলুন? লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া আমার আর কি করার আছে? যারা মেলায় বই বিক্রির দায়িত্বে ছিল তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হলো, ক্যাশে যে ছিল তাকেও জিজ্ঞেস করা হলো—কেউ এখন আর ভয়ে কিচ্ছু স্বীকার করে না।

আমার অনুপস্থিতিতে এরা আমার প্রিয় পাঠকদের সঙ্গে কে কি ব্যবহার করছে আমি জানতে পারছি না। সেলসম্যানের কাজই হলো বই দেখানো। ৫টা কেন, ৫০টা বই নামালেও ওদের কিছু বলার থাকতে পারে না। কারণ, ওই কাজের জন্যই রাখা হয়েছে ওদের। আমি চেষ্টা করব আগামী একুশের মেলায় ওদের সবাইকে নাম লেখা

ব্যাজ দিতে।

এই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

মোস্তাক,

আজিমপুর, ঢাকা।

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, এমন একটা দিন ছিল, যখন সেবা প্রকাশনীর রহস্য উপন্যাস সমূহে নারী-পুরুষ মিলনের খোলামেলা বর্ণনা থাকত। আসলে খোলামেলা যৌন-বর্ণনা ছাড়া রহস্য কাহিনী জমে না। কিন্তু তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছিল এসব বই ছোটরাও পড়ছিল বলে। আমি বিশেষ ভাবে মাসুদ রানার কথা বলছি। কিন্তু এখন যুগ পাল্টে গেছে। অভিভাবকের মন-মানসিকতাও বদলে গেছে এই ডিশ অ্যান্টেনা বা স্যাটেলাইটের যুগে। কাজীদা, আবারও ২/১টি মাসুদ রানা আগের মত খোলামেলা বর্ণনা দিয়ে লিখে দেখুন না কি হয়? তবে প্রচ্ছদে যেন খোলামেলা ছবি না থাকে।

কেন? কি হবে প্রচ্ছদে খোলামেলা ছবি থাকলে? লজ্জা লাগবে? বাপ-মা-খালা-ফুপা কিংবা ছেলে-মেয়ে-ছোটবোন-ছেলেরবউ দেখে ফেললে বিব্রত বোধ করবেন? আমাকে সাদামাঠা মলাটের ভিতর গোপনে খোলামেলা বর্ণনা ঢুকিয়ে দেয়ার বুদ্ধি দিচ্ছেন?

আমি কিন্তু সোজা-সরল লোক, এই ধরনের লুকোচুরির ঘোর বিরোধী। একসময় আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম, যেহেতু মাসুদ রানার ওপর স্পষ্ট করে লেখা থাকছে 'কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য', বাচ্চারা কেউ ভুলেও ছুঁয়ে দেখবে না এ-বই। আমরা বড়রা বড়দের উপযোগী মজার মজার কাহিনী উপভোগ করব লিখে এবং পড়ে। ছোটদের জন্যে 'কুয়াশা সিরিজ' আছে, ওরা ওটা নিয়ে থাকবে মহা আনন্দে।

কিন্তু সেটি হবার নয়। ছোটরাও পড়ছে, পড়বেই। ডিশ অ্যান্টেনার এই বর্তমান যুগেও আমি চাই না ছোটরা প্রাপ্তবয়স্কদের বই পড়ুক বা ছবি দেখুক। এটা ওদের সাবজেক্ট নয়। সিনেমা দেখলে বা বই পড়লেই যে ওদের সাঙ্ঘাতিক কোন ক্ষতি হয়ে যাবে আমি তাও অবশ্য মনে করি না। তবু সমাজকে বিব্রত করার কোন অধিকার আমার নেই। প্রচ্ছদ যতই রাখাঢাকা থাক, পড়ার পর বইটি যদি আপনার লুকিয়ে রাখতে হয় ছোটদের ভয়ে, বা ওদের হাতে ওই বইয়ের একটি কপি দেখে যদি আপনি সঙ্কোচ বোধ হয়, তাহলে বুঝবেন, বাঙালী প্রাপ্তবয়স্কদের মনটা খোলামেলা হতে আরও অনেক দেরি আছে।

এইচ.এম. সুমন আরেফীন,
নেয়ামতপুর, মান্দারী, লক্ষ্মীপুর।

আমি সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠক। সবসময় চেষ্টা করি সেবা'র সব ধরনের বই পড়ার জন্য। বিশেষ করে মাসুদ রানা। এ পর্যন্ত আমি চল্লিশ-পঞ্চাশটা মাসুদ রানা পড়েছি। তার মধ্যে 'সেই উ সেন', 'প্রমাণ কই?', 'হ্যালো, সোহানা' ও 'মুক্তিপণ' খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে 'গোপন শত্রু' পাঠ করে আমি বিস্ময়ে অভীভূত হয়েছি। রানার দেশপ্রেম আর যমুনার অসামান্য অভিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার কাছ থেকে এমনি বই আরও আশা করি।

আপনার জন্য বিশেষ দোয়া রইল।

গোপন শত্রু ভাল লেগেছে জেনে আমারও খুব ভাল লাগল। আপনার জন্যও রইল আমার শুভেচ্ছা।

আজম খান,
টিআইডিসি, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩৫০

আলোচনা বিভাগে আগে প্রায়ই দেখতাম অনেকেই 'মাসুদ রানা ফ্যানস্ ক্লাব' বা 'কাজী আনোয়ার হোসেন ফ্যানস্ ক্লাব' ইত্যাদি গঠন করেছেন। ঢাকায় অবস্থিত এ রকম দু-একটি সংগঠনের ঠিকানা জানতে চাই।

আমার জানা নেই। সম্ভবত এসবের অস্তিত্ব আর নেই এখন। বহুদিন হলো আর কোনও সাড়া-শব্দ পাই না।

এস. কে. সাইফুল ইসলাম, রাবেয়া মনজিল,
২১ হাজী মেহের আলী রোড, ইকবালনগর, খুলনা-৯১০০

আমি সেবা'র একজন পাঠক ও ভক্ত। বিশেষ করে মাসুদ রানা পেলে কথা নাই। সেই ক্লাস ফাইভ থেকে পড়ছি, এখনও পড়েই যাচ্ছি। সে যাই হোক, একটি প্রশ্ন: বাঘের খাঁচা বইটির ৩১ নং পৃষ্ঠায় লীয়ার জেটের পাইলট নিগ্রো সীজার মাসুদ রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'মিঃ মাসুদ রানা?' এটা কি ছাপার ভুল, না কি সীজার আগে থেকেই জানত নরেশ বড়ুয়াই মাসুদ রানা?

ছাপার নয়, ওটা লেখার ভুল। আমাদের কারও চোখে পড়েনি। এই মারাত্মক ভুল ধরে দেয়ায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি

ভলিউমে যখন বের হবে তখন এ-ভুল আর থাকবে না। ...আপনার পূর্ণ ঠিকানা ছেপে দেয়া হলো, পেয়ে যাবেন কলম-বন্ধু। ...শুভেচ্ছা।

লোটাস, ন্যাশনাল লাইব্রেরী,

শহীদ জিকরুল হক রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

আমি মাসুদ রানার একজন চশমা আঁটা 'অসম্ভব' ভক্ত। অসম্ভব কথাটি লিখলাম, কেননা আমার ধারণা আমি মাসুদ রানার যে ধরনের ভক্ত, বাস্তবে আসলে সে ধরনের ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও কেমন করে যেন আমি হয়ে গেছি।

মাসুদ রানার প্রায় সব বই-ই আমি পড়েছি। নতুন বইগুলোর মধ্যে 'দেশপ্রেম' বইটি আমার পছন্দ হয়েছে। আর একটি কথা : আমি পত্র-মিতালীতে দারুণ আগ্রহী।

আপনি আমার এ চিঠিটা ছাপালে আমি ভীষণ দুঃখ পাব। আর আমার কেন যেন মনে হচ্ছে–আপনি আমাকে সেই দুঃখটা দেবেনই।

দিলাম দুঃখ, কেমন লাগছে?

ঋতু,

মেহেরবান প্লাজা, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

প্রিয় সেবা,

তোমার সঙ্গে সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর একসাথে পথ চলা। সময় বদলেছে, জীবন বদলেছে–আর বদল হয়েছে ভালবাসার গভীরতা। সেবা, বিশ্বাস করো, ভালবাসার এতটুকু ঘাটতি হয়নি আজও। একটি বারও মনে হয়নি প্রিয় রানা কাল্পনিক চরিত্র।

জীবনের অনেক কঠিন সময় পার করেছি তোমার থেকে পাওয়া দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে। হার না মানার নিষ্পাপ আকুতিই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

তোমার কাছ থেকে অমূল্য এক মন্ত্র আমি শিখেছি–'ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে। সেবা করতে হবে মানুষের, মানবতার।'

জয় হোক তোমার, দীর্ঘজীবী হও।

সাতাশটা বছর কম সময় নয়। সেবা'র প্রতি আপনার অন্তরের গভীর, মধুর, কোমল অনুভূতি; তার প্রতি আপনার আস্থা ও বিশ্বাস আমাদের পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকল। আপনাকে ধন্যবাদ।

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

কনকতরী

কাজী আনোয়ার হোসেন

খবর এলো বাংলাদেশী তেল বিক্রির-বারো হাজার কোটি টাকার সোনা নিয়ে কবীর চৌধুরীর জাহাজ চিন থেকে পুয়ের্টো রিকো যাচ্ছে। রাহাত খানের আদেশে পুয়ের্টো রিকো ছুটল রানা; যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে সোনাগুলো। খবর জোগাড়ের জন্যে ভবঘুরে হতে হলো ওকে, হতে হলো স্কুবা ডাইভার, নারীলিপ্সু এক টোকাই এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। গ্যালোস কে দ্বীপে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তৈরি করেছে কবীর চৌধুরী। ওখানে গিয়ে রানা জীবিত ফিরতে পারবে

তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এদিকে ওর তথ্য পেয়ে বাংলার গৌরব ডেস্ট্রয়ার নিয়ে সোনা উদ্ধারে আসছে সোহেল।

হাতে আর সময় নেই। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কবীর চৌধুরীর আস্তানায় ঢুকতে হলো রানাকে।

শুরু হলো একের পর এক বিপদ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২০/২/'০৩ মৃত্যুশিল্পী (থ্রিলার) সেলিম হোসেন টিপু

বিষয়: বেড়াতে এসে বিপদে পড়েনি, বিপদে পড়েই বাংলাদেশে এসেছে সিলাশিনের বাদশাহ সারিম শেই। অশুভ ছায়ার মতো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সাক্ষাৎ আজরাইল–সিধু মোদক। মানুষ মারার ঠিকাদারি করে সে, মৃত্যুশিল্পী। কোথাও কোন সূত্র নেই, কেউ সহযোগিতা করছে না। খুন হয়ে গেল র-এর এজেন্ট। এলো একের পর এক আরো মৃত্যু। ঘটতে থাকল ঘটনা, দুর্ঘটনা। কোথায় বাদশাহ সারিম শেই? কফি শেষ না করেই উঠে দাঁড়াল রানা এজেন্সির তুখোড় এজেন্ট এককালের গুণ্ডা–জাকি। দেখুন না এবার কী হয়!

২০/২/'০৩ দি আয়রন মিস্ট্রেস (অনুবাদ) পল ওয়েলম্যান/তাহের শামসুদ্দীন

বিষয়: জেমস বাউয়ি! আমেরিকার প্রায় সূচনাপর্বের এক অবিস্মরণীয় নায়ক। দুর্ধর্ষ জুয়াড়ী, নাইফ-ফাইটার, আধা শয়তান আধা সন্ত। জীবনের শুরুতেই হাবুডুবু খেয়ে উঠল অভিজাত বন্ধুর রূপসী বোন জুদালঁ দ্য বোর্নেইর প্রেমে। জুদালঁর নির্মম প্রত্যাখ্যান তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল সাঁ সিলভার 'বাঘের আস্তানায়', মৃত্যুর মুখোমুখি–তারপর সেখান থেকে আটলান্টিকের ত্রাস জলদস্যু লাফাইতির ঘাঁটিতে, নামাল দাস ব্যবসায়ে। এ এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আরও আসছে

২৫/২/'০৩ রহস্যপত্রিকা (১৯বর্ষ ৫সংখ্যা) মার্চ, ২০০৩